একটি মুক্তচিন্তক সাময়িকী

চেতনার অন্বেষণে

২৭তম সংখ্যা - ২০২৩

চেতনার অন্বেষণে ২৭তম || যুক্তিবাদীদের মাসিক পত্রিকা || বিনিময় মূল্য নাই || যোগাযোগ: yuktibadira@gmail.com || যুক্তির পথে আমরা

এবারের সংখ্যায়







বিশেষ সংযোজন

যুক্তিবাদীরা গ্রুপ কর্তৃক প্রকাশিত

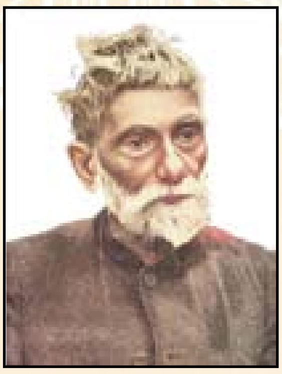
পত্রিকা প্রকাশিত হতে একটু দেরি হল তারজন্য প্রথমেই মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি। এবারের সংখ্যাটি নিয়ে দু'চারকথা বলার আগে 'বুক ক্লাব মিটিং' এখন থেকে পডকাস্ট রুপেই প্রকাশিত হবে। মাসে যে বইটি পড়তে দেওয়া হচ্ছে ওই বইটির সারসংক্ষেপ এবং পর্যালোচনার একটি পডকাস্ট দেওয়া হবে, যাতে নিজের নিজের সময়মত শুনে নিতে পারেন এবং ওখানে মতামত রাখতে পারেন।

গুগলমিট বিশেষ আলোচনা ও ওয়েবিনারের জন্য ব্যবহৃত হবে। ঠিককথা, মুক্তচিন্তকদের সমৃদ্ধির জন্য প্রতিমাসে একটি-দুটি মুভি ও ডকুমেন্টারি দেখতে দেওয়া হচ্ছে তা চলতে থাকবে। বড়ই আনন্দের ও গর্বের কথাও যে যুক্তিবাদীদের জন্য বাইশ-এর অধিক বই আর্কাইভ ইতিমধ্যেই তৈরি করা গেছে, যা বাংলায় মুক্তচিন্তকদের জন্য সবচেয়ে বড় বই আর্কাইভ। এটি টেলিগ্রামে উপলব্ধ।

প্রাইড মানথ্ চলছে, সাময়িকীতে তা নিয়ে দুটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক যেমন ধাতু পরিচিতি, বিবর্তনতত্ত্ব, রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানভাবনা প্রভৃতিও এবারের সংখ্যায় স্থান পেয়েছে। 'লঙ্কাকান্ড' একটি স্যাটারিক্যাল রাজনৈতিক নাটক প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়াও যুক্তিবাদী লেখক, বিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিন্সের একটি লেখার বঙ্গানুবাদ সংযোজিত হয়েছে। এছাড়াও রাজনৈতিক, ধর্মীয় মৌলবাদের ওপর বরাবরের মতো কলম তুলেছেন অনেকেই। কবিতা সংকলনটি অবশ্যই পড়বেন, চমৎকার কিছু কবিতা নতুন করে ভাবাবে।

পরিশেষে, লেখক-পাঠক বন্ধন আরও দৃঢ় করতে এবং 'চেতনার অন্বেষণে'র সামনের জন্য কিছু আর্থিক দায় তৈরি হয়েছে। এখানেও মুক্তচিন্তক-যুক্তিবাদী বন্ধুদের পাশে থাকার আহ্বান করছি। আপনারা বিভিন্ন মতামত দিয়ে যেমনটি সমৃদ্ধ

করছেন এভাবেই করতে থাকুন। শুভকামনা জানাই, সুস্থ থাকুন, বই পড়ুন, সর্বোপরি বই ভালোবাসুন।
৩১-মে-২০২৩



আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

(২রা আগস্ট, ১৮৬১ – ১৬ই জুন, ১৯৪৪)

“আমরা আমাদের যুগে যুগে সঞ্চিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি। মনু মহাশয় ব্যবস্থা দিলেন, সমুদ্রযাত্রা করিলে পতিত হইতে হইবে! কাজেই বাড়ী থেকে বাহির হওয়া আমাদের ঘটিয়া উঠিল না। কিন্তু আমরাই সিংহল, জাভা, বলিদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্য ও উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছি। তারপর হাঁচি টিকটিকি প্রভৃতির উপদ্রবে যেমন মন আমাদের সঙ্কুচিত হইল, অমনি কর্মচেষ্টা, উদ্যম, উদ্যোগ প্রভৃতি হারাইয়া বসিলাম। ব্রাহ্মণের আধিপত্য বজায় রাখিতে নিজেদের অল্প-সল্প যাহা কিছু কাজ কর্ম, তাহাও বেশ নিজেদের মধ্যে বিলি বন্দোবস্তের গণ্ডি আঁকিয়া সীমাবদ্ধ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া রহিলাম।”

মুক্তচিন্তক সম্মাননা

এমাসে **মুক্তচিন্তক সংবর্ধনা** জ্ঞাপন করছি যুক্তিবাদী **বিপ্লব সেন** -কে। তাঁর কবিতার সাথে পরিচিতি ইতিমধ্যেই, শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানাই।

যুক্তিবাদ নিয়ে বিগত সংখ্যা অবধি যাঁরা পাঁচটি বা তার অধিক লেখা দিয়েছেন, তাঁদের সম্মানজ্ঞাপক একটি সম্মাননাপত্র প্রদান করছি প্রতিমাসেই। পাঁচটি লেখা প্রকাশিত হওয়ার পর পত্রটি প্রদান করা হতে থাকবে আগামীতেও। এই মুক্তচিন্তকদের দৃপ্ত লেখনীতে প্রতিনিয়ত 'চেতনার অন্বেষণে'র পাঠক ঋদ্ধ হয়ে চলেছে।

বুকক্লাব পডকাস্ট

প্রতিমাসে "চেতনার অন্বেষণে"র পক্ষ থেকে একটি করে বই পড়তে দেওয়া হচ্ছে। বইটি পড়ুন এবং সেটি নিয়ে মতামত লিখে পাঠাতে পারেন পত্রিকায় প্রকাশের জন্য।

এমাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা **জাতীয়তাবাদ (ন্যাশনালিজম)** বইটি পড়তে দেওয়া হয়েছে।

বইটি কীভাবে সংগ্রহ করবেন বিস্তারিত টেলিগ্রামে পাবেন। তাছাড়াও যুক্তিবাদী, মুক্তচিন্তকদের প্রয়োজনীয় বই প্রায় বাইশ'র অধিক বই ক্যাটালগসহ পাবেন। টেলিগ্রামে সার্চ করবেন @Yktibadira তাহলে "চেতনার অন্বেষণে" নামে চ্যানেল পাবেন।

গ্রাহক ও লেখা পাঠানোর জন্য

পত্রিকায় লেখা পাঠানোর নিয়ম, ঠিকানা ও নিয়মিত গ্রাহক হওয়ার জন্য বিস্তারিত শেষের কভার পাতায় দেওয়া রইল। শেষের পাতায় যাওয়ার জন্য বাটনটিতে ক্লিক করলে যেতে পারবেন।

শেষ পাতা »

এই অ্যাপগুলিতে ম্যাগাজিন পড়ুন

ম্যাগাজিন পড়ার অভিজ্ঞতা সুন্দর করতে অ্যাডোবি রিডার, মুন রিডারের মত অ্যাপ ব্যবহার করুন। পুরো পত্রিকাটি ইন্টারেক্টিভ রেসপন্স থাকে অর্থাৎ সূচিপত্রে যে লেখাটি পড়তে চান সেটি "ওমুক পাতায়" লেখা বাটনে ক্লিক করলে স্ক্রল না করেই উক্ত লেখাটিতে সরাসরি পৌঁছে যেতে পারবেন। আটচল্লিশ শতাংশ পাঠকই 'ড্রাইভ পিডিএফ ভিউয়ার' অ্যাপ অর্থাৎ মোবাইলের ডিফল্ট অ্যাপই ব্যবহার করেন কিন্তু এই অ্যাপে ইন্টারেক্টিভ রেসপন্সের বিশেষ সুবিধা নেই এবং পিডিএফ স্টোরের সুবিধা নেই।

Support Us

Upi / Bank Details »

সূচিপত্র

| প্রবন্ধ - নিবন্ধ - গল্প - নাটক

পৃথিবীতে অক্সিজেনের উৎপত্তি

লিখেছেন — সৌমেন মন্ডল



৩৪ পাতায়

সক্রেটিস এখনও জীবিত রয়েছেন

লিখেছেন — সাহাদাত হোসেন



৩৮ পাতায়

রামকৃষ্ণের পুনর্জন্ম, একটি যুক্তিবাদী অনুসন্ধান

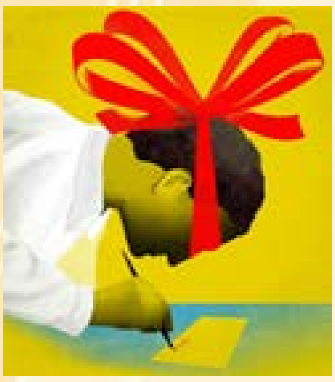
লিখেছেন — অভিষেক ঘোষ



৪২ পাতায়

সংস্কার-মুক্ত-সমাজ

লিখেছেন - মহম্মদ মহসীন



৪৮ পাতায়

অশৌচের নিয়ম কানুনেও ব্রাহ্মণদের সাথে অন্য বর্ণের এত ফারাক কেন?

লিখেছেন - শম্ভুনাথ চার্বাক



৫২ পাতায়

ট্রান্সজেন্ডার ও সমকামী মুক্তি আন্দোলন এবং মার্ক্সবাদ

লিখেছেন – ঈশা চক্রবর্তী



৫৭ পাতায়

তাদের নিজেদের ধর্মই ‘শ্রেষ্ঠ’

লিখেছেন — অমিত মন্ডল



৬৮ পাতায়

ধাতব মৌলদের কথা: অ্যালুমিনিয়াম

লিখেছেন — অঞ্জনা ঘোষ



৭৫ পাতায়

মনুর চোখে নারী — হিন্দু ধর্মে নারীর দুরবস্থা

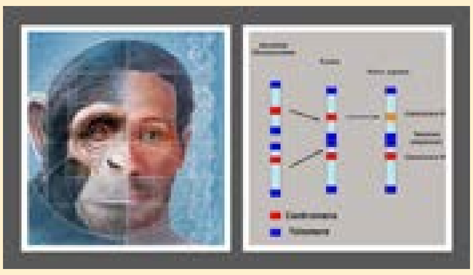
লিখেছেন – অজিত কেশকম্বলী



৭৯ পাতায়

মানুষের একজোড়া ক্রোমোজোম কোথায় হারিয়ে গেল?

লিখেছেন — নির্মাল্য দাশগুপ্ত



৯৪ পাতায়

ফাঁকাতন্ত্র

লিখেছেন – মোশাররফ হোসেন মুসা



৯৬ পাতায়

রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান ভাবনা

লিখেছেন – পঞ্চানন মণ্ডল



১০০ পাতায়

বোঝা (cognition)

লিখেছেন – উল্লাসকর বন্দ্যোপাধ্যায়



১০৮ পাতায়

সঙ্ঘ পরিবারের আসল চেহারা

লিখেছেন – অভিষেক দে



১১০ পাতায়

ধর্মমোহে আক্রান্তরা

লিখেছেন – তারকনাথ সাহা



১১৭ পাতায়

রাজা রামমোহন রায়

লিখেছেন - রাজু দত্ত



১১৯ পাতায়

মুক্তি

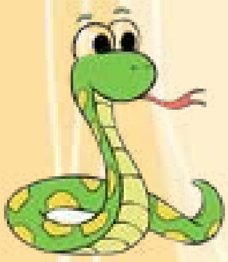
লিখেছেন - প্রদীপ চক্রবর্তী



১২৩ পাতায়

বিষধর সাপে কাটা রুগী ওঝার বাড়ি থেকে সুস্থ হয়ে ফেরে কীভাবে?

লিখেছেন — অদিতি প্রকৃতি কন্যা



১২৮ পাতায়

মৃত্যু কী এবং কেন?

লিখেছেন — শংকর ব্রহ্ম



১৩৫ পাতায়

বিবর্তনের সংসার

লিখেছেন — চন্দন পাত্র



১৩৮ পাতায়

মানুষ

লিখেছেন – রাজু দত্ত



আসল কারিগর

লিখেছেন – তাপস কুমার সরকার

প্লাটিনামে গড়া পথশিশু

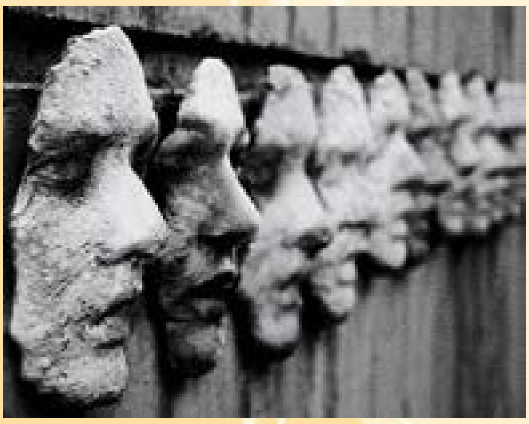


লিখেছেন – প্রিন্সি বেরা

ঊনিশে মে

লিখেছেন – তারকনাথ সাহা

আগুন নেভাবে বিপ্লব



লিখেছেন – শিবম ব্যানার্জী

দান

লিখেছেন – রামকৃষ্ণ সাহা

মানুষ কোথায়?

লিখেছেন – প্রফুল্ল কুমার মণ্ডল



বেদে বিজ্ঞান: ইসরোর চেয়ারম্যান

লিখেছেন – বিপ্লব সেন

আস্তিকতা আসলে মানসিক অসুস্থতা



লিখেছেন – বিপ্লব সেন

গাছ আমাদের বন্ধু ও ভাই...

লিখেছেন – সজল কান্তি টিকাদার

কৃতজ্ঞতা

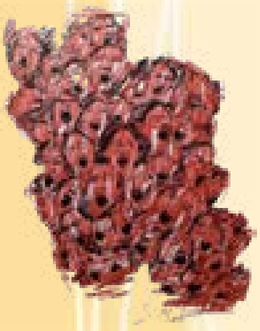
লিখেছেন - প্রণব নাইয়া



বিশেষ সংযোজন

লেঠেল দিয়ে দেশপ্রেম হয় না

লিখেছেন — চন্দ্রিল ভট্টাচার্য



২২৯ পাতায়

বিজ্ঞানের অঙ্গনে যখন ধর্মের প্রবেশ দুটোর যৌক্তিক পার্থক্য কী এতো সহজ?

লিখেছেন - রিচার্ড ডকিন্স



২৩৬ পাতায়

সমকামীতাকে বিজ্ঞানের চোখে দেখুন?

লিখেছেন – মুজিব রহমান



আমার এক সমকামী (মূলত রূপান্তরকামী) বন্ধু আছে। সে বলে, 'আমার বাইরের অবয়বটা পুরুষের কিন্তু ভিতরের উপলব্ধিটা নারীর। ভিতরে একজন নারীত্ব নিয়ে কি করে আরেকজন নারীকে ভালবাসবো। ভিতরের নারী তো একজন পুরুষকেই কামনা করে।' আমার এই বন্ধুকে এই সমাজ খুবই সন্দেহের চোখে দেখে। তার আত্মীয়রা মনে করে জোর করে বিয়ে করিয়ে দিলেই সমাধান হয়ে যাবে। তারা ভাবে এসব অনৈতিক, পাগলামি ও বিকৃত চেতনার। আমি কি বলতে পারি, এটা বিকৃত চেতনার? পারি না তো! কিন্তু এ সমাজে সে কিভাবে টিকে থাকবে? তার ভিতরের নারীত্ব আরেকজন পুরুষকেই সে কামনা করে। যদি সেই পুরুষ অবয়বের মানুষটিও ভিতরে নারীত্ব অনুভব করে তবে তারা সুখে দিন কাটাতে পারে।

শিশুদের বলাৎকার করা বা দুজন একই লিঙ্গের ব্যক্তির সাময়িক যৌনক্ষুধা মেটানোকেই আমরা সমকামীতা ধরে নেই। বাস্তবিক সমলিঙ্গের প্রতি তীব্র প্রেম ও আকর্ষণকেই বলে সমকামীতা। কেন একজন পুরুষ একজন নারীর পরিবর্তে আরেকজন পুরুষকেই কামনা করে? এটা কি মানসিক বিকৃতি? নাকি কোন মানসিক রোগ? বন্ধুটির দিকে তাকালেই বুঝবো বাস্তবিক তার কোনটিই নয়। সম্ভবত জিনের গঠনের কারণেই একজন পুরুষ বা নারী সমলিঙ্গের প্রতি প্রেম ও আকর্ষণ বোধ করে। পুরুষকে বলে গে আর নারীকে বলে লেসবিয়ান। অনেকে হরমোনের কথাও বলেন। তবে হরমোন দায়ী হলে এর চিকিৎসা সম্ভব হতো সহজে। এটা কোনভাবেই কোন মানসিক রোগ নয়। বহু স্নায়ু ও মনোবিজ্ঞানীরা এটা পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়েছেন। সক্রেটিস, লর্ড বায়রণ, দ্বিতীয় এডওয়ার্ড, রোমান সম্রাট হেড্রিয়ান, এলেন গ্রিন্সবাগসহ অসংখ্য মানুষ সমকামী বা উভকামী ছিলেন। বহু সাধারণ গে বা লেসবিয়ানকে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে তাদের মধ্যে সমলিঙ্গের প্রতি প্রেম বা আকর্ষণ ছাড়া তাদের কোন মানসিক সমস্যা নেই।

তাহলে গে বা লেসবিয়ানদের এই সমস্যার জন্য দায়ী কে? কোনভাবেই তারা নিজেরা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী নন। জিনের উপর তাদের হাত নেই। এই জিনের কারণে মানুষ ছাড়াও আরও বহু প্রাণির মধ্যেও এ প্রবণতা দেখা যায়। এমন কি ফিতা ক্রিমির মধ্যেও এমন প্রবণতা রয়েছে। ভেড়ার মধ্যে প্রায় ১০ ভাগ ক্ষেত্রেই এমনটা দেখা যায়। মাছ, সরীসৃপ, উভচর বহু প্রাণীর মধ্যেও এমনটা লক্ষ্য করেছেন গবেষকগণ। তারা কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে জিন, হরমোন ও পরিবেশগত কারণসমূহের এক জটিল আন্তঃক্রিয়ার সন্ধানই পান। তার মানে এমন আচরণ করার ক্ষেত্রে তাদের করণীয় কিছু নেই। বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ তৈরি না হলে তারা বিয়ে করেও জীবন যাপন করতে পারবে না। সে এক অসম্ভব কষ্টকর জীবন যাপন। যাকে দেখে শরীর কথা বলবে না, তার সাথে তো শারীরিক চাহিদা মেটানোও সম্ভব নয়। অনেকটা একজন

সাধারণ পুরুষের সাথে জোর করে আরেকটি পুরুষের বিয়ে দেয়ার মতো হবে। তাহলে?

ইংরেজরা সমকামীতা, উভকামীতা ও পশুকামীতার বিরুদ্ধে কঠোর আইন করে যায়। ৩৭৭ ধারায় বলা হয়েছে কোন ব্যক্তি যদি স্বেচ্ছায় কোন পুরুষ, নারী বা পশুর সাথে প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে যৌন সঙ্গম করে তবে তাকে আজীবন কারাদণ্ড দেয়া হবে, অথবা বর্ণনা অনুযায়ী নির্দিষ্টকালের কারাদণ্ড প্রদান করা হবে যা দশ বছর পর্যন্ত বর্ধিত হতে পারে এবং এর সাথে নির্দিষ্ট অঙ্কের আর্থিক জরিমানাও দিতে হবে। বাংলাদেশে এই আইনটি এখনও বলবৎ। পৃথিবীর আরও ৭১টি দেশে সমকামীতার বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকম আইন রয়েছে। কিন্তু ভারতসহ পৃথিবীর বাকি দেশগুলোতে সমকামীতা অপরাধ নয়। ভারতে আইনটির বিরুদ্ধে একজন সমকামী মামলা করলে আদালত আইনটি মানুষের অধিকার পরিপন্থী বিবেচনা করে বাতিল করে। এখন উন্নত দেশগুলো বোঝতে পারছে সমকামীতা শুধু যৌন প্রবৃত্তি দিয়ে নির্ধারণ করা যায় না। সমকামীতা শুধু শরীর সর্বস্বতা নয়। এখানে অনুভূতিটাই প্রধান। এজন্য এখন অনেক দেশে সমকামীদের বিয়েও রেজিস্ট্রি হচ্ছে। অনেক দেশেই তারা জনপ্রতিনিধিও হতে পারছেন। তাদের সামাজিক আন্দোলন শুধু আইনগত দিকেই নয়, মানুষের ভাবাদর্শ বদলাতেও কাজে লাগছে। কিন্তু বাংলাদেশের মতো পশ্চাৎপদ দেশে এই আইন কঠোরভাবেই যেমন প্রয়োগ করা হয় আবার সামাজিকভাবেও তাদের নিগৃত হতে হয়। ঢাকার কলাবাগানে এমন এক জুটিকে মূর্খ মৌলবাদীরা হত্যা করে। তাতে বাংলাদেশের জিনগত কারণে সৃষ্ট এমন মানুষেরা আরও প্রকট সমস্যায় পড়েন। তারা হয় অধিক গোপনীয়তা অবলম্বন করেন নয়তো নিজের শরীরের চাহিদার বিপক্ষে গিয়ে বিপরীত লিঙ্গে বিয়ে করে চরম অসুখী জীবন যাপন করেন।

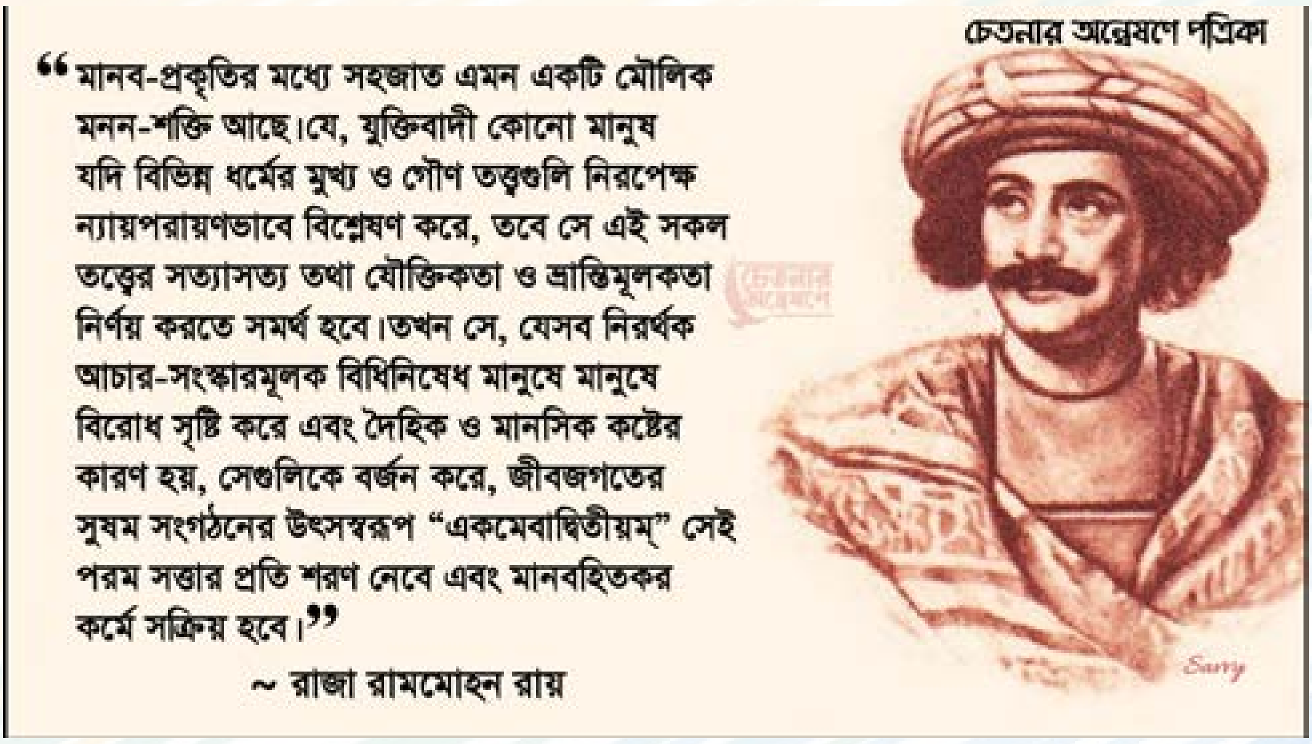
গত বছর পত্রিকায় দেখলাম, বাংলাদেশের নোয়াখালীর

মেয়ে বিলকিস ভালোবাসার টানে টাঙ্গাইলের বাসাইলের মেয়ে আঁখির কাছে ছুটে এসেছেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক ও টিকটকের মাধ্যমে পরস্পরকে খুঁজে পান। পরে তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে বলে জানান দু'জনেই। এমন খবর ছড়িয়ে পড়লে আশপাশের উৎসুক বিভিন্ন বয়সি মানুষজন তাদের এক নজর দেখতে ওই বাড়িতে ভিড় করছেন। সাধারণ মানুষের কাছে বিষয়টি নতুন। আমাদের দেশে সমকামীতা থাকলেও তারা তা গোপনেই রাখেন। সামাজিক মাধ্যম না থাকলে দুই তরুণীর মধ্যে যোগাযোগও হতো না। বিলকিস আক্তার বলেছিলেন, 'ফেসবুকে তাদের পরিচয় হয়। এরপর দুই বছর হোয়াটসঅ্যাপে কথা বলেন। জড়িয়ে পড়েন প্রেমে। তবে তাদের এই সম্পর্ক মানতে পারছে না পরিবার। আমি আঁখিকে ভালোবাসি, তাই ওর কাছে চলে এসেছি। আমার ফ্যামিলিকে বলেছিলাম, ওর কাছে যাব। কিন্তু ওনারা রাজি হয়নি। তারা আমাদের সম্পর্ক মানবে না। তাই বাড়ি থেকে নিরুপায় হয়ে পালিয়ে এসেছি। এখন ওর পরিবার না মানলে আমরা দু'জনে অন্য কোথাও গিয়ে বসবাস করব।' আঁখি আক্তার বলেছিলেন, 'বিলকিসকে নিয়ে আমি এর আগে ঢাকায় গিয়েছিলাম। আমরা ঢাকায় দেখা করেছি। ঢাকায় আমাদের ফ্যামিলি গিয়ে আমাদের আলাদা করে নিয়ে এসেছে। আমার ফোন নিয়ে নিয়েছিল। কয়েকদিন পর ফোন ফেরত দেয়। তখন আবার আমরা কন্ট্যাক্ট করে ওকে আমার বাসায় নিয়ে এসেছি। সামাজিকভাবে আমাদের কেউ মানবে না। কিন্তু আমি ওর সঙ্গেই সারাজীবন থাকতে চাই। বাঁচলেও ওর সঙ্গে, মরলেও ওর সঙ্গে। পুলিশ বা তারা যদি আমাদের মেরে ফেলতে চায়, তাহলে দু'জনকে একসঙ্গেই মারবে। আর যদি বাঁচিয়ে রাখতে চায়, তাহলে দু'জনকেই রাখতে হবে।' আমাদের মিডিয়া কতিপয় মূর্খ অধ্যাপক ও ডাক্তারের মতামত নিয়েছে। তারা এটাকে বিকৃত যৌনাচার বলে দিয়েছে। তারা বলেছে এটা সাময়িক! কিন্তু এটা সাময়িক নয়। ছবি দেখেই বুঝেছেন এরা দরিদ্র পরিবারের। এরা খাঁটি সমকামী!

রূপান্তরকামীর চিকিৎসা খুবই ব্যয়বহুল এবং বাংলাদেশে

পুরোটা নেইও। মনোবিজ্ঞানীর পরামর্শে প্রথমে হরমোন দিবে ডাক্তার। সেটা কার্যকরী না হলে অপারেশন করে দুজনকেই পুরুষ করে ফেলতে হবে। কারণ তাদের ভেতরটা পুরুষের। পুরুষের হরমোন প্রয়োগে তাদের বাইরের অবয়বও বদলে যাবে। তখন দুজনই দুজন নারীকে বিয়ে করে নিতে পারবেন। বাংলাদেশে টিএমএসএস এর নির্বাহী পরিচালক পুরুষ থেকে নারী হতে পেরেছিলেন। তিনি পরে তার সহপাঠী পুরুষকে বিয়েও করেন। তাদের একটি সন্তানও রয়েছে।

জোর করে শিশুদের বলাৎকার করাটা ধর্ষণযোগ্য অপরাধ। কিন্তু দুজন গে বা লেসবিয়ান যদি স্বেচ্ছায় নিজেরা সুখে জীবন যাপন করেন তবে তা কি অপরাধ হয়? জিনের ত্রুটির দায়টা ব্যক্তির উপর চাপিয়ে দিতে কি মানুষ পারে? এসব প্রশ্নের জবাবটাই বাংলাদেশের আইন পরিবর্তনে ভূমিকা রাখতে পারে। আমরা এসব বিষয় গোপন করতে চাই এবং কথা বলতে চাই না। ফলে সমস্যা চুপিচুপি বাড়তেই থাকে। সবদেশের আইনই বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে হবে।



ইসরো প্রধান ও 'সবই ব্যাদে আছে'

লিখেছেন – সমুদ্র সেনগুপ্ত



সাহা, বোর, স্রয়ডিংগার, হাইসেনবার্গ, আইনস্টাইনদের মতো ইন্টেলেকচুয়াল জায়েন্টদের সাথে ইসরো প্রধান সোমনাথের নাম জুড়ে ভক্ত কুলের লাফালাফি যাদের অসহ্য মনে হচ্ছে, এই লেখা তাদের জন্য।

ইসরো বিজ্ঞানীর মন্তব্য, তাকে ঘিরে মেঘনাদ সাহার "সবই ব্যদে আছে" বলে প্রত্যুত্তর, তার মিম, তার উত্তরে আবার হাইজেনবর্গ এর উদ্ধৃতি নিয়ে পাল্টা মিম ইত্যাদি তর্ক বিতর্কের ভেতরে প্রবেশ করলে দেখবেন আসলে সবই "এপিল টু অথরিটি" নামের ফ্যালাসিতে ভরপুর। একটা ডাহা মিথ্যে কথাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ইসরো

চিফ সোমনাথ নামক বিজ্ঞানীর (উনি কতটা বড় বিজ্ঞানী সে নিয়ে প্রশ্ন আছে) উক্তি নিয়ে ভক্তদের লাফালাফি, সেই দেখে মেঘনাদ সাহার উদ্ধৃতি হাতিয়ার করে বিপক্ষের নেমে যাওয়া এই গোটা কাজিয়া তে যেটা হারিয়ে হচ্ছে সেটা হল বিজ্ঞান, যুক্তিবাদ।

পদার্থবিজ্ঞানের জগতে নিউটনের বলবিদ্যার রমরমা ছিল অনেকদিন। 1920 দশকের গোড়ায় সেটা ধাক্কা খায়। সাব এটমিক পার্টিকল যেমন ইলেকট্রনের কিছু চলন বলন ওই নিউটনীয় গতিবিদ্যার সূত্রগুলো দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছিল না। ফলে প্রধানত তিন পদার্থবিদ, ডেনমার্ক এর নীলস্ বোর, অস্ট্রিয়ার আরউইন স্রয়ডিংগার আর জার্মানির ওয়ার্নার হাইসেনবার্গ এর হাতে পদার্থবিজ্ঞানের একটা নতুন ধারণার জন্ম নেয় যেটা পূর্ণতা পায় 1930 দশকের গোড়ায়। এর নাম কোয়ান্টাম বলবিদ্যা।

গোলমালটা শুরু হয় এর পরেই। নিউটনের বলবিদ্যার ধ্যান ধারণা তার সরলতার জন্য খুবই জনপ্রিয় ছিল, এমনকি পদার্থবিজ্ঞানের একেবারে গোড়ার দিকের ছাত্রছাত্রীদেরও বুঝতে কষ্ট হত না। অন্যদিকে এই কোয়ান্টাম বলবিদ্যা বা কোয়ান্টাম ফিজিক্স এর ধ্যানধারণাগুলি এতটাই জটিল ছিল, এতটাই বৈপ্লবিক ছিল, যে সাধারণ ছাত্র ছাত্রী তো বটেই, অনেক প্রতিষ্ঠিত পদার্থবিদও ঘেঁটে ঘ হয়ে গিয়েছিল। এর আবিষ্কারকদের ওপর নানান তাত্ত্বিক আক্রমণ নেমে আসে, পাগলামির অভিযোগ অবধি করা হয়।

তাঁদের তত্ত্বের জটিলতার অভিযোগে কিঞ্চিৎ বিপর্যস্ত ও বিচলিত এই তিন বিজ্ঞানীই দর্শনের মধ্যে তাদের আশ্রয় সান্ত্বনা (শব্দটা ব্যবহার করেছেন Fritjof Capra তার বইতে) খুঁজতে যান। ঘটনার পরম্পরাটা খেয়াল রাখতে হবে। যেমন হাইসেনবার্গ তার uncertainty principle আবিষ্কার করে ফেলেন 1927 সাল নাগাদ। এর পরে 1929 সালে

রবীন্দ্রনাথের তাঁর সাক্ষাত। ওই সাক্ষাৎকারের পরে উনি প্রাচ্য দর্শনে উৎসাহিত হয়ে পড়েন। এবং বলেন যে,

> ***"After the conversation about Indian philosophy some of the ideas of quantum physics, that had seemed so crazy suddenly made much more sense"***

নীলস্ বোর তাঁর বিখ্যাত Complementarity Principle আবিষ্কার করেন 1928 সালে করার অনেক পরে উনি চীন ভ্রমনে যান 1937 সালে এবং চৈনিক দর্শন Zhuang Zhou এর সাথে পরিচিত ও আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। উপনিষদ এর সাথে পরিচিত ছিল অবশ্য আগে। ওই নিয়ে তাঁর পরিচিত উক্তি,

> ***"I go into the Upanishads to ask questions."***

স্রয়ডিংগারের বিষয়টা সামান্য অন্য রকম। তাঁর বিখ্যাত ইকুয়েশন প্রকাশ পায় 1926 সালে। এর আগেই 1918 সাল নাগাদ বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক আর্থার সোপেনহাওয়ার এর লেখাপত্র এর মাধ্যমে স্রয়ডিংগার আকর্ষিত হন উপনিষদের প্রতি। ওই আকৃষ্ট হওয়ার একটা নমুনা হল তাঁর কুকুরের নাম। উনি নাম রেখেছিলেন আত্মন। এর অনেক পরে 1944 সালে প্রকাশিত তাঁর বইতে উনি উপনিষদ এর প্রতি তাঁর মুগ্ধতার কথা জানিয়ে ছিলেন।

যেটা লক্ষনীয় সেটা হল এই যে এই তিন বিজ্ঞানীর কেউ কোথাও কোনোদিন বলেননি যে বেদ উপনিষদ বা অন্য কোনো প্রাচ্য দর্শন থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে বা আইডিয়া ধার করে তাঁরা ওই কোয়ান্টাম বলবিদ্যা আবিষ্কার করেছিলেন। ত্রয়ী এর মধ্যে প্রাচ্য দর্শন নিয়ে সবচেয়ে বেশি উচ্ছসিত স্রয়ডিংগার যিনি বলেছিলেন যে

> ***"I do believe that this is precisely the point where our present way of thinking does need to be amended, perhaps by a bit of blood-transfusion from Eastern thought."***

তিনিও কিন্তু আরেকটি গুরুত্বপূর্ন কথা বলেছিলেন। ওঁর

মুখে প্রাচ্য দর্শনের এই প্রশস্তি শুনে লাফালাফি করা ভক্তের দল ওই পরের কথাটা বাদ দিয়ে যায় সুকৌশলে।

উনি এক নিশ্বাসে বলেছিলেন,

> ***"That (মানে প্রাচ্য দর্শনের রক্ত সঞ্চালন) will not be easy, we must beware of blunders — blood-transfusion always needs great pre-caution to prevent clotting. We do not wish to lose the logical precision that our scientific thought has reached, and that is unparal-leled anywhere at any epoch."***

ভক্তের দল তো বটেই, যারা ততটা ভক্ত নন, কিন্তু বেদ, বেদান্ত, গীতা ইত্যাদির প্রতি কিঞ্চিৎ দুর্বলতা পোষণ করেন, তাদের অনুরোধ করবো স্রয়ডিংগারের ওই সাবধানবাণী উপলব্ধি করতে। পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনার ফলে যে যুক্তিবাদের তীক্ষ্ণতা অর্জিত হয়েছে, যে কোনো যুগে যার কোনো সমান্তরাল পাওয়া যাবে না, সেটা যেন নষ্ট না হয় ওই প্রাচ্য দর্শন নিয়ে লাফালাফি করতে গিয়ে। দর্শন দর্শনের মতো উপযুক্ত মর্যাদার আসনে থাক, তার মধ্যে বিজ্ঞানের উপাদান খুঁজতে যাওয়াটা বাতুলতা, মূর্খামি।

আইনস্টাইন গীতার একটি দার্শনিক চিন্তার প্রসংশা করেছেন কিন্তু ইসরোর তথাকথিত বিজ্ঞানীর মতো বলেননি যে সবই বেদে আছে, অতএব ফাইনম্যান এর ফিজিক্স বাদ দিয়ে বেদ পড়তে শুরু করি সবাই মিলে। আজ্ঞে না, ওপরের ওই স্রয়ডিংগার কথিত যুক্তিবাদের তীক্ষ্ণতা কেবলই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অবদান। বেদের দেশের বাসিন্দা হিসেবে কথাটা মেনে নিতে কষ্ট হতে পারে কিন্তু এটাই সত্যি।

ভারতীয় মানসে শ্রেণীচেতনার অভাব

লিখেছেন – মনীশ রায়চৌধুরী



বর্তমান ভারতের অধঃপতনের অন্যতম কারণ শ্রেণী চেতনার অভাব। এই দৈন্যতার ফলেই মানুষ তার শত্রু-মিত্র চিনতে বারবার ভুল করছে। ভোটের সময়ও তারা জাতি, ধর্ম, বর্ণের ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্বাচিত করছে। ফল ভুগছে, কিন্তু ঐ যে বললাম শ্রেণী চেতনার অভাব, ফলে সেই ভুলেরই পুনরাবৃত্তি করে চলেছে।

মানুষের শ্রেণী চেতনার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তার শিক্ষা-সংস্কৃতি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবশ্যই বিচার্য। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা মানুষ গড়ার একমাত্র মাপকাঠি নয় ঠিকই, কিন্তু অন্যতম জরুরি একটা মাপকাঠি। অন্তত, একটা স্তর পর্যন্ত প্রথাগত শিক্ষা না থাকলে কোনও মানুষ নিপীড়িত, বঞ্চিতদের জন্য যতই সৎভাবে আন্দোলনের চেষ্টা করুক একটা সময়ে বাধাপ্রাপ্ত হবেই। আধুনিক শিক্ষার অভাবে তার পক্ষে বিশ্বে পূর্বে ঘটে যাওয়া বিপ্লবের সফলতা বা ব্যর্থতার উদাহরণ

থেকে শিক্ষা নেওয়া সম্ভব হবে না। প্রয়োজন অনুসারে নতুন রণকৌশল অবলম্বন করার ক্ষেত্রেও সীমাবদ্ধতা দেখা যাবে। আধুনিক শিক্ষার অভাবে সংগ্রামী জনতাকে ভুল বুঝিয়ে বিপথগামী করা গেছে, তাদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি হয়েছে এমন উদাহরণও বিরল নয়। ইংরেজদের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা সাঁওতাল বিদ্রোহ, কোল, ভিল, মুন্ডা বা চুয়াড় বিদ্রোহ সেই সময়ে প্রবল আলোড়ন তুলেছিল। কিন্তু ইংরেজরা সেই বিদ্রোহ দমন করতে সফল হয় কারণ বিদ্রোহী জনতার কাছে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের অভাব ছিল।

ভারত বহু ভাষা, ধর্ম, জাতির দেশ। তাই ইউরোপীয় দেশগুলোর মত এখানকার মানুষের শ্রেণীচরিত্র বোঝা অত সহজ নয়। লোকসভা বা বিধানসভা প্রতিটি নির্বাচনেই প্রার্থীর ভাষা, জাতি, ধর্ম বড় ভূমিকা পালন করে।

মহারাষ্ট্রকে ভারতের প্রাণকেন্দ্র বলা চলে। স্বাধীনতার পরে দীর্ঘকাল এখানে কংগ্রেসের শাসন ছিল। তারপর মারাঠি অস্মিতার উপর ভর করে বালাসাহেব ঠাকরের উত্থান শুরু হল। 'মারাঠি মানুষ' আবেগ তৈরি করা হল। নিজের ভাষা, সংস্কৃতির উপর গর্ব অবশ্যই ভালো। কিন্তু যখনই তা অন্যদের প্রতি বিদ্বেষের সৃষ্টি করে তখনই ক্ষতিকারক হয়ে ওঠে। বালাসাহেবও সুকৌশলে মারাঠি আবেগের নামে বিদ্বেষের রাজনীতি শুরু করলেন। মহারাষ্ট্র থেকে মারাঠি বাদে অন্যদের, বিশেষত বিহারিদের মেরে তাড়ানো শুরু হল। ১৯৮৯ সালে তার দল শিবসেনা বিজেপির সাথে জোট গঠন করে। মারাঠা মানেই শিবাজি, শিবাজি মানেই ঔরঙ্গজেবের সাথে দ্বন্দ, মানে হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ, অর্থাৎ হিন্দুরাজত্বের সূচনা। এমন সহজ সমীকরণই দুটো দলকে কাছাকাছি এনেছিল। ১৯৯৫ তে শিবসেনা প্রথমবার মহারাষ্ট্রতে ক্ষমতা দখল করে। দেখতে দেখতে মহারাষ্ট্রতে জাতীয় বীরের মর্যাদা পেতে শুরু করেন। তার ইচ্ছাই মারাঠিদের কাছে ঈশ্বরের বিধান হতে শুরু করল। শিবসেনা বা বালাসাহেবের বিরুদ্ধে ওঠা প্রতিটা প্রতিবাদী

কণ্ঠকে মারাঠি ভাবমূর্তিতে আঘাতের অজুহাতে স্তব্ধ করে দেওয়া হতে থাকল। ২০১৬ সালে শিবসেনার ঘোষিত সম্পত্তিই ছিল ৩৯৫.৬৮ মিলিয়ন টাকা। এই বিপুল সম্পদ যে সৎপথে অর্জিত হয়নি সেটা বোঝার জন্য অর্থনীতিবিদ হতে হয়না। কিন্তু, মারাঠি জনতার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কতটুকু উন্নতি হয়েছে? শাহরুখ, শচীন, অমিতাভের বিলাসবহুল বাড়ি বা জুহুবিচ কি মেরিন ড্রাইভই তো মহারাষ্ট্র নয়। অগণিত মারাঠি মানুষ বস্তিতে গাদাগাদি করে জন্মাচ্ছে, বড় হচ্ছে, মারা যাচ্ছে তাদের কতটুকু উন্নতি ঘটল? কিন্তু, মানুষ এইসব প্রশ্ন তুলতেই ভুলে গেছে কারণ শিবসেনা তাদের কাছে মারাঠি আবেগের প্রতীক। বছরের পরে বছর তারা সেই আবেগের ললিপপ চুষে চলেছে।

বিহার এবং গোবলয়ের রাজ্যগুলিতে ভোট হলেও সেই জাতপাত সামনে চলে আসে।

যাদব শুধু যাদব প্রার্থীকেই ভোট দেয়। ব্রাহ্মণ ভোট ঠাকুররা পাবে। দলিত ভোট দলিত বা 'পিছড়া বর্গের' লোক পায়। এবারে উত্তরপ্রদেশের ভোটে জিতে বিজেপির যোগী আদিত্যনাথ পুনরায় সরকার গঠন করেছে। প্রায় কোনরকম জনকল্যাণমুখী কাজ না করেও যে ক্ষমতায় ফেরা যায় উত্তরপ্রদেশ তার নজির হয়ে থাকল। এই জয়ের অন্যতম কারণ ভোট কাটাকাটি। ব্রাহ্মণ তথা উচ্চবর্গের দরিদ্র মানুষ আরও বেশি দরিদ্র হয়েছে, অনেকেই কাজ হারিয়েছে। তাদের অনেকেই বুঝতে পারছে এই কুশাসনে তাদের কোন উন্নতি নেই। তবু তারা বিজেপকেই ভোট দেবে। কারণ তাদের বোঝানো হয়েছে বিজেপি হিন্দু ধর্মের রক্ষক এবং তারা না থাকলে মুসলমানরা সব দখল করে নেবে। অর্থাৎ প্রার্থীর যোগ্যতার তুলনায় তার ধর্ম পরিচয় অগ্রাধিকার পেয়েছে। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় অনেক ঠাকুর, ব্রাহ্মণদের বলতে শোনা গেছে মুসলমানদের পার্টি হল কংগ্রেস, যাদবদের দল সমাজবাদী পার্টি, দলিতদের দল বিএসপি, মানছি যোগী সরকার ততটা উন্নতি করেনি কিন্তু আমাদের দেখার আর কোন দল নেই।

কিন্তু এই ধর্মীয় জাতপাতের গোঁড়ামি শুধু আছে ভাবলে ভুল হবে। স্বাধীনতার পর থেকে ভারতের মুসলিম সম্প্রদায় নিজেরাও কিন্তু নিজেদের মানুষ ভাবার পরিবর্তে সংখ্যালঘু প্রমাণ করতেই সচেষ্ট থেকেছে। অত্যন্ত লজ্জাজনক হলেও এটাই সত্য যে এখনও মুসলিম প্রধান অঞ্চলে রাজনৈতিক দলগুলিকে ভোট পাওয়ার জন্য মুসলিম প্রার্থী দিতে হয়। এখানেও প্রার্থীর যোগ্যতার তুলনায় ধর্মীয় পরিচয় অগ্রাধিকার পেয়ে যায়। ধর্মীয় গোঁড়ামির উর্ধ্বে ওঠার পরিবর্তে ইমাম ভাতা, হজ যাত্রার ব্যবস্থা কোন দল করে দেবে তাতেই তারা বেশি আগ্রহী। তাদের অধিকাংশ ইমাম এবং ধর্মগুরুরাও বুঝে গেছে এই ভেড়ার পালকে ধর্মের আফিমে বুঁদ করে রাখতে পারলেই তাদের ইচ্ছেমতো কাজে লাগিয়ে নিজেদের মৌরসীপাট্টা কায়েম রাখা যাবে।

দলিত, SC, ST, OBC প্রভৃতি তথাকথিত নিচু জাতের মানুষও কিন্তু এই মূর্খতা করে চলেছে। ১৯৬৪ সালে দলিত নেতা মান্যবর কাঁসিরামজী পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য আন্দোলন শুরু করেন। তার এই লড়াইকে কুর্নিশ জানাতেই হয়। ১৯৮৪ সালে তিনি রাজনৈতিক দল গঠন করেন তার নাম ‘বহুজন সমাজ পার্টি’। এরপর মায়াবতীর হাত ধরে দল দ্রুত ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে থাকে। উত্তরপ্রদেশের ক্ষমতায় আসীন হয় বিএসপি, মুখ্যমন্ত্রী হলেন মায়াবতী। স্বাভাবিক ভাবেই দলিতরা তাদের আদরের ‘বেহেনজি’র মধ্যে মুক্তিদাতার ছবি দেখেছিলেন।

কিন্তু মায়াবতী গদিতে বসে চূড়ান্ত বিলাসবহুল জীবনযাপন শুরু করলেন। জনতার উন্নয়নের অর্থ দিয়ে সারা উত্তরপ্রদেশে মায়াবতী, কাঁসিরাম এবং তাদের রাজনৈতিক প্রতীক হাতির স্ট্যাচু নির্মিত হল। মায়াবতী সরকারের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের একটি PIL থেকে জানা যায় ৫২.২০ কোটি টাকা ব্যয় করে বিভিন্ন পার্কে প্রায় ৬০ টি হাতির স্ট্যাচু তৈরি করা হয়। ২০০৮-০৯ এবং ২০০৯-১০ বাজেট বরাদ্দের ২০০০

কোটি টাকার প্রায় ৯০% তিনি ব্যক্তিগত এবং দলীয় প্রচারে অপচয় করেছিলেন।

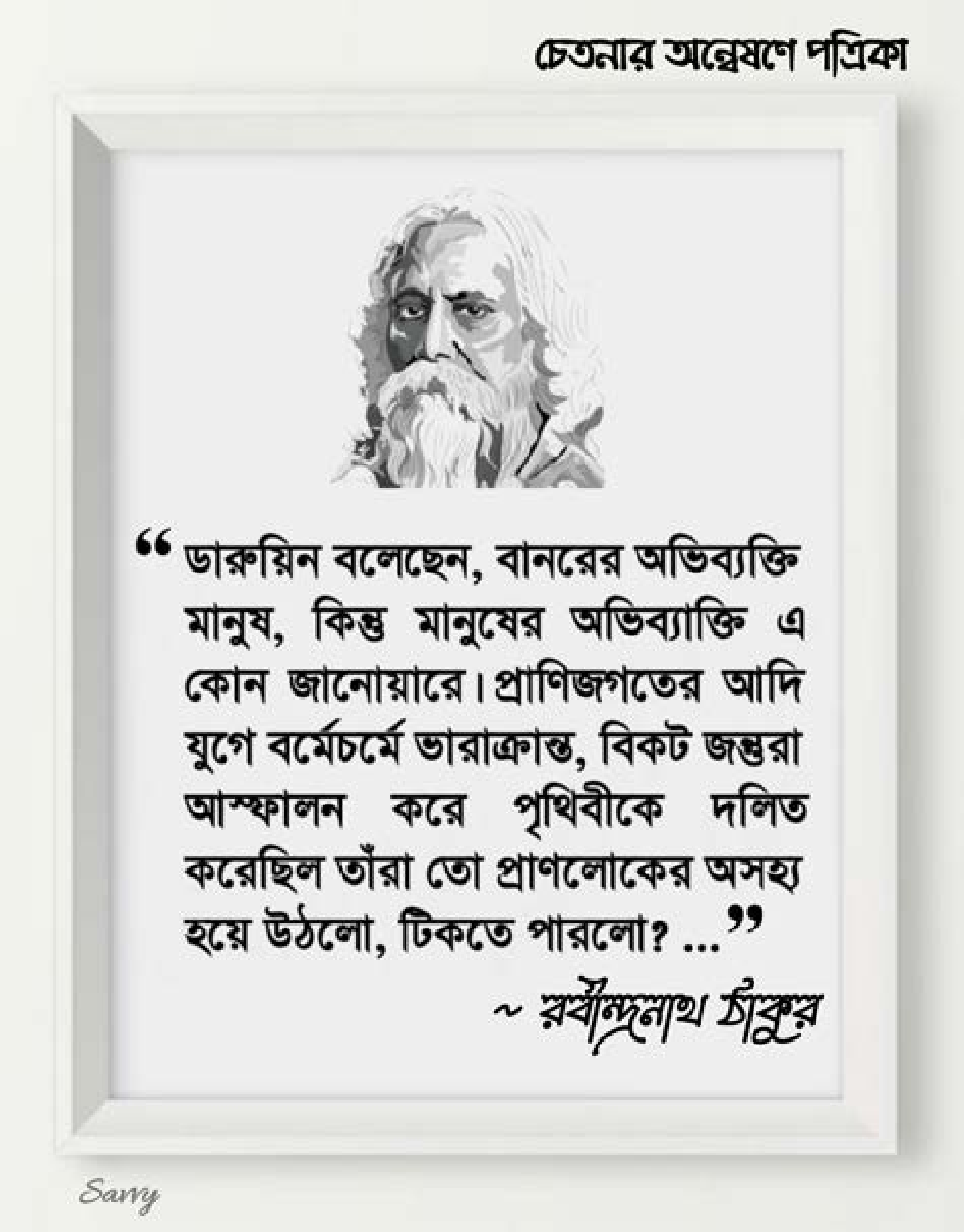
অথচ, এতকিছুর পরও দলিতদের কাছে তাদের 'বেহেনজি' একজন মসিহা। তারা বিএসপিকেই ভোট দেবে। দলিতদের সঠিক শ্রেণীচেতনা নেই বলেই তারা বুঝতে পারছেনা যে অর্থনৈতিক অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন মানুষের শ্রেণীচরিত্র বদলে দেয়। তাই কাঁসিরামের হাত ধরে যে যুব নেত্রী তাদের মুক্তির স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন আর যে মায়াবতী গদিতে বসেই ব্যক্তিগত প্রচার এবং দুর্নীতির চোরা স্রোতে ডুব দিলেন দুজন মানুষ এক হলেও কখনওই আইডিওলজিতে এক থাকেনি।

এ-ইপ্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। যে জননেত্রী বিরোধী থাকাকালীন কিছুটা হলেও মানুষের পাশে ছিলেন। সিপিএম সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করতেন। ক্ষমতায় বসার মাত্র ১১ বছরের ভিতরেই তিনি সিপিএমের ৩৪ বছরের রেকর্ডকে বহু পেছনে ফেলে দিয়েছেন।

শ্রেণীচেতনার অভাবে রাজনৈতিক নেতানেত্রীদের দেবতা বানিয়ে ফেলা সংক্রান্ত এই লেখা দক্ষিণ ভারতের রাজনৈতিক নেতাদের ছাড়া তো সম্পূর্ণ হতেই পারে না। ফিল্মস্টার হোক বা রাজনৈতিক নেতা, তাদের দেবতা বানানোয় দক্ষিণ ভারতের বিশেষত তামিলনাড়ুর জনতার জুড়ি মেলা ভার। এম.জি. রামচন্দ্রন, করুনানিধি বা জয়ললিতা সিনেমার নায়ক-নায়িকারা রাজনীতিতে নামতেই চূড়ান্ত সাফল্য পেয়েছেন। সাধারণ জনতা যখন অভুক্ত থেকেছে জয়ললিতা তখন টাকার গদিতে আরাম করেছে। সাধারণ মানুষের থাকার জায়গা নাই থাকতে পারে কিন্তু জয়ললিতার দেশি-বিদেশি জুতোর জন্যও আলাদা ঘর ছিল বলে তার ভক্তরা গর্ব করে থাকে। এমনকি তার মৃত্যুর পরে 'আম্মা'র শোকে অনেকে আত্মহত্যা করেছিল।

দুর্নীতিবাজ রাজনৈতিক ব্যক্তিদের জনতার চিনতে না

পারার একটাই কারণ তা হল সঠিক শ্রেণীচেতনার অভাব। সঠিক চেতনা না গড়ে উঠলে তারা একই ভুল করতেই থাকবে। বর্তমানকালের উঠতি নেতা অভিষেক ব্যানার্জি, কানহাইয়াকুমার, কেজরিওয়াল হোক বা আদিত্যনাথের বিরুদ্ধে ভোটে লড়া বারণ, তাদের ত্রুটিবিচ্যুতি বুঝতে হলে সঠিক রাজনৈতিক চেতনা গড়ে তুলতে হবে, তবেই নতুন ভারত গড়ে উঠবে।



নাস্তিক বনাম নাস্তিক

লিখেছেন - রাজু দত্ত



ভজহরিবাবু নাস্তিক। তিনি দৈনন্দিন জীবনযাপনে কোনওপ্রকার প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মীয় নিয়মকানুন মেনে চলেন না। কোনও উপাসনালয় যান না। ভূত-প্রেত-জ্যোতিষসহ সকল কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তার অকাট্য যুক্তির কাছে হার মানতে বাধ্য হন এইসকল বিশ্বাসীরা। বাবার মৃত্যুর পর তিনি 'শ্রাদ্ধ' জাতীয় অযৌক্তিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে জড়াননি। এমনকি চৌদ্দ দিনের 'অশৌচ বিধি'ও তিনি মানেননি।

তাঁর পাড়া প্রতিবেশী, বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন ও পরিচিত সকলেই জানেন যে ভজহরিবাবু ঘোর নাস্তিক। তবে তাঁরা কখনও তাঁকে এবিষয় কোনওরকম ব্যক্তি আক্রমণ করেন না। কারণ ভজহরি বাবু বিপদে আপদে সবসময় সবার আগে শত্রু-মিত্র সবার প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। তিনি বলেন, "আমি মানবতায় বিশ্বাসী। মানবতাই আমার ধর্ম।"

তিনি জোর জবরদস্তি কারো বিশ্বাসে আঘাত হানেন না। স্পষ্ট বলেন "আমার যুক্তি তুমি যুক্তি দিয়ে খন্ডন করে দেখাও, তাহলে আমি তোমার কথা মেনে নেবো।"। তারা জানেন ভজহরিবাবুর সাথে যুক্তি-তর্কে পেরে ওঠা অসম্ভব, তাই তাঁর সাথে তর্কে জড়ান না। তারা বলেন, "নাস্তিক বটে, তবে ভজহরিবাবুর মত মানুষ আজকের দিনে বিরল বৈকি।" এহেন ভজহরিবাবুর জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠল, তারই কয়েকজন ঘনিষ্ঠ 'নাস্তিক' বন্ধু বান্ধবের সৌজন্যে।

এই জনৈক নাস্তিকের ফেসবুকে একটি সাম্প্রতিক আলোকচিত্র (ফটো) পোস্ট করার পর যত গোলমালের সূত্রপাত। ছবিতে দেখা যাচ্ছে সস্ত্রীক একটি মন্দিরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সেই মন্দিরের পুরোহিতের সাথে তিনি কথা বলছেন। আসলে তিনি একটি জরুরী কাজে গিয়েছিলেন, ফেরার পথে জনৈক পরিচিত, যিনি পেশায় পুরোহিত তার সাথে কথা বলছিলেন। ব্যস্! একজন নাস্তিকের এহেন আচরণ মেনে নিতে পারলো না 'নাস্তিক সমাজ' এর অনেকেই। তারা ভজহরিবাবুর ছবিটির উৎস, কার্যকারণ কিছুই বিচার-বিবেচনা না করে ছবিটি ব্যাপক হারে শেয়ার করতে লাগলেন।

ছবির সাথে যে ক্যাপসনগুলি তারা লিখলেন তা দেখে অবাক হয়ে গেলেন ভজহরিবাবু। একজন লিখেছেন, 'সস্ত্রীক পুজো দিয়ে ফিরছেন নাস্তিক ভজহরি।" একজন লিখেছেন, 'নাস্তিকও মন্দিরে যায়, দেক্লে হবে খচ্চা আচে।" একজন বিনম্র নাস্তিক যিনি বিভিন্ন সময়েই সামাজিক- রাজনৈতিক আন্দোলনে তীব্র ফেসবুকীয় প্রতিবাদে সামিল হোন, তিনি তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে লিখেছেন, "এইসব ভন্ড নাস্তিকদের জন্য প্রকৃত নাস্তিকদের বদনাম হয়। এদের বয়কট করুন।" সরস ভঙ্গিতে একজন লিখেছেন, "ধর্মেও আছে, জিরাফেও আছে।"

উক্ত পোস্টগুলির কমেন্টবক্সে কমেন্টগুলিতে

ভজহরিবাবুর প্রতি তীব্র ঘৃণা, বিদ্বেষ ও বিদ্রুপ উপচে পড়ছে। কমেন্ট, পাল্টা কমেন্টের স্ক্রিনশট ঘুরে বেড়াচ্ছে ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপে। নাস্তিক-আস্তিক একযোগে আক্রমণ করেছে ভজহরিবাবুকে। ব্যতিক্রম বলতে মুষ্টিমেয় কয়েকজন নাস্তিক। যাঁরা ভজহরিবাবুর পক্ষে দাঁড়িয়ে মন্তব্য করছেন। তাদের সেই মন্তব্যের আবার স্ক্রিনশটও পোস্ট করছেন অন্য নাস্তিকরা। এইসব ব্যাঙ্গ-বিদ্রুপই কেন্দ্রবিন্দু এখন।

ভজহরিবাবুর জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠল। পথে-ঘাটে, বাড়িতে, অফিসে সর্বত্র তাকে কটূক্তি-অপমান সহ্য করতে হচ্ছে। আজ সকালে পাড়ার এক নাস্তিক বন্ধু তাকে 'নাসসস্তিকক্' বলে বিদ্রুপ করেছেন। উপস্থিত সবাই হো-হো করে হেসে উঠেছে। নাস্তিক ভদ্রলোক বললেন, 'নাস্তিক হওয়া অত সহজ নয় বুঝলি হরি, অনেক পড়াশোনা করতে হয়"। ভজহরিবাবুর বিরুদ্ধাচরণ করার একটা ট্রেন্ড শুরু হয়েছে যেন। নেতৃত্বে রয়েছেন তাঁরই কয়েকজন নাস্তিক বন্ধু-বান্ধব।

গভীর অস্ফুট যন্ত্রণার আবেগ আর মানসিক অবসাদে তাঁর যুক্তিবোধ ঢেকে গেল। তিনি এই দুর্দিনে কাউকেই পাশে পেলেন না। দু-একজন বন্ধুর (নাস্তিক) পরোক্ষ সান্ত্বনাতেও মানসিক অবসাদের কণামাত্র দূর হল না। বৃদ্ধ ভজহরিবাবু চরম সিদ্ধান্ত নিলেন। সকলের অলক্ষ্যে তীব্র বিষাক্ত কীটনাশক পান করলেন। তারপর...

না, মৃত্যু হয়নি ভজহরিবাবুর। তাঁর স্ত্রী, যিনি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে প্রবল আস্থাশীল এবং পাড়া প্রতিবেশীরা যারা সকলেই প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে বিশ্বাসী এদের তৎপরতা এবং মুষ্টিমেয় কয়েজন বন্ধুর (নাস্তিক) ঐকান্তিক সহযোগিতা ও সর্বোপরি ডক্টর সৈফুদ্দিন (নাস্তিক)-এর সুচিকিৎসায় তিনি বেঁচে গেলেন। তার এই কঠিন সময় মিশে গেলো আস্তিক-নাস্তিক সকলে। জয় হল মানবতার।

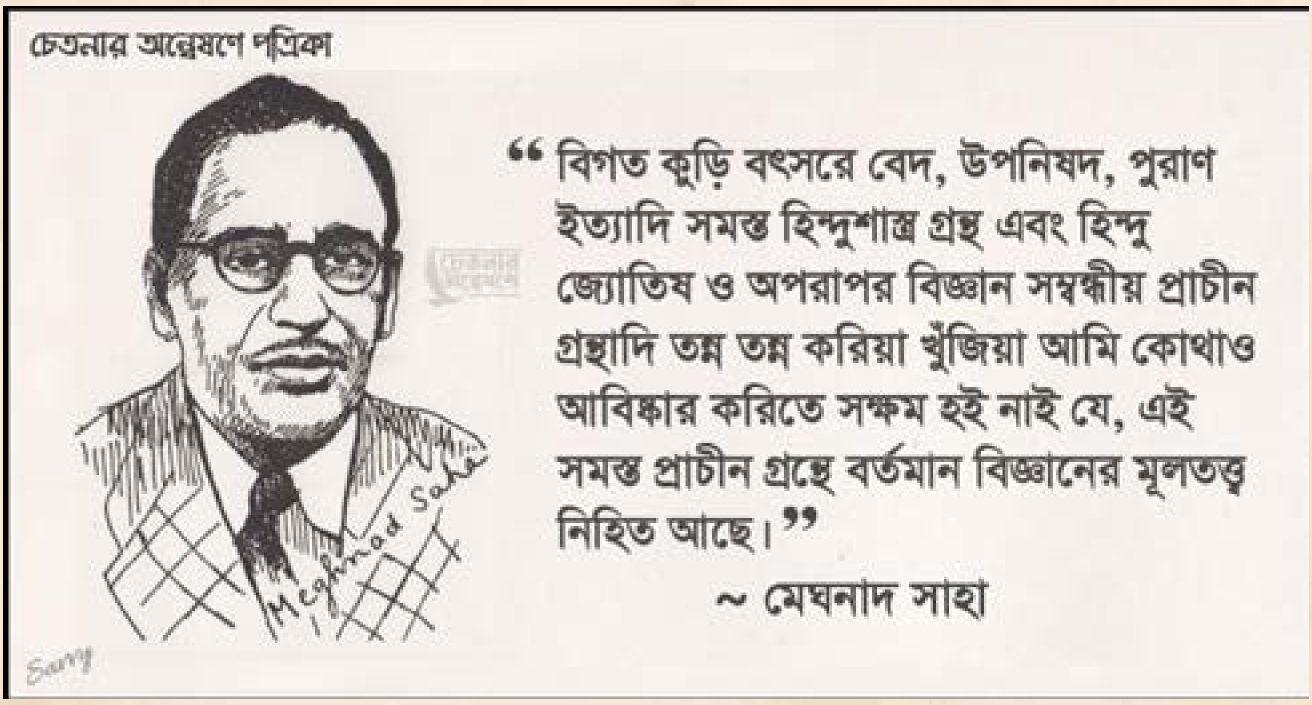
ভজহরিবাবুর গল্পটা কাল্পনিক। তবে সাম্প্রতিক সময় নাস্তিকদের এই রকম পরিস্থিতিতে পড়তে হয়। সবাই হয়ত আত্মঘাতী হবার মতো চরম সিদ্ধান্ত নেন না, কিন্তু একদল নাস্তিকের এইরকম আচরণে আর একদল নাস্তিককে চরম মূল্য দিতে হয়। নাস্তিক বনাম নাস্তিক লড়াইটা চলতেই থাকে।

দৈনন্দিন জীবনে আমরা যাদের সাথে পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কে জড়িয়ে তারা অধিকাংশ প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম, জ্যোতিষ, ভূত-প্রেতসহ বিবিধ কুসংস্কারে বিশ্বাসী। আমরা যে মুদি দোকান থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস কিনে থাকি ও রাত্রে পরিবারের যে সদস্যদের সাথে ঘুমোতে যাই, তাদের অধিকাংশই আস্তিক। তাদের সকলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হলে নাস্তিকদের নিজস্ব একটা পৃথিবী গড়ে তুলতে হবে রাতারাতি।

আমাদের পৃথিবীতে এখনও আস্তিকরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। শিক্ষক, চিকিৎসক, আইনজীবী থেকে সাহিত্যিক, অভিনেতা, সঙ্গীতশিল্পী, চিত্রশিল্পীসহ সকল সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গের অধিকাংশ আস্তিক। যে স্কুলে বা কলেজে আমরা পড়াশোনা করি, যে কর্মস্থল আমাদের উপার্জনের সম্বল, সেখানে আমাদের সহপাঠী ও সহকর্মীরা অধিকাংশই আস্তিক। ট্রেনে, বাসে, বিমানে, জাহাজে আমাদের সহযাত্রীদের অধিকাংশই আস্তিক। যে কৃষক ফসল ফলান, যে শ্রমিক পণ্য উৎপাদন করেন, আমাদের বাড়ি থেকে রাস্তাঘাট সমস্ত নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেন, যে সকল বিক্রেতাদের দোকান থেকে আমরা পণ্য ক্রয় করি, যে চালক আমাদের গাড়ি চালিয়ে গন্তব্যে পৌঁছে দেন, যে পরিচারিকা আমাদের গৃহকার্যে সহায়তা করেন, যে সকল মানুষ আমাদের অব্যবহার্য বর্জ্য পরিষ্কার করে পরিবেশ পরিষ্কার রাখেন, যে সেবিকা আমাদের অসুস্থতার সময় শুশ্রুষা করেন, তাদের অধিকাংশই আস্তিক। এদের সকলকে এড়িয়ে আমরা বাঁচতে পারবো কি?

মনে রাখবেন, নাস্তিকদের নিজস্ব পৃথিবী এখনও প্রতিষ্ঠিত

হয়নি। বিপুল সংখ্যক আস্তিকদের ভিড়েই তাদের থাকতে হয়। পৃথিবীর বাইরে গিয়ে তো থাকা সম্ভব নয়। কাজেই, সকলের কাছে আমার বিনীত আবেদন, একটি ছবি ভিডিও বা স্ক্রিনশট দেখিয়ে কোনও একজন নাস্তিককে রাতারাতি ভন্ড প্রমাণ করার চেষ্টা করবেন না। তার উৎস, কার্যকারণ সম্পর্ক বিবেচনা করে যদি প্রমাণিত হয় তিনি ভন্ড তবে এর দায় কেবল তাঁর। সকল নাস্তিকদের ঘাড়ে দ্বিচারিতার দায় চাপিয়ে তাঁদের আদর্শকে ভ্রান্ত প্রমাণ করার চেষ্টাও অনুচিত। মনে রাখবেন আগামী দিনগুলি কেবল মানবতার। সেখানে থাকবে না কোনও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের অস্তিত্ব। মানুষ বাঁচবে 'মানুষ' হয়ে।



পৃথিবীতে অক্সিজেনের উৎপত্তি

লিখেছেন – সৌমেন মন্ডল



পৃথিবীতে অক্সিজেনের উৎপত্তি নিয়ে এক ফেসবুকের বন্ধু প্রশ্ন করেছিলেন। সেই সূত্র ধরেই অক্সিজেনের উৎপত্তি নিয়ে একটা কোয়ালিটেটিভ আলোচনা করছি। খুব বেশি টেকনিক্যাল জারগণের মধ্যে না গিয়ে অল্প কথায় বোঝাবার চেষ্টা করছি।

প্রশ্ন যদি এটা হয় পৃথিবীতে অক্সিজেনের উৎপত্তি কোথা থেকে বা কী থেকে? তার উত্তর হবে একটাই সেটা হলো জল থেকে। জলের একটি অণু যথাক্রমে দুটি হাইড্রোজেন ও একটি অক্সিজেন পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত। এবার জলের অণু ভাঙতে পারলেই আমরা অক্সিজেন পেয়ে যাব।

পৃথিবী সৃষ্টির পরে পরে যখন পৃথিবীতে কোন প্রাণ ছিল না তখন পৃথিবীতে অক্সিজেন অণু এসেছে সূর্যালোকের উপস্থিতিতে জলীয়বাষ্পের বিয়োজনের জন্য যেটাকে আমরা

ইংরেজিতে photo dissociation of water molecule বলি। পৃথিবীর প্রথমদিকে বায়ুমন্ডলে ওজোন স্তর ছিল না কারণ অক্সিজেনও ছিল না ফলে অতিবেগুনি রশ্মির জন্য জলীয় বাষ্প ভেঙে অক্সিজেন উৎপত্তি হয়। সময়ের সাথে সাথে খুবই ধীরে ধীরে বাতাসে অক্সিজেন অণুর পরিমাণ বাড়তে থাকে। অতিবেগুনি রশ্মির উপস্থিতিতে জলের বিয়োজন পদ্ধতি একটি ধীর পদ্ধতি। যদিও অনেক সময় পাওয়ায় (কোটি বছর) বায়ুমন্ডলে অক্সিজেনের পরিমাণ ওজোন স্তর সৃষ্টি ও প্রাণীর উৎপত্তিতে ভূমিকা রাখার জন্য যথেষ্ট হয়। পরে যখন সালোকসংশ্লেষকারী ব্যাকটেরিয়া বা অণুজীবের উৎপত্তি হয় ক্লোরোফিল অণুর উপস্থিতিতে সূর্যালোক থেকে শক্তি ধরে জল বিয়োজনের ফলে অক্সিজেনের উৎপাদন আলাদা এক মাত্রা ধারণ করে। খুব সরলভাবে বললে অতিবেগুনি রশ্মির উপস্থিতিতে জলের photo dissociation cross section এর মান খুব বেশি নয়, ফলে এটি একটি ধীর পদ্ধতি। অন্যদিকে ক্লোরোফিলের উপস্থিতিতে জল বিয়োজন পদ্ধতির হার অনেক দ্রুত। যার ফলস্বরূপ আমরা বায়ুমন্ডলে অক্সিজেনের যা পরিমাণ দেখি তা সমুদ্রে উপস্থিত ক্লোরোফিলধারী বিভিন্ন অণুজীবরা দায়িত্ব নিয়ে উৎপাদন করে বহুকোষী প্রাণ সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে।

এইতো মোটামুটি খুব হালকাভাবে বোঝা গেলো পৃথিবীতে অক্সিজেনের উৎপত্তির কারণ। এইবার মনে প্রশ্ন আসে যে পৃথিবীতে জল এলো কোথা থেকে?

এই প্রশ্নের উত্তর পেতে গেলে আমাদেরকে পৃথিবী সৃষ্টির আগের মুহূর্তে যেতে হবে। সৌরজগৎ সৃষ্টির সবথেকে ভালো ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন বিখ্যাত গণিতবিদ ও পদার্থবিদ Pierre-Simon, marquis de Laplace, তিনিই প্রথম নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রকে অন্যভাবে উপস্থাপন করেন এবং বলের ধারণাকে পাল্টে মহাকর্ষ ক্ষেত্রের ধারণা দেন। তিনি সৌরজগৎ উৎপত্তির কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিখ্যাত নেবুলার স্বীকার্যের (nebular hypothesis) জন্ম দেন। এই

নেবুলার স্বীকার্য যা এখন মোটামুটি ভাবে একটি তত্ত্বে উপনীত ও বিজ্ঞানী সমাজে সর্বজনবিদিত। এই স্বীকার্য অণুসারে আদি সৌরজগৎ একটি গ্যাস ও ধূলিকণার ঘূর্ণায়মান চাকতি ছিল, বিভিন্ন অংশ মাধ্যাকর্ষণের জন্য একত্রিত হয়ে সূর্য ও যথাক্রমে অন্যান্য গ্রহ সৃষ্টি করেছিল। এইবার আমরা যদি গ্যাস ও ধূলিকণার উপাদানের দিকে তাকাই এই উপাদানের মুখ্য অংশ হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম এবং এর সাথেও অল্প পরিমানে উপস্থিত থাকে বিভিন্ন সরল জৈব, অজৈব যৌগসমূহ ও ক্ষুদ্র বরফকুচি ও জলীয় বাষ্প। গ্যাসের চাকতি থেকে পৃথিবী সূর্য অন্যান্য গ্রহ সৃষ্টি হওয়ার সময় প্রচুর পরিমাণে বড় বড় বরফের চাঁই সৃষ্টি হয় যার কিছু অংশ এখনও ধূমকেতু হয়ে এবং rockey object হয়ে asteroids belt-এ ঘুরে বেরাচ্ছে। পৃথিবী সৃষ্টির প্রথম দিকে এই বড় বড় বরফের উল্কা পৃথিবীতে এসে পড়ে এবং পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল জল যুক্ত করে। পরে পৃথিবী শীতল হলে এগুলো ঘনীভূত হয় সমুদ্রের সৃষ্টি করে। এই গেল মোটামুটি হালকা ভাবে পৃথিবীতে জলের উৎপত্তি।

এখানে একটা ঘটনা উল্লেখ না করলেই নয় Napoleon যখন Laplace এর কাজ দেখে জিজ্ঞাসা করে যে আপনার এই গাণিতিক কাজে ঈশ্বরের জায়গা কোথায়? তখন তিনি যে বিখ্যাত উত্তর দেন সেটি হল

"Sir, I have no need of that hypothesis."

(Napoleon asked Laplace where God fit into his mathematical work, and Laplace famously replied "Sir, I have no need of that hypothesis.")

আমরা আবার প্রশ্ন করতে পারি সৌরজগতের শুরুর দিকে যে গ্যাসের চাকতি ছিল তাতে জল এলো কোথা থেকে?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আমরা তারার মৃত্যু নিয়ে কথা বলব। বড় বড় তারাদের আয়ু অসীম নয়, তা আমরা বলতে পারি আমাদের মানুষের আয়ুকালের সাপেক্ষে সত্যিই অসীম। তারাদের মধ্যস্থ জ্বালানি শেষ হলে একসময় তাদেরও মৃত্যু হয়। তারার ভিতরে সাধারণত হাইড্রোজেন হিলিয়ামে পরিণত হয় এবং নিউক্লিয় সংযোজন এর কারণে উৎপন্ন

শক্তিতে তারা জ্বলতে থাকে। (এছাড়াও কার্বন-নাইট্রোজেন-অক্সিজেন চক্রের মাধ্যমে কিছু তারা শক্তি উৎপাদন করতে পারে এটি এখন আমরা আলোচনার মধ্যে আনছিনা)! এবার যখন তারার মধ্যে হাইড্রোজেন শেষ হয়ে আসে, তারা তাঁর তীব্র বেঁচে থাকার ইচ্ছার জন্য হিলিয়ামকেও সংযোজন করে অন্যান্য ভারী মৌল তৈরি করতে শুরু করে এবং এই পদ্ধতি চলতে থাকে যখন না সে লোহার নিউক্লিয়াস তৈরি করা শুরু করে। লোহা তৈরি হয়ে গেলে মৃত্যু পথযাত্রী তারার কফিনে শেষ পেরেকটি ঠোকা হয়ে যায়। কারণ লোহা হল এমন একটি মৌল যাকে বেচারা তারা আর সংযোজন করে অন্য মৌলে রূপান্তরিত করতে পারে না। তার জীবন মোটামুটি ভাবে ওখানেই শেষ হয় এবং তারার ভর অণুযায়ী তারাদের মৃত্যু বিভিন্নভাবে হয় যার গভীরে যাচ্ছি না। কিন্তু মোটামুটি ভাবে বললে এরপরে বিস্ফোরণের মাধ্যমে তারার মৃত্যু হয় এবং তারা মধ্যস্থ বিভিন্ন মৌল ও গ্যাস মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ে। পরে ওই উপাদান সমূহ মহাকর্ষের কারণে একত্র হয় এবং বিভিন্ন গ্যাস, জৈব ও অজৈব যৌগ, জল, বরফ ইত্যাদি সমন্বিত গ্যাসের মেঘ তৈরি করে মহাকাশে ভেসে বেড়ায়। যেহেতু তারার বিস্ফোরণের ফলে উৎপন্ন গ্যাসে অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি সহ অন্যান্য মৌলসমূহ থাকে এবং শীতল হওয়ার সময় তাদের মধ্যে বিভিন্ন বিক্রিয়া হয়ে যে সমস্ত উপাদান তৈরি হয় তা নতুন গ্যাস ও ধূলিকণার মেঘ তৈরি করে। মোটামুটি ভাবে এই হল মহাকাশীয় গ্যাসের মেঘে জল থাকার কারণ।

এইভাবে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে সময়ের চাকা ঘোরাতে ঘোরাতে বিগ ব্যাং অব্দি চলে যেতে হবে, যার সম্পর্কে জ্ঞান আমার একদমই নেই তাই এই গল্প এখানেই শেষ করে নোটে গাছ মুড়িয়ে পালাচ্ছি।

বিশদে জানতে আমি একটি বই সাজেস্ট করব। সেটি হল Carl Sagan's এর লেখা Pale Blue Dot।

সক্রেটিস এখনও জীবিত রয়েছেন

লিখেছেন – সাহাদাত হোসেন



একটি দেশের সরকার কেমন হবে সেটা নির্ভর করে সেই দেশের জনগণ কেমন তার উপরে। এই দেশের রাজনৈতিক দলের চরিত্র কেমন হবে সেটা নির্ভর করে সেই দেশের জনগণের চরিত্র কেমন তার উপরে।

কোন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান যখন উন্নত কোন দেশে সফরে যান তখন তার চরিত্র অবলোকন করে তারা বলে দিতে পারেন

সেই দেশের মানুষের চরিত্র কেমন। তাই কেবলমাত্র একটি দেশের ক্ষমতাসীন দল, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের চরিত্র দেখেই সেই দেশের মানুষের চরিত্র নির্ণয় করা যায়।

একটি উদাহরণ দিচ্ছি, পূর্বে আমাদের গ্রামে প্রতি রবিবারে সালিশের দিন নির্ধারণ করা হতো। কারণ ওই দিন আব্বার ছুটি ছিল। জি. এম. হবার কারণে পুরো জুট মিলের দায়িত্ব ছিল তার উপর। কঠোর পরিশ্রমের পর একটা দিন তার আরাম করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সেটিও সম্ভব হতো না। শনিবার দিন বিকালেই গ্রাম থেকে লোকজন এসে হাজির হত। বলতো, ভাই আগামীকাল সালিশে আপনাকে যেতে হবে। উনি যেতে চাইতেন না কিন্তু তারা নাছোড়বান্দা। বলতেন আপনি না গেলে আমরা ন্যায় বিচার পাব না। আপনাকে কষ্ট হলেও যেতে হবে। তাই তিনি যেতে বাধ্য হতেন।

চাকুরী থেকে পদত্যাগ করার কয়েক বছর পর গ্রামের কিছু লোক আব্বাকে বলল ভাই আমাদের গ্রামে চেয়ারম্যান নাই। আপনাকে আমরা চেয়ারম্যান বানাতে চাই। তিনি বললেন আমার অত টাকা পয়সা নাই এবং আমি টাকা পয়সা খরচও করতে পারবো না। তারা বললেন, আপনার কোন টাকা পয়সা খরচ করতে হবে না আমরা বিনা পারিশ্রমিকে আপনার জন্য কাজ করব। শুধু আপনি নমিনেশন এর টাকা জমা দিন।

তারপর যখন নির্বাচনী প্রচার শুরু হলো তখন আশেপাশের অঞ্চলের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থীরা গ্রামের বাড়ি বাড়ি ঘুরে বিভিন্ন মুরুব্বিদের পা ধরে সালাম করতে লাগলো। সিগারেটের প্যাকেট গুলো ডিল দিয়ে প্রত্যেককে দিতে লাগলো। চা-নাস্তার জন্য টাকা বিলি করতে লাগল। গ্রাম্য প্রভাবশালী ও দুর্নীতি বাজদের অর্থ দিয়ে দলভুক্ত করতে লাগল কিন্তু আব্বা এসবের কোনটাই করলেন না।

উনাকে এই ব্যাপারে বলা হলে তিনি রেগে যেতেন এবং বলতেন টাকা খরচ করে ও দুষ্কৃতিকারীদের তেল মেরে

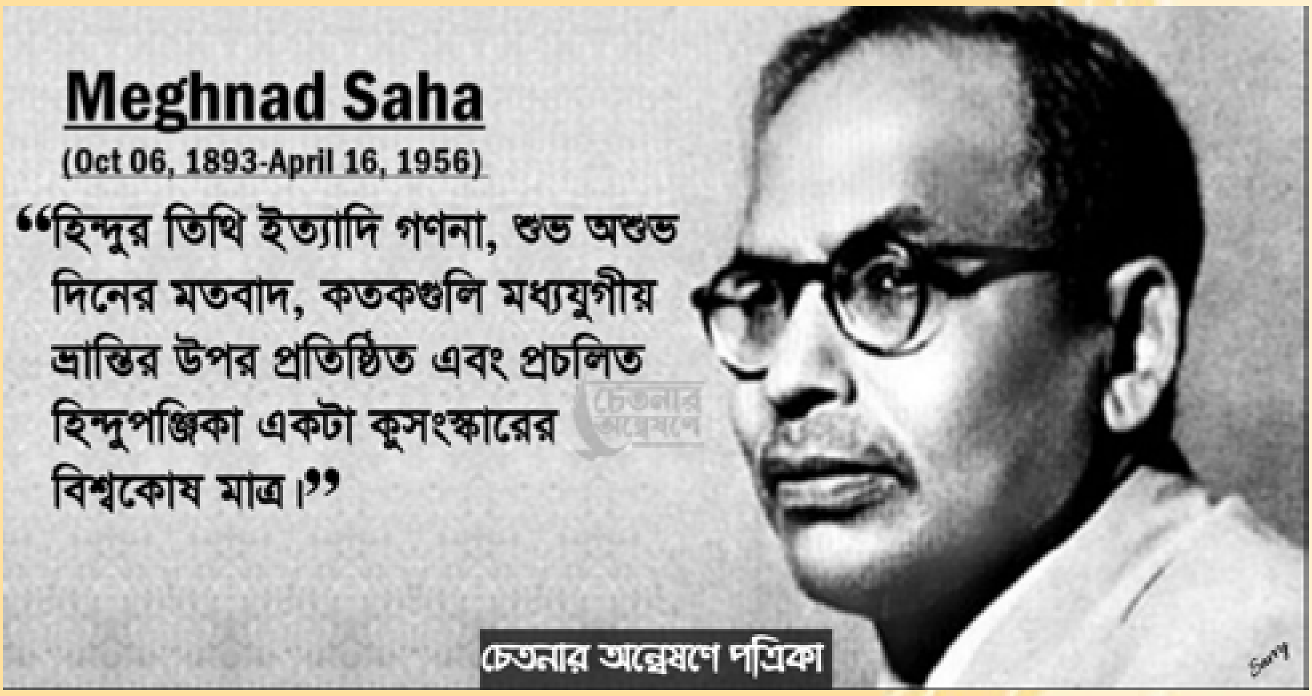
চেয়ারম্যান হবার কোন প্রয়োজন আমার নাই। আমি জনগনের অর্থ আত্মসাৎ করতে পারব না। জনগন যদি আমাকে যোগ্য মনে করে ও ভালবেসে ভোট দেয় তবে আমি চেয়ারম্যান হব। এই ইউনিয়নের মানুষ জানে আমি কেমন লোক এবং আমি তাদের কতটা উপকার করেছি। দুই চারজন বাটপারের কথায় তোমরা বিভ্রান্ত হইও না।

কিন্তু ইতিমধ্যেই এই সাধারণ মানুষ বলাবলি শুরু করে দিয়েছে, তোমারা দেখেছ রমিজ সাহেব কত অহংকারী। এখনই এই অবস্থা, না জানি চেয়ারম্যান হলে তার বাড়ির সীমানাতেও ঢোকা যাবে না। উনি এখনই আমাদের কাছে আসে না আর যদি একবার চেয়ারম্যান হয়ে যায় তাহলে তিনি ঢাকা শহরেই থাকবেন। আমাদের এইরকম যোগ্য লোকের দরকার নাই। ওই পাশের গ্রামের ফজলু চেয়ারম্যান অযোগ্য ও খারাপ হলেও আমাদের জন্য ভালো। যে যায় লংকায় সেই হয় হনুমান। আমরা ফজলুকেই ভোট দিব। নির্বাচনের দিন ফল ঘোষণা হলো। ইউনিয়নের অন্যান্য সেন্টারে উনার পাত্তাই নাই। উপরন্ত নিজ সেন্টারেই উনার অবস্থান তৃতীয়।

১৬ বৎসর পুর্বে আমাকে আমাদের থানার জাসাসের সভাপতি বানাতে চাইল। দাওয়াত পেয়ে অনিচ্ছা সত্বেও মিটিং-এ গেলাম। তারা নির্লজ্জভাবে তাদের এম. পি. সাহেবের চামচামি ও অন্য পক্ষের এম. পি.-কে গালিগালাজ করল। আমাকেও বক্তব্য দিতে বলল। আমি অপারগতা প্রকাশ করায় আরা বলল, আপনি এত জ্ঞান রাখেন অথচ কিছু বলতে পারলেন না। মূলত আমি এই ধরনের মানসিকতা অর্জন করি নাই। এদের সাথে তাল মিলিয়ে কোন ভাল মানুষ চলতে পারে না। যারা পারে তারা ভাল মানুষ হতে পারে না।

এই ধরনের অসচেতন জনগণকে নিয়ে রাজনৈতির দল, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ইত্যাদি গঠন করা ও সঠিক পথে পরিচালনা করা অত সহজ কাজ নয়। সমাজে সর্বাপেক্ষা মহৎ কাজ তারাই করছেন যারা স্বপ্রণোদিত হয়ে ও বিনাস্বার্থে মানুষকে সচেতন করার জন্য নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

সমাজে কিছু লোক এখনও বিদ্যমান রয়েছে যারা রাস্তাঘাট, পার্ক, রেস্টুরেন্ট, বাস ট্রেনসহ যেখানেই সুযোগ পাচ্ছেন সেখানেই মানুষকে সচেতন করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেন। ক্ষমতা ও পদ লোভহীন এই সকল ব্যক্তিরাই হল এই যুগের সক্রেটিস।



রামকৃষ্ণের পুনর্জন্ম, একটি যুক্তিবাদী অনুসন্ধান

লিখেছেন – অভিষেক ঘোষ



প্রথম পর্ব:

দক্ষিণেশ্বরের পুরোহিত গদাধর, রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, স্ত্রী সারদাদেবীকে বলেছিলেন, একশ বছর পর আবার আসবেন অর্থাৎ তাঁর পুনর্জন্ম হবে। এক প্রশ্নের উত্তরে সারদাদেবী বলেন "ঠাকুরের থাকবে সন্ন্যাসীর বেশ। তিনি যে বাউল বেশে আসবেন বলেছেন। বাউলবেশ – গায়ে আলখাল্লা, মাথায় ঝুঁটি, এতখানা দাড়ি। বললেন, বর্ধমানের রাস্তায় দেশে যাব, পথে কাদের ছেলে বাহ্য করবে, ভাঙা পাথরের বাসন হাতে, ঝুলি বগলে।" কথাগুলি প্রকাশিত হয়েছে উদ্বোধন কার্য্যালয় এর শ্রীশ্রীমায়ের কথায়।

আমরা শুনেছি, ভক্তরা বলে থাকে ব্রহ্মবাক্য নাকি মিথ্যা

হবার নয়। তারপর আস্ত ভগবান অবতারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গদাধরের বাক্য কখনও মিথ্যা হতে পারে একথা তো ভাবাই বাতুলতা!

আমরা যুক্তিবাদী। সব কিছু যুক্তি ও প্রশ্ন দিয়ে যাচাই করা আমাদের কাজ। তা গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুর হয়েছে ১৮৮৬ সালে। অবতারবরিষ্ঠ গদাধরের কথা সেই সঙ্গে 'জগৎমাতা' সারদার কথা যদি ব্রহ্মবাক্য হয় তাহলে একশো বছর, অর্থাৎ কিনা ১৯৮৬ সালে তাঁর পুনর্জন্ম হবার কথা। এবং বাউলবেশে, ঝুলি বগলে, বর্ধমানের রাস্তায় ঘুরে বেড়াবার কথা। আজকে ২০২৩ এ তাঁর বয়স হওয়া উচিৎ ৩৭ বছর। কই,আজ পর্যন্ত তো এরকম কোন বাউলকে দেখা গেল না!

এ তো গেল গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের নিজমুখে পুনর্জন্ম নেবার প্রথম অঙ্গীকার। দ্বিতীয় অঙ্গীকারও তিনি করেছেন কিন্তু! অন্নদাঠাকুর, স্বপ্নজীবন গ্রন্থে লিখেছেন রামকৃষ্ণ তাকে বলেছেন – "তোমার ভয় নেই, দেহরক্ষার বত্রিশ বছর পর আমি আবার বাংলায় যাচ্ছি। সেই দেহরক্ষার সত্তর বছর পর আবার, এইভাবে আরও এগারো বার অবতীর্ণ হব।" রামকৃষ্ণর এত নিকট ভক্তকে দেওয়া তাঁর কথা কি মিথ্যা হতে পারে! সেই হিসেবে ১৮৮৬ + ৩২ অর্থাৎ ১৯১৮ সালে রামকৃষ্ণের পুনর্জন্ম হবার কথা এবং বর্তমানে তাঁর বয়স হওয়া উচিত নয় নয় করে ১০৫। (কত বছর বেঁচে থাকবেন বলেননি,অবতার মানুষ সবই সম্ভব।)

রামকৃষ্ণ মিশনকে তো এখনও পর্যন্ত তাদের পরম আরাধ্যের নবকলেবর খোঁজার জন্য বিন্দুমাত্র তাগিদ নিতে দেখা গেল না! কারণ কী? রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষ কি স্বয়ং রামকৃষ্ণদেবের কথায় বিশ্বাস করে না? নাকি নব্য জ্ঞানের আলোকের তাঁরা পুনর্জন্ম, জন্মান্তর এসব কিছুতে আস্থা হারিয়েছে? দ্বিতীয়টি least possible, কারণ মিশন কোন ছার জগতের কোন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মই আত্মা, পরলোকবাদ, জন্মান্তরের কথা না বলে নিজেদের ধর্মপ্রচার চালাতে পারবে না। ধর্ম জিনিসটাই দাঁড়িয়ে আছে ইহলোক পরলোক, পাপের

ভয়, জন্মান্তরের সুখের ওপর। তাহলে কি প্রথমটিই ঠিক? অবশ্য আরেকটা কারণ হতে পারে মিশন প্রকাশিত বইগুলি মিশনের লোকজনই ভাল করে পড়ে দেখেনি! নাহ, এটাও মনে হয়না। এগুলো পাঠক্রমের অধ্যবসায়ে ওদের পড়তে হয়। তাহলে দাঁড়াল কী? মিশন সব জেনেও, না জানার ভান করে আছে। যুক্তিবাদী প্রবীর ঘোষ লিখছেন - "সারদা মা'র প্রতি রামকৃষ্ণদেবের এই ধরণের বক্তব্যকে বর্তমানে মিশন কর্তৃপক্ষের কাছে অসার মনে হলে মিশন কর্তৃপক্ষের কি নৈতিক দায়িত্ব ছিল না, এই বিষয়ে মতামত স্পষ্টভাবে ভক্তদের কাছে ব্যক্ত করা? নাকি রামকৃষ্ণদেবের নবকলেবর আবির্ভাব বিষয়ে নীরবতার পিছনে ক্রিয়াশীল রয়েছে অর্থ ও কর্তৃত্ব হারাবার শঙ্কা?"

একবার ভেবে দেখুন রামকৃষ্ণ যদি হঠাৎ এই তৃণমূল-বিজেপি অলঙ্কৃত বাংলায় আবির্ভূত হয়ে মিশনের যাবতীয় সম্পত্তির (ইনটেলেকচুয়াল ও ফিজিকাল) অত্যন্ত সঙ্গত অধিকার দাবি করে বসেন তাহলে কী কী হতে পারে! তাই কি মিশন কর্তৃপক্ষ উক্ত ভবিষ্যতবানীটি নিয়ে কথা বলতে নারাজ?

১৯৮৯ সালের ২৭ আগস্ট প্রবীর ঘোষ গিয়েছিলেন বেলুড় মঠে স্বামী ভূতেশানন্দের কাছে এবং এই প্রশ্ন তুলেছিলেন। তাতে উত্তরের পরিবর্তে তিনি উষ্মা প্রকাশ করেন, তাঁর সচিব উন্মত্তের মত রাগ প্রকাশ করে প্রবীর ঘোষের ওপর। সম্ভবত সব ভক্তিবাদী যুক্তিহীনদের মতই উত্তর দিতে না পারার ব্যর্থতা ক্রোধ হিসেবে প্রকাশ পায়।

দ্বিতীয় পর্ব:

সারদাদেবী ও অন্নদা ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বরের পূজারী বামুন রামকৃষ্ণ বলেছিলেন তিনি আবার জন্ম নেবেন। হ্যাঁ সময়ের হেরফের ছিল, কিন্তু জন্ম যে নেবেন এ'কথা স্থিরনিশ্চিত। রামকৃষ্ণের নামে চলা সংস্থা, রামকৃষ্ণ মিশনের

এই নিয়ে কোনরকম মাথাব্যথা দেখি না। অন্য কথায় স্বয়ং রামকৃষ্ণকথিত ব্রহ্মবাক্যকেই তারা অগ্রাহ্য করেছে, এবং রামকৃষ্ণের নবকলেবর সন্ধানে সচেষ্টতা দেখায়নি।

রামকৃষ্ণের নবজন্ম নিয়ে মিশন মাথাব্যথা না করলেও অনেকেই কিন্তু করেছে। ১০ জুলাই ১৯৮৭ সালে যোগী যোগানন্দ সর্বতীর্থ নামে এক ব্যক্তি, বর্ধমানের একজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে এক এফিডেবিট করে দাবি করেন – " যুগাবতার শ্রী শ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব লীলা সংবরণ করার পর পুনরায় নবকলেবরে সপার্ষদ একশত বৎসর গতে অবতীর্ণ হওয়ার বৃত্তান্ত আমি অপ্রাকৃতিক জ্ঞানচক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং তাহাদের বর্তমান স্থুল শরীরের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব কোন ব্যক্তি বা সংস্থা গ্রহণ করলে আমি তাঁহাদের শনাক্ত করিতে সক্ষম, ইহা আমার জ্ঞান মতে সত্য।"

শুধু এফিডেবিট করে থেমে না থেকে তিনি চিঠি লিখেছেন মিশনের গম্ভীরানন্দকে। যোগানন্দের কথায় তিনি দৈব আদেশে রামকৃষ্ণের ইচ্ছা অনুযায়ীই জনগণকে জানাতে চান রামকৃষ্ণ সপার্ষদ জন্মেছেন। তিনি নিজে নাকি গতজন্মে ছিলেন রামকৃষ্ণ পার্ষদ লাটু /অদ্ভুতানন্দ। গানন্দ, মিশনের সঙ্গে যোগাযোগ ছাড়াও কলকাতায় প্রবীর ঘোষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন যাতে তিনি যুক্তিবাদী সমিতিকে সঙ্গে নিয়ে এই বিষয়ের তদন্তে নামেন।

বলা বাহুল্য তাঁর এই 'মহতী' প্রয়াসে রামকৃষ্ণ মিশন গা করেনি।

অন্য এক ব্যক্তি, ইনিও বর্ধমানের বাসিন্দা, যোগী তিমিরবরণ, রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতির কাছে এক লিখিত আবেদন রাখেন, ১৬ নভেম্বর, ১৯৮৭ তে। বিস্তারিত আবেদনটিতে আরও অনেক কথার সঙ্গে, তিনি বলেন রামকৃষ্ণ মিশন যদি মনে করে রামকৃষ্ণের বাক্য ব্রহ্মবাক্য তাহলে তাদের উচিত রামকৃষ্ণের পুনর্জন্ম বিষয়ে অনুসন্ধান করা। তিনি এও জানান, রামকৃষ্ণ কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন তাঁর মৃত্যুর পর

যেদিন পঞ্চবটীর ডাল ভেঙে আসনে পড়বে, সেদিন তিনি আবার জন্ম নেবেন,আজ ৬৫ বছর হল ডালটি ভেঙে পড়েছে কিন্তু কোন হিন্দু ধর্মাবলম্বীর কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। তিনি খেদ প্রকাশ করেন এই বলে যে, "পুনরাবির্ভাবের যদি মূল্যায়ন না হয় তাহলে হয় রামকৃষ্ণ তত্ত্ব মিথ্যা, নয়তো মিশনের আধিকারিকরা দিব্যচক্ষুর অধিকারী নয়, অথবা হয়তো সব জেনেই তারা গদীর মোহে আকৃষ্ট থেকে ঠাকুরকে লোক সমক্ষে প্রতিষ্ঠা করছে না।"

প্রসঙ্গত পঞ্চবটীর ডাল ভেঙ্গে যাওয়া এবং রামকৃষ্ণের পুনর্জন্ম নেবার কথাটি অন্নদাঠাকুর তার আত্মজীবনী 'স্বপ্নজীবনে'ও বলেছেন। রামকৃষ্ণের পুনর্জন্ম নিয়ে তদন্ত করতে প্রবীর ঘোষ বর্ধমান যান ১৯৮৯ সালে। আশ্চর্যজনক ভাবে এখানে উনি দু'জনের দেখা পান যাদের দাবি তারাই রামকৃষ্ণের পুনর্জন্ম!

প্রথমজন ভোলানাথ অধিকারী, জন্ম ১৯৩৪। একমুখ গোঁফ দাড়ি, কথায় গ্রাম্য ছোঁয়া। আলাভোলা ভাব। প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান – "রামকৃষ্ণ-ই যে রামকৃষ্ণ, সেটা আবার রামকৃষ্ণ কেই প্রমাণ করতে হবে! ভারি মজার তো! রামকৃষ্ণ মিশন! আমার নামে মিশন! ওরা তো সব মরছে গু ঘেঁটে। মরুক ওরা ক্ষমতা আর ভোগ নিয়েই। আমাকে নিয়ে গেলে ওদের সব এক একটাকে (ছাপার অযোগ্য)..."

দ্বিতীয়জন নীলমণি বন্দোপাধ্যায়। হোমিওপ্যাথি করেন। ইনিও বর্ধমানের বাসিন্দা। দরিদ্র। রামকৃষ্ণের মত দাড়ি। প্রশ্নের উত্তরে তাঁর গলাতেও একই সুর। "আমি যে গত জন্মে রামকৃষ্ণ ছিলাম এ'কথা প্রমাণ দিতে পারি। নিয়ে আসুন রামকৃষ্ণ মিশনের মাথাদের, আমার নাম ভাঙিয়ে যারা করে কম্মে খাচ্ছে। ওইসব ক্ষমতালোভী, অর্থলোভীগুলোকে আমি বিশ্বাস করি না। ওরা কখনওই আসবে না।" কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন তিনি যে রামকৃষ্ণ তা জানিয়ে চিঠি লিখেছেন

রাজীব গান্ধী, প্রণব মুখার্জি, বরুণ সেনগুপ্ত ইত্যাদিদের। তাঁর বাড়ির ছয় ফুট নীচে নাকি রয়েছে শিব মন্দির, তাতে শিবলিঙ্গ ও মোহর ভর্তি ছয়টা সোনার ঘড়া। বাড়ির দেওয়ালে ফ্রেমে বাঁধানো তিনটি ছবি। ছবিতে দেখা যাচ্ছে উনি তন্ত্র, মুসলিম ও খ্রীস্টান মতে সাধনা করছেন। "মিশনকে জানাব, তারা এসে পরম সমাদরে ঘড়া সমেত আপনাকে নিয়ে যাবে" বলে বেরিয়ে পড়েন প্রবীর ঘোষ।

এখন যুক্তিবাদীদের খুব ছোট্ট একটি প্রশ্ন রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষের কাছে, "ব্রহ্মবিদ", "অবতারবরিষ্ঠ" মিশনের পরমারাধ্য রামকৃষ্ণদেবের "দৈববাক্য" কে যথাযথ মর্যাদা দিয়ে, মিশন কবে রামকৃষ্ণদেবের নবকলেবরকে 'সপার্ষদ' মিশনে এনে সশ্রদ্ধায় বরণ করবে? নাকি তারা আগের মতই প্রশ্নটি এড়িয়ে গিয়ে তাদের পরমারাধ্যেরই বাক্যে চূড়ান্ত অবিশ্বাস প্রমাণ করবে? জানার অপেক্ষা রইল।

সহায়ক গ্রন্থ;
১.স্বপ্নজীবন
২. অলৌকিক নয় লৌকিক চতুর্থ খন্ড

সংস্কার-মুক্ত-সমাজ

লিখেছেন-মহম্মদ মহসীন



কিছু কিছু কথা আছে, শুনলে হাসি রোখা যায় না। যেমন গ্রামে হবে এক ধর্মসভা। বক্তা কে? একজন মৌলভি মৌলানার নাম, কোন মাদ্রাসায় তার শিক্ষা, কী কী তার ডিগ্রী এইসব বড় বড় অক্ষরে, নীল লাল বেগুনি সবুজে ছাপা। একটা বিশেষণে কিন্তু হাসি আর চেপে রাখা যায় না। সেটি হ'ল, তার মতো যুক্তিবাদী বক্তা খুবই কম আছে। তার সমস্ত যুক্তিই অকাট্য। কোরাণ হাদিসের বাইরে এক মিলিমিটারও তিনি বেরিয়েছেন, এ অপবাদ তার ঘোরতর প্রতিযোগী মৌলানা মৌলভীরাও করতে পারে না।

এইহলো যুক্তিবাদ সম্বন্ধে মুসলিম জনসমাজের ধ্যানধারণা।

এবার একটু মুসলিম জনসমাজ থেকে বেরিয়ে দেশের বিভিন্ন শিক্ষিত জনের ভাবনার দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক।

কুসংস্কার দূরীকরণ বলতে তারা কী বোঝেন? ঐ সাপে কাটলে ওঝার কাছে যাওয়া নয় হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। তেলপড়া জলপড়া নয় ডাক্তারের ওষুধ খাওয়াতে হবে। কোন ডাক্তার? এলোপ্যাথি, হোমিয়োপ্যাথি, আয়ুর্বেদিক, ইউনানি, চাইনিজ, জাপানিজ, যেকোনও ডাক্তার হলেই চলবে, নামের আগে ডাক্তার লেখা হলেই হলো। জলপড়া, তেলপড়ার মতো হোমিওপ্যাথি যে স্রেফ ওষুধবিহীন চিকিৎসা এইটুকু বললেই সেই সব কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারিরাও রে রে ক'রে তেড়ে আসে। হোমিও খেয়ে যে তার নিজের, নিজের বাবা-কাকা- দাদু- দিদার কিংবা অপরের বাবা-মা- কাকা- জ্যেঠা কতজনের যে রোগ নিরাময় হয়েছে, তার না কি থই পাওয়া যায় না।

কুসংস্কার বলতে আপামর শিক্ষিতজনের চিন্তাস্রোত এমনই গড্ডালিকাপ্রবাহিনী। কিছু মানুষ আছেন, সমাজে তারা কেউকেটা। এই যেমন সরকারী বিজ্ঞান সংস্থার উচ্চপদাসীন, নামকরা চিকিৎসক, বিজ্ঞান পড়ানো টিচার। তারা সব ধরে ধরে রাস্তায় চলার পথে কালো বেড়াল দেখলে কেন থামতে হয়, পিছন থেকে ডাকলে কেন যেতে নেই, এক শালিক দেখলে কেন কাজ সফল হয় না, ডিম খেয়ে কেন পরীক্ষা দিতে যেতে নেই, গর্বের সাথে সে সবের বড় বড় বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়ে পাণ্ডিত্য ফলিয়ে থাকেন। নিজেকে কুসংস্কারহীন, বিজ্ঞানমনস্ক, বিজ্ঞানকর্মী বলে পরিচয় দেন। এইসব মণীষীগন বিজ্ঞান আন্দোলনের যে কত ক্ষতি করেন তার মাপ পরিমাপ নেই। বিভিন্ন বিজ্ঞান সম্মেলনে, জ্যোতিষীর দেওয়া রত্নপাথরের শোভা নিয়ে ঘোরাঘুরি করতেও এরা নি:সঙ্কোচ।

কেউ কেউ আছেন, একটা বিজ্ঞান সংস্থার কর্ণধার, সর্বেসর্বা, এরা বিজ্ঞানসম্মত ভাবে, গ্যাজেট নিয়ে ভূত ভগবান শয়তান নিয়ে গবেষণা করেন, নিদেনপক্ষে সেইসব

বিজ্ঞানীদের প্রমোট করে থাকেন। এই সব অপবিজ্ঞানের ধ্বজাধারিদের।

সমাজে চোর ডাকাত জোচ্চররা ঠিক কতটা ক্ষতি করে তা ঠিক পরিমাপ করতে পারি না, কিন্তু এই স্বার্থান্বেষী বিজ্ঞানী, বিজ্ঞানকর্মীগুলো ভূত-প্রেত-স্বার্থান্বেষীদের বিজ্ঞানকর্মী, বিজ্ঞানানুসন্ধানী বলে সমাজ মাধ্যমে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার ছলে ভট্টাচাজ্জিগিরি করে বিজ্ঞান চেতনার পথ থেকে পৃথিবীকে হাজার বছর পিছিয়ে নিয়ে , যাচ্ছে তা কিন্তু নিশ্চয় করে বলা যায়।

সমাজমাধ্যমে এইরকম মুখোশপরা সেলিব্রিটি "কুসংস্কারমুক্ত" মেকি কুসংস্কারবিরোধী লোক বিজ্ঞানমনস্কতা নির্মাণের পথে রঙচঙে দেওয়ালবিশেষ। কুসংস্কারমুক্ত সমাজ গড়তে হলে এই লোকগুলিকে মোকাবিলা করতে হবে, বিজ্ঞান আন্দোলনে সেটাও এক গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

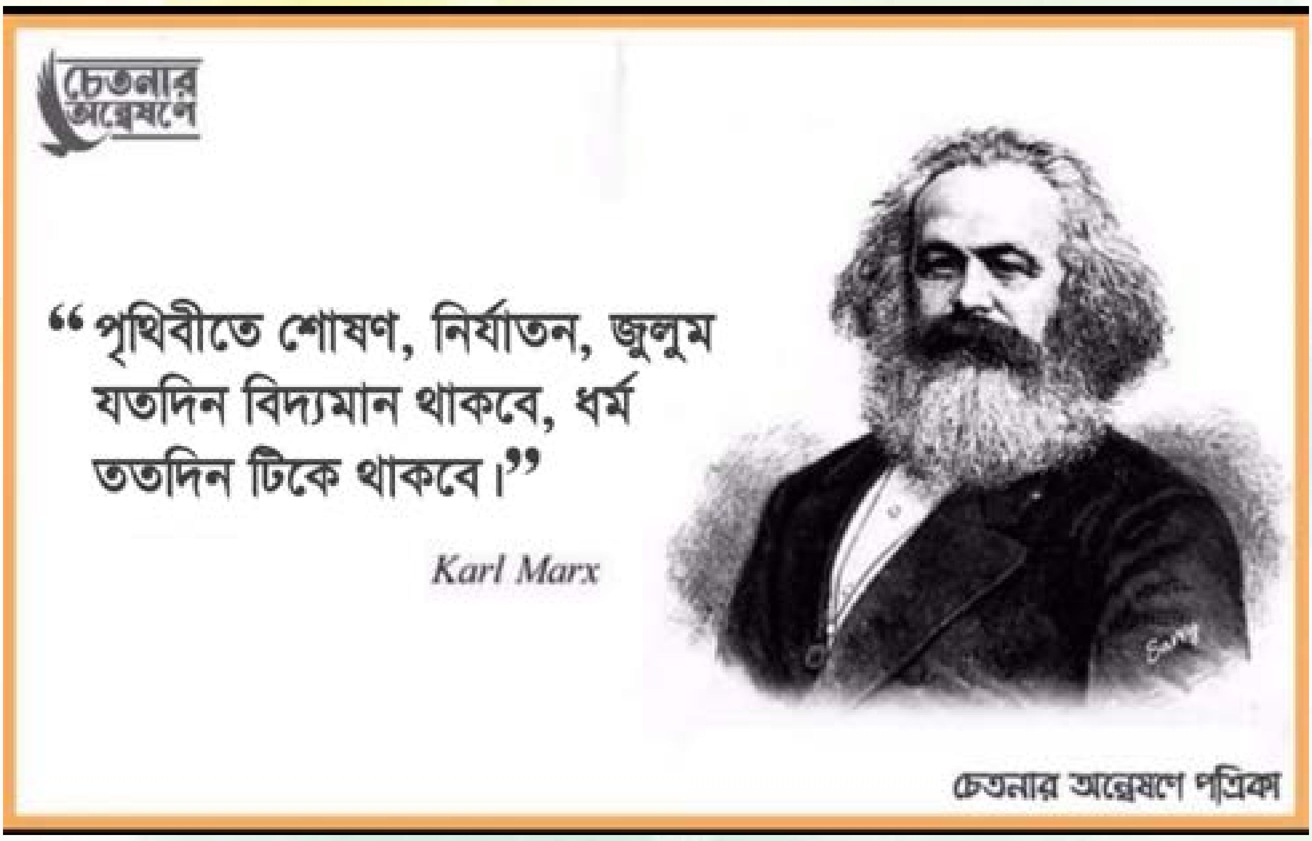
কুসংস্কারমুক্তির জন্য তাহলে কী চাই? চিকিৎসক হতে হবে? অনেক ডাক্তারকে দেখবেন মাদুলি নিয়ে ঘুরছেন। তিনি নিজে ডাক্তার, অথচ পীরবাবা, মৌলানা-মৌলভীদের দেওয়া মাদুলি পরে বসে আছেন। তাহলে কি বিজ্ঞানী হতে হবে? নোবেল জয়ী বিজ্ঞানী বলছেন, কুলদেবতা ঠাকুর তাকে থিসিস যুগিয়ে চলেছে। তাহলে কি টিচার হতে হবে? টিচাররাও শিশুদের বাগদেবীর আরাধনার উপদেশ দিচ্ছেন। তাহলে কি হতে হবে?

আমার মনে হয়, পাঠক হতে হবে। ভাল ভাল বই আছে সেগুলি প্রতিনিয়ত পড়তে হবে।

আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলেই প্রচুর বই আছে। সেগুলি পড়তে হবে। যার যেখানে সম্পর্ক আছে এইসব বইয়ের সন্ধান দিতে হবে। পড়তে তাগিদ দিতে হবে। শিশুদের তো বাবা-মা- পরিবার-প্রতিবেশী কুশিক্ষা দেয়। কুসংস্কারের আঁচে ধোঁয়া দেয়। শিক্ষিত পরিবারেও এতটুকু বিজ্ঞানমনস্কতার

পরিবেশ পরিশীলনের অবকাশ নেই। প্রতিটি পরিবারে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-নবীদের কথা-হাদিসের গল্প গুলো শিশুদের চরিত্রগঠনের দায় চাপিয়ে দিয়ে দায়িত্ব পালন করে চলেছে। বিষের বীজ এভাবেই অঙ্কুরিত হচ্ছে শিশুমনে। কুসংস্কারমুক্তির জন্য চেতনার চাষ করতে আগে এইসব রামকৃষ্ণ হাদিস বিবেকানন্দ নবী সদৃশ আগাছা আমূল তুলে ফেলা দরকার। এ কাজটা খুব জরুরি। কিন্তু আগাছা নিকাশ করা অত সোজা নয়। তাই বিজ্ঞানকর্মীদের দায়িত্ব অনেক অনেক বেশী।

আমাদের এই কাজটা বড় চ্যালেঞ্জিং কাজ। তবু মনে প্রত্যয়, উই শ্যাল ওভারকাম।



অশৌচের নিয়ম কানুনেও ব্রাহ্মণদের সাথে অন্য বর্ণের এত ফারাক কেন?

লিখেছেন - শম্ভুনাথ চার্বাক



পূর্বে সমাজ ছিল প্রায় অনড় স্থির। জীবিকা অর্জনের উপায় ছিল খুবই সামান্য। সেই সময়ে বর্তমানের মতো মৃতের ডেথ সার্টিফিকেট এর ব্যবস্থা ছিল না। মৃতের উত্তরাধিকার নির্ণয়ের জন্য সামাজিক শংসাপত্র ছিল সাদা থান পরিধান করে ঘোরা এবং লোককে জানান দেওয়া। সন্তানসম্ভবা মহিলার সাধ ও বাচ্চার অন্নপ্রাশন একই ধরণের অর্থাৎ আগামী উত্তরাধিকারীর পরিচিত ঘটানোর জন্য। ঐ সাদা থান পরিহিত ব্যক্তি দেখলেই বুঝি সেই ব্যক্তির পিতা বা মাতার বিয়োগ হয়েছে। যদিও বর্তমানে কিছু মানুষ এই সাদা কাপড় ভিক্ষা জীবিকা অর্জনের উপায় হিসেবে ব্যবহার করে। মৃতের জন্য মৃতের পুরুষ সন্তানদের অশৌচে ব্রহ্মচর্য পালন করতে হয়, নারীদের কোনও অধিকার নেই। অশৌচের ক'দিন একবেলা আতপ চালের মণ্ড কাঁচাকলা সেদ্ধ ও ফলমূল খেয়ে শরীরকে কষ্ট দিয়ে অতিবাহিত করতে হয়। ব্রাহ্মণরা কিন্তু দুধ-ঘি-মিষ্টি যোগে ভাল করে খায়। এখানেও ব্রাহ্মণদের সাথে অন্য বর্ণের

লোকেদের ফারাক ছিল।

আবার পালনের দিন সংখ্যাতেও অনেক ফারাক ছিল, যথা- ব্রাহ্মণ-১০ দিন, ক্ষত্রিয় -১২ দিন, বৈশ্য - ১৫ দিন, শূদ্র- ৩০ দিন অর্থাৎ সব থেকে গরীব যে শ্রেণী সেই শ্রমজীবী শূদ্র মানুষদের কাজ থেকে বিরত রেখে কু-খাদ্য খাইয়ে শরীর শেষ করিয়ে এক্কেবারেই শেষ করে দেওয়ার রীতি। দুধে ভাতে থাকা ব্রাহ্মণদের এই কম দিনের সুবিধা কেন? এই প্রশ্ন কোনও শূদ্র করে না, শুধু গাধার মতো ভার বয়ে যায়। বর্তমানে সমাজ অনেক গতিশীল, বৃত্তির পরিবর্তন হয়েছে অনেক। পারিবারিক বৃত্তিতে থাকাও সবার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। এখন চর্মকারের পরিবারের সন্তান শিক্ষক ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছেন আবার ব্রাহ্মণ সন্তান জুতোর/মাছের দোকান খুলে বসেছেন, বেয়ারা/ঝাড়ুদাড়ের কাজ করছেন। বৈদিক যুগে ঋক বেদের দশম মণ্ডলে জাতপাতের ভেদাভেদ দৃঢ় করা হয় এবং তখন থেকেই ভারতীয়দের পতন শুরু হয়। সমাজের এক বিশাল সংখ্যক মানুষকে শূদ্র নামে অভিহিত করে তাদের শ্রম চুরি করে, তাদের শিক্ষাঙ্গন থেকে বাতিল করে ক্ষত্রিয় শাসক ও সহযোগী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের গুটি কয়েক পরিবার ধনী হয়ে ওঠে।

গীতার অনেক শ্লোক এর পক্ষেই প্রচার করে এবং সরাসরি জাতপাতের ভেদাভেদকে সমর্থন করে। যাদের দমিয়ে রাখার জন্য এই প্রতিক্রিয়াশীল গ্রন্থগুলি তারাই গীতাকে মাথায় করে রাখে। মনুস্মৃতির মত প্রতিক্রিয়াশীল গ্রন্থ ব্রাহ্মণদের দ্বারাই রচিত শূদ্র ও অন্যান্য বর্ণের লোকেদের ওপর প্রভুত্ব করার জন্য। ভারতবর্ষকে পিছিয়ে দেওয়ার কারণও জাতপাতের ভেদাভেদ এবং নিয়তিবাদ। প্রতিবাদ ও ধ্বনিত হয়েছিল চার্বাকদের আন্দোলন ও পরবর্তীকালে বেদ বিরোধী বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের মানুষদের আন্দোলনে, ফলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম কিছুটা স্তিমিত হলেও শৈব মতাবলম্বী গুপ্ত

সম্রাটদের উত্থানে ও সহযোগিতাতে চতুর্থ শতকে পুণরায় সমাজ ব্রাহ্মণদের কুআচার কুসংস্কার অন্ধবিশ্বাসের দখলে চলে যায়। বাংলাদেশে শৈব মতাবলম্বী শশাঙ্কের উত্থান ও অত্যাচারে বৌদ্ধ ধর্মের অধঃপতন শুরু হয়। শশাঙ্ক নির্বিচারে বৌদ্ধ মঠ ধ্বংস করেন এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুদের হত্যা করেন। এর ফলে ব্রাহ্মণদের কুআচারের শাসন বাংলাদেশেও শূদ্রদের গলা টিপে ধরে। সেন যুগে বল্লাল সেনের সহযোগিতাতে ব্রাহ্মণদের রমরমা চলতেই থাকে। মাঝে পাল যুগে বৌদ্ধদের আধিপত্য বজায় ছিল। অর্থাৎ শাসকের সহায়তা ভিন্ন ধর্ম এগোতে পারে না। পরবর্তীকালে ইংরেজদের আগমনে এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে এসে মানুষের চিন্তাভাবনাতেও পরিবর্তন আসে। ধনতন্ত্রের আগমনে সামন্ততন্ত্রের কুসংস্কার অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রশ্ন ওঠা শুরু করে। যদিও ভারতবর্ষে পশ্চিম ইউরোপের মতো ধনতন্ত্রের স্বাভাবিক বিকাশ হয়নি। ইংল্যান্ডে ধনতন্ত্রের আগমনে জিওনার্দো ব্রুণো, কোপারনিকাস, গ্যালিলিও, স্ট্যুয়ার্ট মিল, চার্লস ডারউইনের বিবর্তনবাদ এবং ভিক্টোরিয়ান সাহিত্যিকদের মানবিকতাবাদী লেখনী ইউরোপিয়ান সমাজকে নাড়িয়ে দিলেও ভারতীয়দের তেমন নাড়া দিতে পারেনি। বাংলার রেঁনেসাসে রামমোহন, ডিরোজিওর ইয়ং বেঙ্গল, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে যুক্তিবাদী আন্দোলন প্রসার লাভ করলেও তা আবার নবকৃষ্ণ দেব, রাধাকান্ত দেবেদের মতো সামন্ত প্রভুদের দখলে চলে যায় এবং ভাববাদের প্রসার লাভ ঘটে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দদের মাধ্যমেই। সমাজ আবার কুসংস্কার অন্ধবিশ্বাসের আধার হতে শুরু করে। আর আমাদের বর্তমান শাসকদের বৈদিক আমলের ঐতিহ্যের গুণগান ও ক্রিয়াকলাপ দেখে বোঝা যায় সমাজে এরা আবার কুসংস্কার অন্ধবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে চায়।

এই গতিশীল সমাজে পিতা মাতার বিয়োগের পরে এতদিন ধরে অশৌচ পালন করলে শ্রমের যোগানে টান পড়বে এবং

উৎপাদন হ্রাস পাবে এবং লোকেদের আর এই আচারে আবদ্ধ রাখলে ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ শুরু হবে। তাই শ্রাদ্ধানুষ্ঠান এর আগে অশৌচের দিনের সংখ্যা কমিয়ে আনা হল। এখানেও পার্থক্য রয়ে গেল, ব্রাহ্মণদের ১০ দিন আর শূদ্রদের ১২ দিন। সব আচারের ব্যাপারেই ব্রাহ্মণরা সুবিধাভোগী। এটা নিয়ে কোনও শূদ্র প্রশ্ন করে না। আর বর্তমানে ডেথ-সার্টিফিকেট এর ব্যবস্থা আছে ঐ সাদা থান পরিধানের দরকার কি? ১২ দিন ধরে আচার পালন করে শরীরকে কষ্ট দেওয়ার অর্থ কী? এর ফলে নানান রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও বেড়ে যায়। এই অপ্রয়োজনীয় প্রথাকে গাধার মতো শূদ্র ও অন্যান্য বর্ণের লোকেরা বয়ে নিয়ে চলেছে। শূদ্ররা ডিগ্রি অর্জন করলেও প্রকৃত শিক্ষা অর্জন করতে পারেনি। ফলে তাদের দাবিয়ে রাখার জন্য যে আচারের ব্যবস্থা ব্রাহ্মণদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে তারা ভয় পায়। ফলে এই শোষণ ব্যবস্থা এই দ্বাবিংশ শতকে মহাকাশে পাড়ি দেওয়ার যুগেও টিকে আছে। প্রখ্যাত সাহিত্যিক শিব্রাম চক্রবর্তী মস্কো থেকে পণ্ডিচেরী বইতে এই প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করেছেন। পুরোহিত ব্রাহ্মণদের উনি নরখাদকের সাথে তুলনা করেছেন। সমাজকে শোষণ করার জাতপাতের ভেদাভেদের ব্রাহ্মনীয় পদ্ধতি এক কথায় ইউনিক। অ্যাডাম স্মিথ বা স্ট্যুয়ার্ট মিল ও এগুলি ভাবতে পারেননি। চার্লস ডারউইন পড়া ডিগ্রি পাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিতেরাও গাধার মতো এই ভার বয়ে চলেছে, এদের শিক্ষার সাথে জীবনের কোনও যোগ নেই।

মূল বাল্মীকির রামায়ণে দশরথের পুরোহিত জাবালিও রামচন্দ্রকে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করতে নিষেধ করেছিলেন। উনি বলেছিলেন কে দেখছে মৃত ব্যক্তি ফিরে আসে? রামচন্দ্র শাসকের প্রতিনিধি তিনি জাবালিকে তস্কর বৌদ্ধ বলে তিরস্কার করেছিলেন। অর্থাৎ রামায়ণ রচনা সমাপ্ত হয়েছিল বুদ্ধের আবির্ভাবের পরেই। বুদ্ধদেব তখন ব্রাহ্মণদের আচারের

প্রতিবাদ শুরু করেছিলেন এবং বৌদ্ধ ধর্মে আত্মার কোনও সংস্থান রাখেননি। ফলে এই আচারগুলি রহিত হয়েছিল এটা বোঝা যায়। দুহাজার বছর আগের মানুষ এর প্রতিবাদ করলেও আধুনিক মহাকাশ যুগের মানুষ এর প্রতিবাদ করতে ভয় পায়।

বাবা-মা জীবিত থাকাকালীন নিজের আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী সেবা করুন; তবেই প্রকৃত শ্রদ্ধা দেখান হবে। আর বাবা-মাকে দেখলাম না, বাবা-মায়ের মৃত্যুর পরে নিষ্ঠাভরে আচার পালন করে বিশাল শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করলেও বাবা মাকে শ্রদ্ধা দেখানো যায় না।

আত্মার ধারণাও বিদেশ থেকেই (ব্যাবিলন) ভারতে এসেছে বলে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন। কে আত্মাকে দেখেছে? আসলে পরলোক ও আত্মার ব্যবসা না থাকলে ধর্মের গোড়া ধরে টান পড়বে। ইহলোকে অত্যন্ত কষ্টে থাকুন ওপরের তিন শ্রেণীকে সেবা করে যান বিনা প্রশ্নে তবেই পরলোকে আপনি দেবদেবীদের সাথে স্বর্গের পারিজাত বনে দ্রাক্ষা খেতে খেতে ইন্দ্রের ঐরাবতে করে ঘুরতে পারবেন। তাই এই আচার চলবে শাসকের সহযোগিতাতেই। শাসক মন্দির মসজিদ গির্জাতে ভোটের জন্য ঘুরে বেড়াবেন আর অবিরাম ধর্মের কুসংস্কার অন্ধবিশ্বাস ছড়িয়ে যাবেন।

ট্রান্সজেন্ডার ও সমকামী মুক্তি আন্দোলন এবং মার্ক্সবাদ

লিখেছেন-ঐশা চক্রবর্তী



ভূমিকা:

মার্ক্সবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বহু কমরেড-ই বলে থাকেন ট্রান্স আইডিওলজি এবং সমকামিতা ভাববাদী ধারণা। অর্থাৎ, বস্তুবাদী এবং মার্ক্সীয় দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ দ্বারা ইহা ব্যাখ্যা অসম্ভব। তারা রেনে দেকার্টের উক্তি "I think, therefore I am" উল্লেখ করেন। বস্তুবাদীরা রেনের ভাববাদী উক্তির বিপক্ষে বলেন, "I am, therefore I think" এই উক্তির মাধ্যমে বস্তুবাদীরা বোঝাতে চান বস্তু, ভাবনার পূর্বে এবং স্বতন্ত্র ভাবে অস্তিত্ব রাখে। এখন যাদের উপরোক্ত বিষয়

নিয়ে বিশদে জানা নেই, তার মনে হবে সমকামিতা এবং ট্রান্স আইডিওলজি হলো "ভাববাদী", সুতরাং মার্ক্সবাদ যেহেতু "বস্তুবাদী" তাই ট্রান্স-ফোবিয়া'কে যুক্তিসম্মত করার অন্যতম পথ হলো মার্ক্সবাদ! পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখবো এই ধারণা ঠিক কতখানি ভুল এবং বামপন্থী মুক্তি আন্দোলনের পরিপন্থী। প্রথমত, আলোচ্য বিষয়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ শব্দের অর্থ নিয়ে ভুল ধারণা দূর করে নেওয়া প্রয়োজন। আলোচনায় ব্যবহৃত "বস্তুবাদ" শব্দের অর্থ পার্থিব সম্পদ ও বস্তুর প্রতি আকর্ষণ বোঝাচ্ছে না। "ভাববাদ" বলতে আলোচ্য অংশে ভালোবাসা বা বিশ্বাস জাতীয় আদর্শবাদী চিন্তাধারার কথা বোঝানো হচ্ছে না। সমস্ত শব্দের দর্শনগত অর্থ নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। মার্ক্সবাদ-এর মূল বিষয় হলো দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ। আসুন জেনে নিই সেটা কী?

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ:

বস্তু এবং ভাবের দ্বন্দ্বই হলো দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ। এবং অপর বিষয় হলো "দ্বান্দিকতা" (ডায়ালেক্টিক্স)। যেকোনও বিতর্কে একটি তত্ত্ব (থিসিস) উত্থাপিত হয় এবং তার বিরোধে বিরোধাভাস (এন্টিথিসিস)-এর উৎপত্তি হয়। এই দুই তত্ত্বের দ্বন্দে সংশ্লেষ বা সিন্থেসিস লাভ করা যায়। প্লেটো থেকে হেগেল সকল দার্শনিক এই দ্বান্দিকতার কথা বলে গেছেন। কিন্তু এই দ্বান্দিকতা ভাববাদী!

কিন্তু অত্যাচারী ছাড়া অত্যাচারিতের উপস্থিতি সম্ভব নয়। ঠিক একইভাবে প্রলেটেরিয়াৎ বা শ্রমজীবি ছাড়া বুর্জোয়া বা মালিকের উপস্থিতি অসম্ভব। তাই, থিসিস এবং এন্টিথিসিসি-কে ভিন্ন এবং পৃথকভাবে উৎপত্তি হওয়া সত্ত্বা ভাবা ভুল! উভয়েই একইসঙ্গে উত্থাপিত হয় এবং পরস্পরের সাথে ঐক্য (ইউনিটি) এবং দ্বন্দে বিদ্যমান।

দেখুন কিভাবে মার্ক্স ডায়ালেকটিক্সকে শুধুমাত্র বিতর্কের বেড়াজালে আবদ্ধ না রেখে তাকে বের করে এনে সমাজের শ্রেণীগুলির পারস্পরিক দ্বন্দে প্রতিফলিত করল। এই দ্বন্দ্বই ইতিহাসের অগ্রগতির দিকনির্দেশ করে।

ইহাই ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। এই ভাববাদ ও বস্তুবাদের দ্বন্দই "দ্বন্দমূলক বস্তুবাদ"।

ট্রান্স আইডিওলজি না মার্ক্সবাদ?

ট্রান্সজেন্ডার বলতে, কোনও ব্যক্তির মানসিক লিঙ্গ চেতনা তার জন্মোক্ত লিঙ্গের ভিন্ন বোঝানো হয়। সহজ ভাষায়, ভিন্ন লিঙ্গের শরীরে কারোর জন্ম হলে তাকে ট্রান্স বলা হয়। এখন, ভূমিকায় উক্ত ধারণা থেকে বহু মানুষই মনে করেন ট্রান্স একটি ভাববাদী ধারণা এবং মার্ক্সবাদ বস্তুবাদী। এই কারণে মার্ক্সবাদ দিয়ে ট্রান্স আইডিওলজি ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। কিন্তু, কার্ল মার্ক্স এর মতবাদ অনুযায়ী তত্ত্বগত ভাবে মার্ক্সবাদ সমাজকে তার সম্পূর্ণতায় ব্যাখ্যা করতে পারে। কোনও এক ক্ষেত্রে কার্যকরী না হলেই মার্ক্সবাদ তার যৌক্তিকতা হারায়। কিন্তু এই চিন্তাধারার মুল ভ্রান্তি হল মার্ক্সবাদ দ্বন্দমূলক বস্তুবাদী, বস্তুবাদী নয়। দ্বান্দিকতা ব্যাতিত মার্ক্সবাদের কোনও অস্তিত্ব নেই। ফ্রেডরিক এঙ্গেলস বারবার মার্ক্সীয় দ্বন্দমূলক বস্তুবাদের সাথে যান্ত্রিক বস্তুবাদের পার্থক্য দেখিয়েছেন তার লেখনীর মাধ্যমে। আবার, ট্রান্স ও সমকামী মুক্তি আন্দোলন এবং পিতৃতন্ত্রের দ্বৈত নিপীড়ন এর ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে এক ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

ট্রান্স ও সমকামী নিপীড়নের উৎস: পিতৃতন্ত্র!

মার্ক্সীয় চিন্তাবিদদের গবেষণায় সমকামিতা এবং ট্রান্সজেন্ডার নিয়ে আলোচনা তুলনামূলক কম হয়েছে। সেই কারণে এই বিষয়গুলি নিয়ে মধ্য ও দক্ষিনপন্থীদের পুঁজিবাদ তোষণকারী ভাবধারা স্থান পেয়েছে। যা এই বিষয়গুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণ আলোকপাত করতে পারে না। মার্ক্সবাদীরাও এই বিষয়গুলি আলোচনায় গুরুত্ব দেননা কারণ মার্ক্সীয় তত্ত্বের জনকরা এই বিষয়ে বিশদে আলোচনা করেননি। কিন্তু, মার্ক্সবাদী হিসেবে নিপীড়িতদের সমস্যা তুলে ধরা কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। তাই সমকামিতা ও ট্রান্স অধিকার আন্দোলন এবং মার্ক্সবাদ-এর আলোচনা আবশ্যিক। এই কারণে সুইস

রেড স্টার পত্রিকার কমরেডরা এই বিষয়ে গবেষণা করছেন। তাঁদের প্রকাশিত গবেষণা পত্রই এই প্রবন্ধের মূল উৎস।

এই নিপীড়নের মূল কারণ হলো পিতৃতন্ত্র! তাই মার্ক্সীয় তাত্ত্বিকদের (যেমন- এঙ্গেলস) "পিতৃতন্ত্রের নারী নিপীড়ন" এর আলোচনা থেকে এই বিষয়ে বিশদে আলোচনায় সাহায্য মেলে।

এই বিষয়ে আলোচনার সময় LGBTQIA+ কমিউনিটি-কে ট্রান্স ও সমকামী বলে উল্লেখ করা হবে আলোচনার সুবিধার্থে। এঙ্গেলস তাঁর বই "The origin of family, private property and the State"-এ দেখিয়েছেন যে মানব সমাজের বিবর্তনের ইতিহাসকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় - ১. বর্বরতা, ২. অসভ্যতা, ৩. আধুনিক সমাজ। এই তিনভাগের মধ্যে গুহামানব ও প্রস্তর মানব, যারা দল বেঁধে শিকার করে বাঁচতো তাদের প্রথম ভাগে বোঝানো হয়েছে। সমাজ গঠনের দ্বিতীয় ভাগকে "অসভ্যতা" বিভাগে বোঝানো হয়েছে এবং রাজতন্ত্র থেকে সামন্ততন্ত্র এবং আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজকে তৃতীয় বিভাগে বোঝানো হয়েছে। সমাজের এই তিন কাল বিভাগের মাধ্যমে আমরা প্রিমিটিভ কমিউনিস্ট সমাজ ও তার নিঃশেষ হয়ে কিভাবে পিতৃতন্ত্র বা পুরুষতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হলো জানবো। আর জানবো পিতৃতন্ত্রের দ্বৈত নিপীড়ন নারী এবং ট্রান্স ও সমকামী মানুষের ওপরে।

পিতৃতন্ত্রের উৎপত্তি:

মার্ক্সবাদ অনুযায়ী সমাজের তিনটি কালভাগের থেকে পিতৃতন্ত্রের সূচনা সম্পর্কে জানা যায়।

প্রথম কালভাগ, অর্থাৎ "বর্বরতা" হলো সমাজ গঠনের সর্বপ্রাচীন ধাপ। এই সময় বিবাহ প্রথার পরিবর্তে গ্রুপ বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। অর্থাৎ বিবাহ দুটি ভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে হতো, কোনও ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমাজ ছিল না। এই সমাজকে "প্রিমিটিভ কমিউনিজম" বলা হয়। এই সমাজে শ্রমের ক্ষেত্রে কোনও লিঙ্গ বিভাজন ছিল না। জেন্ডার রোলস

ছিল অনুপস্থিত। শিশুদের লালন-পালন থেকে শিকার তথা খাদ্য সংগ্রহ সমস্তটাই হতো সমাজবদ্ধ ভাবে। এমনকি যৌন সম্পর্ক শুধু মহিলা-পুরুষ এই দ্বৈত ব্যবস্থায় সীমাবদ্ধ ছিল না। যে কোনও লিঙ্গের মানুষ যেকোনও লিঙ্গের মানুষের সাথে শারীরিক সম্পর্কে থাকতে পারত। বর্তমান লিঙ্গচর্চায় যে যৌন সম্পর্ককে "বাই-সেক্সুয়াল" বলা হয়, তার প্রচলন বহুল ভাবে উপস্থিত ছিল। বিভিন্ন প্রাচীন সভ্যতার কবরে কোনও মানুষের মৃতদেহ রাখা হলে, তার সাথে তার প্রিয়জনকে কবর দেওয়া হতো। এমনি অনেক কবরে নারী পুরুষ উভয় লিঙ্গের সঙ্গীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে।

এবার আসি এর পরবর্তী তথা দ্বিতীয় কাল ভাগ "অসভ্যতা" (savagery) তে। এই সময় থেকে মানুষের খাদ্য সুরক্ষা বাড়ে পশুপালক থেকে কৃষিকাজ করা সমাজে রূপান্তরিত হবার কারণে। স্বাভাবিকভাবেই দলবদ্ধভাবে বাস করার আর কোনও প্রয়োজন ছিল না। মানুষ তখন ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমাজের দিকে এগোতে থাকলো। মানব বিবর্তনের এই ধাপটি নজরে রাখা প্রয়োজন, কারণ এই সময় থেকেইপিতৃতন্ত্রেরসূত্রপাতঘটে।এঙ্গেলসতাঁরবইয়েলিখলেন, "In this stage, one man lives with one woman, but the relationship is such that the polygamy and occasional infedelity remain the right to the men, even though for the economic reasons polygamy is rare. While for the women, strictest fidelity is demanded throughout the times she lives with the man. And adultery on her part is cruelly punished. The marriage however can be dissolved by both partners, although rights of children belong to the women like before (in barbarism)."

শেষ অংশ থেকে বোঝা যায় পূর্বতন ব্যবস্থায় একাধিক লোকের সম্পর্ক থাকায় বাচ্চাদের বায়োলজিক্যাল পিতৃত্ব প্রমান অসম্ভব ছিল, তাই সকল নবজাতক এবং

সর্বোপরি সমাজ ছিল মাতৃকেন্দ্রিক, কারণ মা ই সন্তানের জন্ম দিতেন। তাই প্রিমিটিভ কমিউনিস্ট সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক। কিন্তু দ্বিতীয় কলভাগে শ্রমব্যবস্থার উৎপত্তি হওয়ায় সমাজ ব্যবস্থা মাতৃতান্ত্রিক থেকে পিতৃতন্ত্রের দিকে এগুলো। কারণ দলবদ্ধতা ভেঙে ব্যক্তিসত্ত্বার প্রচলন বাড়ে, তাই পুরুষ কেন্দ্রিকতাও বাড়ে সাথে সাথে। শ্রম ব্যবস্থায় পুরুষ শ্রমের সমস্ত জায়গা অধিকার করে, ফলে শ্রম থেকে উৎপন্ন সম্পত্তি ও "surplus value" পুরুষের মালিকানাধীন হয়। শ্রম ব্যবস্থায় নারীর স্থান না থাকলেও সন্তানের অধিকার এখনও নারীর ই রইলো। তবে কোনও সম্পত্তি না থাকায় পরবর্তী প্রজন্ম কে দেওয়ার জন্য "ইনহেরিটেড উইল" থাকলো না। এই ইনহেরিটেন্স যদি সন্তানের কাছে প্রতি প্রজন্মে সঞ্চিত করা যায়, তবেই "প্রাইভেট প্রপার্টি" পাওয়া সম্ভব। তাই, তৃতীয় কলভাগ তথা "আধুনিক সভ্যতা" (সামন্ততান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা)-য় মাতৃতন্ত্রের জায়গায় স্থান পেলো পিতৃতন্ত্র। নারী হারালো সমাজের সমস্ত অধিকার, জন্ম হলো দ্বৈত নিপীড়নের মূল কান্ডারী পিতৃতন্ত্রের!

এঙ্গেলস বললেন, "The overthrow of mother right was the historical defeat of the female sex. man took the command in the home also; the woman was degraded to servitude. She became the slave of his lust and reduced to a mere instrument of producing children!"

জন্ম হলো শ্রেণী বিভাজনের এবং শ্রেণী সমাজব্যবস্থার! সম্পত্তি রক্ষার লালসা বজায় থাকলো বর্তমান পুঁজিবাদী সভ্যতা পর্যন্ত। বজায় থাকলো পিতৃতন্ত্র!

Historical Queer Opression:

অনেকেই বলবে ঐতিহাসিক ভাবে মহিলাদের নিপীড়ন থাকলেও সরাসরি ভাবে কোথাও মার্ক্সিস্ট দার্শনিকরা সমকামী নিপীড়নের কথা উল্লেখ করেননি। এটাই আক্ষরিক অর্থ গ্রহণের সমস্যা। পরবর্তী প্রজন্মের মার্ক্সবাদীদের-ই এই

সমস্যা গুলির উপর মার্ক্সবাদ কার্যকরী করে সমাধান অনুসন্ধান করতে হবে। মার্ক্সবাদ হল একটি বিবর্তনশীল বিজ্ঞান, বিবর্তন না হলে বা পরবর্তী প্রজন্ম নতুন সংযোজন না করলে "dogmatic revisionism" ছাড়া কিছুই থাকবে না।

আসুন এবার তিনটি কালভাগ-কে সমকামী নিপীড়নের প্রেক্ষাপটে দেখে নিই। সুইজারল্যান্ড এর মার্ক্সবাদী গবেষকদের পত্রিকা সুইস রেড স্টার অনুযায়ী, "There is no evidence of queer antagonism in savage society, but plenty of evidence that suggests bisexuality as main form of human attraction. All primates observed in nature found to have bisexual tendencies, with bonobo apes being fully bisexual. Neanderthals were commonly buried with partners of both sexes, the leading hypothesis being that they were all bisexual."

শ্রেণীবিভাজিত সমাজের অস্তিত্বের পূর্বে সমকামী বিরোধিতার কোনও প্রমান নেই, কারণ তখন প্রাইভেট প্রপার্টির কোনও অস্তিত্বই ছিল না। আফ্রিকান, ভারতীয় কিংবা মিশরীয় সভ্যতার সংস্কৃতি তথা মাইথলজিতে সেই কারণে সমকামিতা বিরোধিতা সক্রিয় ভাবে লক্ষ্য করা যায়। সুইস্ রেড স্টার পত্রিকা অনুযায়ী, "In primitive society, there was a widespread system of third gender institutions. These were system of acceptance and respect for the people who today would be understood as queer: homosexual, bisexual, transgender people, also intersex people and non-binary people etc."

কিন্তু সমকামী বা ট্রান্সজেন্ডার বা ইন্টারসেক্স মানুষেরা তাদের সম্পর্কের মাধ্যমে জৈবিকভাবে বংশবৃদ্ধি করতে পারেন না। তাই বংশগত ভাবে যখন প্রাইভেট প্রপার্টি ইনহেরিটেন্স এর মাধ্যমে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সঞ্চিত হতে লাগল অর্থাৎ সভ্যতার উত্থান হল। যেদিন থেকে মাতৃতন্ত্রকে ভেঙে মানুষের লোভ জন্ম দিলো পিতৃতন্ত্রের, সেদিন থেকে সমকামীদের

প্রতি সম্মান এবং প্রচলন উঠে গেল। বাইনারি মনোগ্যামাস সম্পর্কে মানুষকে বাধ্য করা হলো। ভালোবাসার স্বাধীনতার পরাজয় ঘটলো, জন্ম নিলো "Queer Antagonism!"

যদিও গ্রিক সভ্যতায় বহু ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা গেছে। সমকামিতাকে এক্সেপ্ট করা হয়ে থাকত, যদি এই প্রাইভেট প্রপার্টির বংশ পরম্পরায় সঞ্চয়ন-এ সমকামী মানুষেরা সম্মতি জানাতেন। যেমন, গ্রিক হিরো আকিলিস! তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমকামী সম্পর্ককে সামন্ততন্ত্রের সময় থেকেই খুবই কঠোর ভাবে দমিয়ে দেওয়া হতো। খুবই কঠোর ভাবে সমকামী ও নারীদের স্বাধীনতা দমন করা হতো, এমনকি কমন সেঞ্চুরি পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে। পিতৃতন্ত্রের সাথে সমকামী ও মহিলাদের স্থান বোঝা যায় এর থেকেই, যে ইউরোপিয়ো উইচ বার্নিং-এ জ্বালানি হিসেবে সমকামী মানুষ বিশেষত সমকামী পুরুষকে ব্যবহার করা হতো।

পুঁজিবাদী সমাজেও এই ভাবধারা লক্ষ্য করা যায়। আমেরিকার মতো দেশ যেখানে "প্রোডাক্ট ডিমান্ড" এর অধিকাংশটাই সমকামীদের থেকে আসে, সেখানেও queer antagonism বিদ্যমান। এক্ষেত্রে পুঁজিবাদী সমাজের ধারণা হলো নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি, যেখানে সম্পর্কের একজন শ্রম দেবে এবং প্রাইভেট প্রপার্টি বৃদ্ধির কাজ করবে এবং একজন সন্তানের লালন পালন করতে হবে। অর্থাৎ দত্তক বা অন্য কোনও উপায়ে সন্তান গ্রহণ না করলে, অর্থাৎ সম্পত্তি পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারের ব্যবস্থা না করলে queer antagonism অনুভব করতে হবে।

তবে আরেক দিক থেকেও সমকামিতার বিরোধিতা লক্ষ্য করা যায়। স্বল্প হলেও কিছুক্ষেত্রে বামপন্থী আন্দোলনের মধ্যেও সমকামিতার বিরোধ বিদ্যমান। সুইস্ রেড স্টার পত্রিকা থেকে, "But there is another form of queer antagonistic ideology, which is present in the proleterian movement. Both in the labour movement and in the ICM. This is the problem of sexual metaphysics, or queer antagonistic revisionism."

sex, sexuality and gender

সেক্স বা বায়োলজিক্যাল সেক্স এবং লিঙ্গ বা জেন্ডার, দুটি সম্পূর্ন ভিন্ন জিনিস। সেক্স হলো একটি বায়োলজিক্যাল construct এবং জেন্ডার হলো একটি সোশ্যাল construct অর্থাৎ সামাজিক ভাবনা। তাই সেক্স নির্ধারণ জন্মগত এবং লিঙ্গ নির্ধারণ পরিবর্তনশীল ভাবা হতো, তবে তা সঠিক নয়। সোশ্যাল construct হলো এমন একটি ধারণা যা শুধুমাত্র মানুষ ও তার পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে হওয়া ইন্টাররিলেশন এর মাধ্যমে সংগঠিত হয়। এই বিষয়গুলি অস্তিত্ব রাখে কারণ আমাদের প্রয়োজন হয় এবং আমরা মনে করি এগুলির অস্তিত্ব যাক গে, তাই এগুলি অস্তিত্ব রাখে। যেমন দেশ ও টাকার ধারণা। টাকা বা অর্থ বলতে কোনও বস্তু বা প্রোডাক্ট এর মূল্য বোঝানো হয়নি। কোনও বস্তুর মূল্য তার উৎপাদনে খরচ হওয়া শ্রমের উপর নির্ভরশীল। তাই লিঙ্গ যেহেতু একটি সোশ্যাল construct, তাই তা সর্বদাই নন বাইনারি। কারণ মানুষ কখনওই বাইনারি চিন্তাভাবনা বা অনুভূতি লাব করে না। মানব মস্তিস্ক জটিল। এবার আসি সেক্স এর ব্যাপারে। সেক্স একটি জৈবিক নির্ধারক বলে এর অস্তিত্ব আমাদের অনুভূতি বা প্রকৃতির সাথে আমাদের ইন্টাররিলেশন-এর সঙ্গে যুক্ত নয়। কিন্তু এটি অনেকগুলি দৈহিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে যুক্ত। যেমন শরীরে পুং এবং স্ত্রী হরমোনের অনুপাত, সেক্স হরমোনের উপস্থিতিতে দৈহিক পরিবর্তন, গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্য (যেমন - স্তন অথবা দাড়ি), মুখ্য যৌনঙ্গ (যেমন - শিশ্ন অথবা vagina) এবং সেক্স chromosome যথা X ও Y chromosome এর বিন্যাস (এটাও binary নয়। XX, XY, XXY, XYY, X ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের বৈশিষ্ট্য বিন্যাসে দেখা যায়। উপরোক্ত প্রায় সকল সেক্স নির্ধারকগুলি জন্মের পরবর্তীতে পরিবর্তন করা সম্ভব। কেবল chromosome বিন্যাস পরিবর্তন সম্ভব নয়। কিন্তু তা বায়োলজিক্যাল সেক্স-এর কুড়ি শতাংশও নির্ধারণ করে না। আবার সেই বিন্যাস ও বাইনারি নয়। কাজেই পুরুষ-স্ত্রী এই বাইনারি বাস্তবে অস্তিত্ব

রাখে না। GENDER AND SEX, BOTH ARE NON BINARY!

এবার আসি যৌনতা বা sexuality র কথায়। sexuality বিভিন্ন রকমের হয় এবং এটি একটি স্পেকট্রাম। কারোর sexuality কোনও নির্দিষ্ট বিষয় নয়। মূলত একে চার ভাগে বিভক্ত করা যায় -

Heterosexuality: দুই বিপরীত লিঙ্গের মানুষের মধ্যে সম্পর্ক।

Homosexuality: দুই সম লিঙ্গের প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের মধ্যে সম্পর্ক।

Bisexuality: যখন কোনও প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ সম এবং ভিন্ন উভয় প্রকারের লিঙ্গের প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের প্রতি আকর্ষিত হয়ে এবং সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে।

Asexuality: যখন কোনও প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ অপর কারোর প্রতিই যৌন আকর্ষণ অনুভব করে না। এটি অল্প থেকে একদম অনুপস্থিত ও হতে পারে। পরবর্তী সকল আলোচনায় সমকামী এবং ট্রান্সজেন্ডার মুক্তি আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে এই তিনটি বিষয় এবং এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ পিতৃতান্ত্রিক দক্ষিনপন্থীরা বহু pseudo science এ বিশ্বাস করে, যা সমকামী ও ট্রান্স মানুষের ঐতিহাসিক oppression এর অন্যতম কারণ। তাই হিস্টোরিকাল মেটেরিয়ালিস্টিক আলোচনার সাথে বৈজ্ঞানিক আলোচনাও গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বন্দমূলক বস্তুবাদ ও সমকামী মুক্তি আন্দোলন

দ্বন্দমূলক বস্তুবাদ অনুযায়ী ভাব ও বস্তু পরস্পরের সঙ্গে দ্বন্দ ও ঐক্যে বর্তমান থাকে। ঠিক সেরকমই ট্রান্স মানুষদের ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের পরিচয় ও শারীরিক কাঠামো পরস্পরের সাথে দ্বন্দে ও ঐক্যে থাকে। এই দ্বন্দে সামাজিক পরিস্থিতির মাধ্যমে ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের মাধ্যমে শারীরিক পরিবর্তন ঘটে। ছোটো ছোটো পরিমানগত পরিবর্তন, গুণগত পরিবর্তনে পরিণত করে। মস্তিষ্কের শারীরিক পারিচয়ের অনুযায়ী শারীরিক কাঠামোর পরিবর্তন ঘটে। এবং পুরাতন

লিঙ্গ পরিচয়ের নেগেশন অফ নেগেশন ঘটে। যান্ত্রিক বস্তুবাদী দিক দিয়েও দেখতে গেলে ইন্টারসেক্স লোকেদের উপস্থিতি লিঙ্গ পরিচয়ের জাড্যতা ধূলিসাৎ করে। তাই বামপন্থী তথা মার্ক্সবাদীদের সমকামী বিরোধিতার কোনও কারণ-ই থাকে না।

মার্ক্সবাদী হিসেবে কর্তব্য:

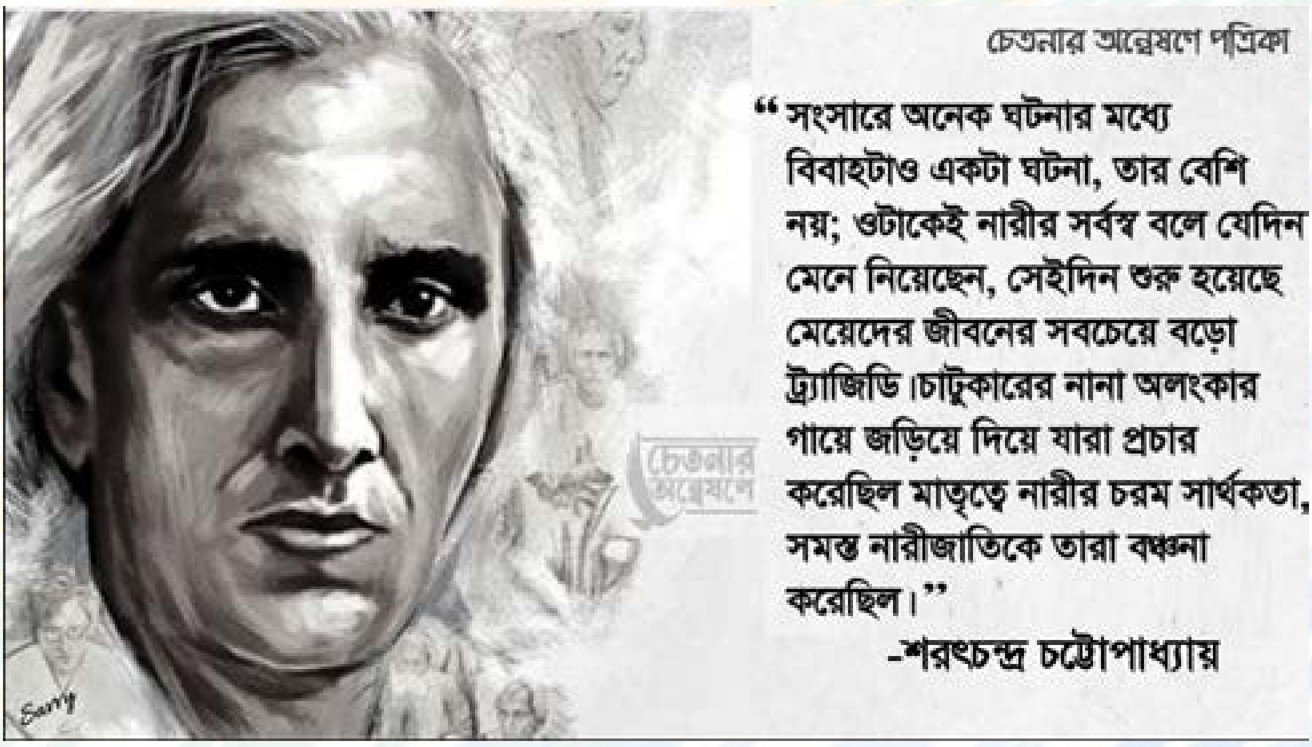
সমকামী মুক্তি ও ট্রান্স অধিকার আন্দোলন হলো ইনহেরিটেড উইল এর বিরুদ্ধে। তাই সমকামী মুক্তি আন্দোলন পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন। পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন হলো পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন। পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন হলো moneyless, classless এবং stateless সমাজের উদ্দেশ্যে আন্দোলন। অর্থাৎ,

Fight for Communism!

source:

* "The origin of family, private property and the state" - Friedrich Engels

*Swiss "Red Star"



তাদের নিজেদের ধর্মই 'শ্রেষ্ঠ'

লিখেছেন – অমিত মন্ডল



'সবই ব্যাদে আছে'। 'বিজ্ঞানময় কোরআন'। 'scientific facts in Holy Bible'...

এই কথাগুলো শুনতে-শুনতে কান পচে গেলো। প্রায় সকল ধর্মের ধ্বজাধারীরাই আজকাল এই কথা বলে থাকেন। উদ্দেশ্য একটাই, আর তা হলো এটা প্রমান করা যে, তাদের নিজেদের ধর্মই "শ্রেষ্ঠ"। একমাত্র তাদেরই ধর্ম ঈশ্বরের বাণী, আর সব ধর্মই ভুয়ো, মানুষের বানানো। নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারই করাই একমাত্র উদ্দেশ্য যদি হতো, তাও ক্ষমা ঘেন্না করে মেনে নিতাম। একটু তলিয়ে দেখলেই আসল উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার হয়।

সাধারনত, মানুষ অবাক হতে খুব ভালোবাসে। সেই আদিম

যুগ থেকে মানুষ অবাক হয়ে আসছে। মানুষ অবাক হয়েছে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা দেখে। মানুষ অবাক হয়েছে ঝড়, বৃষ্টি আর বজ্রপাত দেখে। মানুষ অবাক হয়েছে সজীব আর নির্জীব পদার্থের পার্থক্য দেখে। অবাক হতে হতে হেদিয়ে পড়ে, যখন সকল ঘটনার কারণ খুঁজতে গেছে, তখন পদে-পদে ব্যর্থ হয়ে এক অসীম শক্তিশালী ঈশ্বরের কল্পনা করেছে। এতে একটা সুবিধা আছে। যেমনি কোনও ঘটনার ব্যাখ্যা পাওয়া গেলো না, ওমনি ঈশ্বরের ঘাড়ে চাপিয়ে দাও। সূর্য কেনো ওঠে? ঈশ্বরের ইচ্ছে। 'চাঁদটা কেনো বাড়ে কমে, জোয়ার কেনো আসে'? ঈশ্বরের ইচ্ছে। রোগ অসুখ কেনো হয় থেকে শুরু করে জন্ম, মৃত্যু সব কিছুই ঈশ্বরের ইচ্ছে ধরে নিয়েই চলতে থাকলো। যদি জানতে চান, এই Adam আর Eve এরা আকাশ থেকে পড়ল, আর যীশু জন্ম নিলেন মাতৃগর্ভে কেনো? তার উত্তর ঈশ্বরের ইচ্ছে। আবার যদি জানতে চান, এক নিষ্পাপ শিশু বিকলাঙ্গ জন্ম হলো কেনো, তার উত্তর হবে আল্লাহই ভালো জানেন।

কিন্তু ধীরে ধীরে এই অবাক হওয়া মানুষগুলোর মাঝে, কিছু মানুষ যখন এই প্রাকৃতিক ঘটনাগুলোর, প্রাকৃতিক আর যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা দিতে আরম্ভ করলো, তখন এই ঈশ্বরের বিশ্বাসে ভাঁটা পড়ল। ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা, তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তাও ধীরে ধীরে কমতে শুরু করলো। কিছু মানুষ ঈশ্বরের অস্তিত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করলো। মানুষ বুঝতে শিখল ঈশ্বরের উপর ভরসা না করে ঘটনাবলীর প্রাকৃতিক কার্যকারণ ব্যাখ্যা করার সুবিধা অনেক বেশি। ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস করে, তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে তাকে বিভিন্নভাবে খুশি করার চেষ্টা করে, সব সময় যে সুফল পাওয়া যায় না, তা মানুষ আগেই বুঝেছে। ঈশ্বর যে খুশি হলো কিনা তা বোঝার কোনও নির্ভরযোগ্য উপায়ও নেই। তার থেকে বরঞ্চ যুক্তি দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর একটা প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা জানতে পারলে সুবিধা অনেক বেশি। এবারে বর্ষা হবে কিনা, সেটা ঈশ্বরের ইচ্ছের উপর না ছেড়ে নিজে নিজে অন্বেষণ করা বুদ্ধিমানের কাজ। আর এভাবেই ধীরে

ধীরে মানুষ এগিয়ে চলল প্রাকৃতিক বিশেষ জ্ঞানকে হাতিয়ার করে। একসময় যা ছিল কল্পনার অতীত, অথবা একসময় মানুষ যে দিব্যাস্ত্র বা অলৌকিক যানের কল্পনা করেছে তাই আজ বাস্তব। যে অসুখের নিরাময়ের জন্য একসময় মন্ত্র পড়ে, কলমা পড়ে, মন্দিরে-মসজিদে হত্তা দিয়ে পড়ে থাকলেও কোনও লাভ হয়নি, সামান্য অ্যান্টিবায়োটিকের পাঁচদিনের course করে ভালো হয়ে গেছে।

মোদ্দা কথাটা হল ঈশ্বরের ব্যবসা লাটে উঠেছে।

কিন্তু একটা প্রশ্ন সকল মানুষই তো বিজ্ঞানের উন্নতির প্রত্যক্ষদর্শী। সকলেই তো হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে যে বিজ্ঞানের উপর ভর করেই আজকে আমাদের জীবন যাত্রার মান উন্নত হয়েছে। প্রত্যেকেই একথা অকপটে স্বীকার করবে যে, নগর জীবন ছেড়ে মানুষকে যদি বনে জঙ্গলে বাস করতে হতো তাহলে প্রাণটা বাঘের খাবায় বেঘোরে হারানোর সমূহ সম্ভাবনা ছিল। তাহলে কিছু মানুষ এখনও ধর্মের ধ্বজাধারী কেন? কেন অনেক মানুষ এখনও ওই প্রয়োজনহীন ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস আঁকড়ে ধরতে চায়? এখনও কেন মানুষ প্রমাণ করতে চায় ধর্ম সত্য, ঈশ্বর সত্য আর ঈশ্বর ভয়ানক হলেও তাকে যারপরনাই ভালোবাসে? কেন মানুষ এটা প্রমাণ করতে চায় যে, যে ঈশ্বর তাকে গরম তেলে মুচমুচে আলু ভাজার মতো ডিপ ফ্রাই করবে সেই ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু। যে ঈশ্বর ইহকালে কোনও সুযোগ সুবিধাই দিতে পারে না, সেই ঈশ্বরই পরলোকে মানুষকে চরম সুখে রাখবে, এই অযৌক্তিক চিন্তা থেকে মানুষ কেন বের হয়ে আসতে পারে না, বা আসতে দেওয়া হয় না?

সাধারণ মানুষ যদি যুক্তিবাদী শিক্ষিত হয়ে ওঠে তারা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। তারা শাসকগণকে প্রশ্ন করে, "রাজা তোর কাপড় কোথায়?" তারা চায় শিক্ষার অধিকার। তারা চায় সুস্বাস্থ্যের অধিকার। তারা চায় মানুষের মতো বাঁচার অধিকার।

আর সাধারন মানুষকে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখতেই একসময় সর্বশক্তিমান অদৃশ্য এক ঈশ্বরের ভয়

দেখিয়ে ছিল ওই শাসকগোষ্ঠী। ব্যাপারটা এরকম যেন এই জীবনটা তোমার পরীক্ষা এখানে যতই কষ্ট পাও নিজের অধিকারের জন্য চেঁচামেচি করো না। তাঁকে ভয় করো। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু। তিনি তোমাকে এই কষ্টের জীবন থেকে মুক্তি দেবেন। তিনি তোমাকে খুবই ভালোবাসেন। কিন্তু যদি নিজের অধিকার নিয়ে চেঁচামেচি করো, তাহলে নরকেও ঠাঁই হবে না।

এই একবিংশ শতাব্দিতেও দেখছি সেই আদিম কৌশল খাটানোর নিরলস প্রচেষ্টা। এই কৌশলের সুবিধাটি এই যে, মানুষের চোখে যতদিন এই ধর্ম নামক পর্দা আছে ততদিন মানুষ অন্ধকূপে সুখে জীবন যাপন করবে। এই ধর্মের মোহ সরে গেলে, মানুষকে বিভাজন করে ভোট ব্যাংকের রাজনীতি করা দুঃসাধ্য। একজন নেতার পক্ষে এটা প্রতিশ্রুতি দেয়া অনেক সহজ যে একটা মন্দির বা মসজিদ বানিয়ে দেবেন। সময়মতো সেই মন্দির বা মসজিদ বানিয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষাও করা যাবে। কিন্তু স্কুল বানানো কি চাট্টিখানি ব্যাপার? এই শিক্ষক আনো রে, এই বই আনো রে, এই বেঞ্চ আনো রে। আবার সেই বিদ্যালয় থেকে বেরোনো শিক্ষিত ছাত্রই হয়তো একদিন প্রশ্ন করে বসলো, "রাজা তোর কাপড় কোথায়"। বড্ড risky ব্যাপার হতে পারে। সেদিক থেকে মন্দির বা মসজিদ বানানো নিরাপদ। মন্দিরের দেবতা সে প্রশ্ন করে না।

এখন এই প্রয়োজনহীন ধর্মবিমুখ মানুষকে ধর্মের ছত্রছায়ায় ফিরিয়ে আনা যায় কিভাবে? যে বিজ্ঞানের উপর আমাদের এত ভরসা সেই বিজ্ঞানকে যদি ব্যবহার করা যায় তা হবে এক অব্যর্থ হাতিয়ার। আর ওই যে আগেই বললাম মানুষ অবাক হতে ভালোবাসে। সেই সুযোগ নিয়ে বিজ্ঞানের বড় বড় বুলি আউড়ে সাধারণ মানুষকে হতবাক করা খুব কঠিন কাজ কিছু নয়। তারা বিজ্ঞান বুঝুক বা না বুঝুক, মহাবিশ্বের কোনও একটা ছবি দিয়ে তাকে শিবলিঙ্গের সাথে তুলনা করতে পিছপা হয়না। আবার চাঁদে বসে আজান শোনার মত হাস্যকর ঘটনা জনসমক্ষে বলতে এদের ঠোঁট কাঁপে না। একদিকে কোন ধর্মের ধর্মগুরু যেমন গোমাংস বিক্রেতার হত্যাকে 'Justify'

করে, অন্যদিকে তেমনি অন্য ধর্মের ধর্মগুরু, ধর্ম অবমাননার অপরাধে মানব হত্যাকে 'glorify' করে।

এই সকল ধর্মের ধর্মগুরু উদ্দেশ্য একটাই, আর তা হলো মানুষকে বোকা বানানো। অনেক ক্ষেত্রেই এরা সরকারের মদদপুষ্ট। যারাই একটু নামকরা ধর্মগুরু তারাই বেশ ধনী। শুকনো কাঠের মত খেতে না পাওয়া অপুষ্টিতে ভোগা ধর্মগুরু কোনদিন চোখে পড়ে না।

এই নধরপুষ্ট ধর্মগুরুরা যেসব সাধারণ মানুষকে বোকা বানিয়ে তাদের কষ্টার্জিত অর্থ আত্মসাৎ করে দিন দিন ফুলে-ফেঁপে ওঠে, সেই সব সাধারণ মানুষকে আমি দোষ দেই না। তাদের জন্য আমার একরাশ সহানুভূতি। এই সহানুভূতির কারণ তাদের অবস্থাটা আমি বুঝি।

ভাবুন একবার, আপনি ছোটবেলা থেকে একটা অলৌকিক ঈশ্বরের গল্প বারংবার শুনে এসেছেন, তার উপর আস্থা রেখেছেন। জীবনের নানা ওঠা পড়ার কারণ হিসেবে সেই অলৌকিক কাল্পনিক স্বত্বাকে দোষ দিয়েছেন। যখনই কোনও দুর্ঘটনা ঘটেছে, আপনি আকাশের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছেড়েছেন এই বলে, "হা ঈশ্বর! এমনি কেন করলে!" কোন ঝামেলায় পড়লে হিন্দি সিনেমার নায়ক এর মতো বলেছেন, "ইয়া আল্লাহ পরোয়ার দিগার, মদত!" এই বিশ্বাস নিয়ে যে, কেউ সাহায্য করবে। এখন শৈশব থেকে তিল তিল করে জমানো এই বিশ্বাস, মনের মধ্যে ঠুসে ঠুসে ভরা এই পরনির্ভরশীলতা থেকে বেরিয়ে আসা সহজ নয়। সেটা আমিও বুঝি। খাঁচায় বন্দি পাখি যে আকাশ কখনও দেখেনি, কোনদিন উড়তে শেখেনি, তাকে হঠাৎ করে একদিন যদি অনেক উঁচু থেকে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে সে ভয় পাবেই।

তাহলে কি এই ধর্মান্ধতা আঁকড়ে ধরে থাকা যুক্তিযুক্ত? মোটেই না! ঈশ্বরে বিশ্বাস মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টি করা ছাড়া আর কোনও কাজে আসে না। মানুষকে শোষণ করা ছাড়া আর কিছুই শেখায় না। মাথার উপরে কেউ আছে আমি একা নই, এই ভাবনাগুলো মানুষকে প্রশান্তি দিলেও, মানুষকে

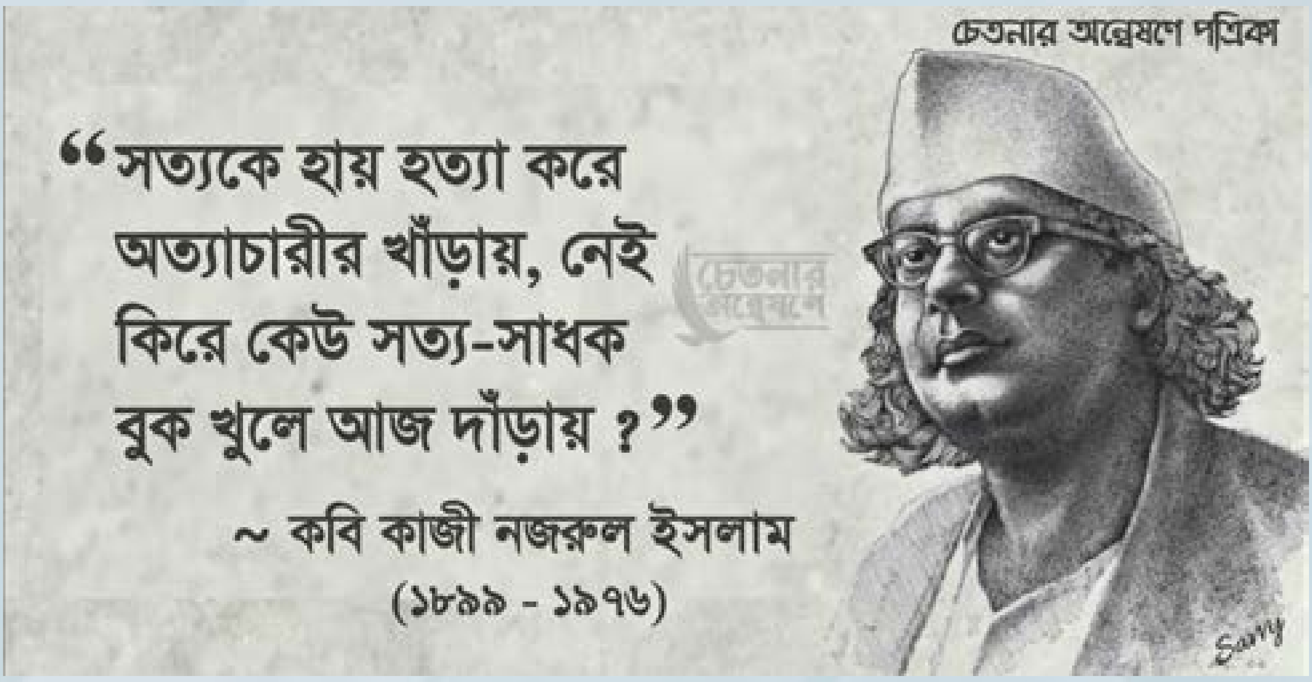
আত্মনির্ভর হতে শেখায় না।

তাহলে প্রতিকারের উপায় কি? শেষ অংশে সেই কথাই বলব। 'সবই বেদে আছে' অথবা 'বিজ্ঞানময় কোরআন' এই কথা বলার আগে একটা কথা ভাববেন। কথাটা হল সবই বেদে বা কোরআনে যদি থেকেও থাকে, তাতে আমাদের কি কোন লাভ হয়? ধরে নিলাম আপেক্ষিকতাবাদের ধারণা বেদে বা কোরআনে বা বাইবেলে গল্পের আকারে বা রূপক অর্থে বলা আছে। কিন্তু তাতে লাভটা কি হচ্ছে? আপনিতো বেদ বা কোরআন পড়েছেন। বলুন তো, একটা স্যাটেলাইটের ঘড়ি প্রতিদিন কতটা adjust করতে হবে যাতে সেই satellite সঠিক ভাবে কাজ করে? অথবা নিউমোনিয়া রোগের অব্যর্থ ওষুধ কি? অথবা dark matter বা dark energy কে শনাক্ত করতে হলে ঠিক কোন পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে? অথবা মাতৃগর্ভে শিশুর জিন বাহিত কোনও অসুখ নিরাময়ের উপায় কি?

আশ্চর্যজনকভাবে দেখবেন ধর্ম এ বিষয়ে নিরব। আমাকে অনেকেই প্রশ্ন করেন, এই যে ধর্মগ্রন্থে এই কথাটি লেখা আছে, এটা কি বিজ্ঞান তখন জানতো?!! তাদেরকে আমিও পাল্টা প্রশ্ন করি, এই কথাটা যে মানুষ প্রথম আপনাকে জানালো তাকে কে জানালো? বিজ্ঞান কি তখন জানতো? যেমন ধরুন general and special theory of relativity আইনস্টাইন এর আগে কেউ কি সেই ভাবে এই তথ্য কে উপস্থাপন করেছিলেন? তাহলে তিনি জানলেন কিভাবে? নিশ্চয়ই এই জ্ঞান অর্জনের জন্য ঈশ্বরের প্রয়োজন হয়নি? তার থেকেও বড় কথা বিজ্ঞানের এই জ্ঞান আমাদের কাজে লাগে। নিউটনের তিনটি গতিসূত্র এর উপর ভর করেই আমরা বহু সমস্যার সমাধান করেছি। ধর্ম তো যুগ যুগ ধরে আছে, কিন্তু মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন হয়েছে তখনই যখন মানুষ আর সেই কাল্পনিক ঈশ্বরের ইচ্ছের উপর নির্ভর না করে, স্বাবলম্বী হতে শিখেছে।

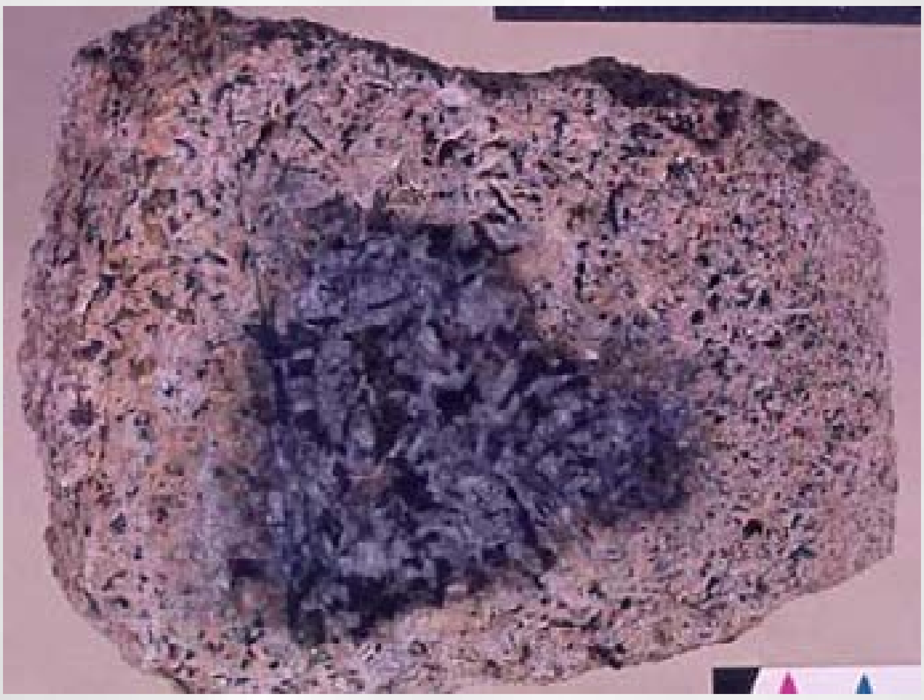
'বিজ্ঞানময় কোরআন' বা 'সবই বেদে আছে' এই কথা বলার উদ্দেশ্য হলো এটা প্রচার করা যে, এই সকল ধর্মগ্রন্থ

ঈশ্বরের বাণী। আমরা সবাই বিনাপ্রশ্নে বিনা বাক্যব্যয়ে ধর্মগ্রন্থের বাকি প্রত্যেকটি কথা মেনে নিয়ে আসুন আমরা অন্ধ হই, আসুন আমরা পরনির্ভর হই, আসুন আমরা অশিক্ষিত হই, আসুন আমরা মূর্খ হই, আসুন আমরা শোষিত হই।



ধাতব মৌলদের কথা: অ্যালুমিনিয়াম

লিখেছেন – অঞ্জনা ঘোষ



পর্ব -১

সভ্যতার সেই আদিকাল থেকে প্রস্তর যুগের পরে ব্রোঞ্জযুগ, লৌহ যুগ ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে সেই সুদূর অতীত থেকে শুরু হয়েছে সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিতে উপস্থিত বিভিন্ন ধাতব মৌলের আবিষ্কার ও প্রাত্যহিক জীবনের মান উন্নয়নে নানাভাবে তাদের বহুবিধ ব্যবহার।

আর আজ তো শুধু প্রকৃতি থেকে পাওয়া না, গবেষণাগারেও বিজ্ঞানীরা বেশ কিছু নতুন মৌল সংশ্লেষনে (synthesis) সমর্থ হয়েছেন। আধুনিক পর্যায়সারণিতে টেকনিটিয়াম (Tc- 43) এবং শেষ ২৪টি মৌল (পারমাণবিক সংখ্যা 95 -118) প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না। এগুলির প্রত্যেকটিই গবেষণাগারে সংশ্লেষিত মৌল (synthetic elements)। আর এরা প্রত্যেকেই তেজস্ক্রিয় এবং অস্থায়ী মৌল। বিশদে এদের আলোচনায় পরে আসব অন্য এক পর্বে।

বস্তুত মানব সভ্যতার অগ্রগতি ও ধাতুর ব্যবহার এই দু'এর সম্পর্ক এক কথায় অবিচ্ছেদ্য।

আমার এই উপস্থাপনায় আধুনিক জীবনের নানা ক্ষেত্রে অতি ব্যবহৃত কিছু ধাতুর কথা রইল। কয়েকটা পর্বে রাখার চেষ্টা করছি।

পর্ব- ১

ধাতু -অ্যালুমিনিয়াম

.

পর্যায়সারণি'র জনক দিমিত্রি মেন্ডেলিফ'কে বিজ্ঞানে তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য ইংরেজ রসায়নবিদরা তাঁকে সম্মানিত করেছিলেন একটি অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি ফুলদানি দিয়ে। অবিশ্বাস্য মনে হলেও একথা সত্যি। আসলে সময়টা হল অষ্টাদশ শতক। রূপোর মত চকচকে উজ্জ্বল বিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়াম সেসময় ছিল এক বহুমূল্য ধাতু। তার কারণ সেই সময় আকরিক থেকে অ্যালুমিনিয়াম ধাতু নিষ্কাষণের কোন সহজ পদ্ধতি তখনও আবিষ্কৃত হয়নি।

তবে আজকের পৃথিবীতে অ্যালুমিনিয়াম(Al) বহুলতম ব্যাবহৃত ধাতুগুলির মধ্যে অন্যতম একটি। পরিমানগত হিসেবে প্রকৃতিতে প্রাপ্ত মৌলদের মধ্যে অ্যালুমিনিয়াম'এর স্থান ৩য়(১ম অক্সিজেন ও ২য় সিলিকন)। কিন্তু মুক্ত অবস্থায় তো অ্যালুমিনিয়াম প্রকৃতিতে থাকেনা, থাকে রাসায়নিক যৌগ অর্থাত আকরিক হিসেবে।

১৮২১ সালে ফরাসী জিয়োলজিস্ট পি বার্থিয়ার ফ্রান্সের এক প্রত্যন্ত গ্রাম লেস বক্স (Les Baux) এ লালচে মাটির মত দেখতে, বক্সাইট আকরিক আবিষ্কার করেন। এই বক্সাইট আকরিক হল হাইড্রেটেড অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড (Al_2O_3, $2H_2O$)। এই বক্সাইট ছাড়াও অ্যালুমিনিয়াম'এর আরও কিছু আকরিক যেমন ক্রায়োলাইট(Na_3AlF_6), কোরান্ডাম(Al_2O_3) ইত্যাদি পাওয়া যায় প্রকৃতিতে। তবে সারাবিশ্বেইসবচাইতেআর্থিকভাবেলাভজনকএবংসহজতম

পদ্ধতিতে প্রধানত বক্সাইট আকরিক থেকেই অ্যালুমিনিয়াম ধাতু নিষ্কাষিত হয়। বহুল ব্যবহৃত এই ধাতুর পৃথিবী'র বিভিন্ন দেশে সমগ্র বার্ষিক উৎপাদন ৬৯ মিলিয়ন টন(2022 সালের হিসাব)।

আসলে বহু শিল্পে ও আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিপুল ভাবে ব্যবহৃত হয় অ্যালুমিনিয়াম।

এর কারণ অ্যালুমিনিয়াম ধাতু একাধারে বহু গুণের (quality) অধিকারী। অ্যালুমিনিয়াম হাল্কা ধাতু(ঘনত্ব 2.7 gm/cc) কিন্তু শক্তিশালী কারণ এর উচ্চ মানের নমনীয়তা (Malleability & ductility)। প্রসঙ্গত যদিও স্টিল অ্যালুমিনিয়ামের থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী (strong) কিন্তু অ্যালুমিনিয়ামের শক্তি/ভর অনুপাতের (strength/weight ratio) মান স্টিলের থেকে অনেক বেশি। তাই ছোট গাড়ি, এয়ারক্র্যাফট ইত্যাদি নির্মানে এই ধাতু (ধাতুর শঙ্কর) ব্যবহার করা হয়।

এছাড়াও অ্যালুমিনিয়াম অ-ক্ষয়কারী(non-corrosive) ধাতু। যদিও অ্যালুমিনিয়াম একটি বিক্রিয়াকারী (reactive) ধাতু কিন্তু বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়ার ফলে ধাতুর উপরিতলে (surface) অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড'এর কঠিন ও অ-ক্ষয়কারী (hard & non-corrosive) স্তর তৈরি হয়।

আবার অ্যালুমিনিয়াম উচ্চমানের তাপ ও বিদ্যুতের পরিবাহী। এছাড়াও অবিষাক্ত (non-toxic)। একই সঙ্গে এতসব গুণের (quality) সমাহার এবং আকরিকের সহজলভ্যতা ও উৎপাদন মূল্য অপেক্ষাকৃত কম হওয়ার কারণে আধুনিক জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে এই অ্যালুমিনিয়াম ধাতু।হাল্কা,নমনীয়তা, ক্ষয়রোধকারীতা(non-corrosive), নন-টক্সিসিটি, উচ্চমানের তাপ পরিবাহীতা ইত্যাদির কারণে রান্না করার বাসনপত্র,অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল, ক্যান, আধুনিক গৃহনির্মান থেকে শুরু করে এয়ারক্র্যাফটের প্রায় সব অংশই, ডানা থেকে শুরু করে ককপিটের সব যন্ত্রপাতি ইত্যাদি তৈরিতে বিপুল ভাবে ব্যবহৃত হয়।

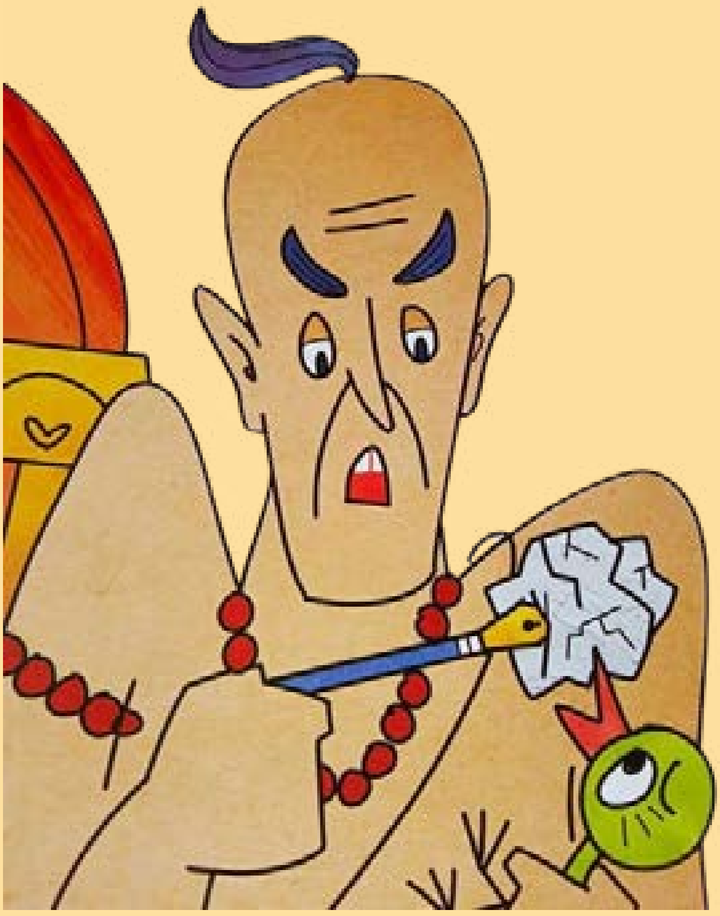
আবার উচ্চমানের নমনীয়তা ও বিদ্যুত পরিবাহীতার কারণে এবং কপারের থেকে অনেক সস্তা হওয়ার কারণে অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যুতের ট্রান্সমিশন লাইন তৈরীতে ও ব্যাবহৃত হয়। এছাড়াও আরও বহু শিল্পে, বিভিন্ন মেশিনপত্রের অংশ(parts) তৈরিতেও ব্যাপক হারে ব্যবহার হয় এই ধাতুর। এই বিপুল হারে ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে একসময় তো অ্যালুমিনিয়ামের ভান্ডারে টান পড়বে। না, এটাও খুব একটা আশঙ্কার ব্যাপার নয়। কারণ অ্যালুমিনিয়ামের পুণর্ব্যবহার (recycling rate) অত্যন্ত উঁচু মানের। সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অ্যালুমিনিয়াম বিপুল হারে রিসাইক্লিং হয়। আকরিক থেকে অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাষণ করতে যে পরিমাণ শক্তি খরচ হয় তার মাত্র 5-10% শক্তি ব্যয় হয় এই ধাতুর রিসাইক্লিং-এ। বিভিন্ন পানীয় বিক্রি হয় যে অ্যালুমিনিয়াম ক্যান গুলোতে সেগুলো তো প্রায় 100% রিসাইক্লিংযোগ্য।

এছাড়াও অ্যালুমিনিয়ামের নিষ্কাষণ ও শুদ্ধিকরণ (purification) বা রিসাইক্লিং কোন পদ্ধতির সময়েই পরিবেশে কোন গ্রীন হাউস গ্যাস নির্গত হয় না। তাই অ্যালুমিনিয়াম একটি পরিবেশ বান্ধব ধাতু সবুজ ধাতু(Green metal) হিসেবে চিহ্নিত।

আগামী পর্বে আর একটি ধাতু নিয়ে আলোচনা করবো।

মনুর চোখে নারী – হিন্দু ধর্মে নারীর দুরবস্থা

লিখেছেন - অজিত কেশকম্বলী



"বিশ্বের যা কিছু মহান, যা চিরকল্যানকর।
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।"
–কাজী নজরুল ইসলাম

এই মূল্যবোধ আধুনিক কবির থাকলেও ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রবক্তা মনুর কিঞ্চিতও ছিল না। ছিল না বলেই শূদ্রের পাশাপাশি, সকল বর্ণের নারীরই মানবিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করেছিলেন মনু। নারীর যে কোনও উঁচুজাতেই সম্মানজনক স্থান নেই, তাই তিনি স্পষ্ট করেছেন। তার রচিত শাস্ত্রের নাম 'মানব শাস্ত্র' অথবা 'মনুসংহিতা' এবং তার ধর্মের নাম 'মানব ধর্ম'। বর্তমান মানবিক মূল্যবোধের সম্পূর্ণ বিপরীতে মনুর 'মানব ধর্ম' প্রকৃতপক্ষে ছিল 'দানব ধর্ম', শোষণ-বঞ্চনার এক মারণাস্ত্র। মনুকে হিন্দু সমাজের আইন-কানুনের মূল প্রবক্তা বলা যায়।

এই মনুসংহিতাতে নারীকে জঘন্যভাবে উপস্থাপন করেছেন মনু, হরণ করেছেন তার সকল মৌলিক মানবিক অধিকার।

নারীদের সকল শিক্ষা,ধর্মীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন মনু–

উপনয়ন সংস্কারের মাধ্যমেই বৈদিক সমাজে পুরুষেরা তাদের শিক্ষাজীবনে প্রবেশ করতো কিন্তু মনু তার রচিত গ্রন্থে স্ত্রীদের উপনয়ন সংস্কার নিষিদ্ধ করেছেন এবং দেহশুদ্ধির জন্য তিন বর্ণের পুরুষদের যে সকল মন্ত্র উচ্চারণ করতে হত, স্ত্রীদের সে সকল মন্ত্র উচ্চারণে নিষেধ করেছেন। (২/৬৬) নারীদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করেছেন।

নারীরা যে শিক্ষাহীন ছিল তা স্পষ্ট হয় মনুর নিচের উক্তিতে–

> *"যে ব্যক্তিকে অভিবাদন করা হবে সে ব্যক্তি যদি সংস্কৃত না জানেন তাহলে অভিবাদনের পর অভিবাদনীয় ব্যক্তিকে 'আমি অভিবাদন করছি'–এই কথা বলবেন। স্ত্রীলোকদেরকে এইভাবেই অভিবাদন করবেন।" ২/১২৩*

নারীরা পুরুষদের ন্যায় সংস্কৃত জানেন না, তাই প্রকাশ পাচ্ছে এই শ্লোকে।

ধর্মাচরণের স্বাধীনতাও যে মহিলাদের ছিল না তা পরিষ্কার হয় মনুসংহিতার নিচের শ্লোক থেকে–

> *"যেহেতু শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুযায়ী মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমেই স্ত্রীজাতির জাতকর্ম সংস্কার পালিত হয় না তাই তাদের অন্তকরণ নির্মল হয় না। স্মৃতি শাস্ত্র ও বেদ প্রভৃতি ধর্ম শাস্ত্রের ওপর স্ত্রীজাতির কোনও অধিকার নেই। তাই তারা ধর্মজ্ঞ হতে পারে না। এমনকি কোনও মন্ত্রের ওপরেও স্ত্রীজাতির অধিকার না থাকায় তারা কোনও পাপ করলে মন্ত্রের সাহায্যে তা ক্ষালন করতে পারে না। তাই শাস্ত্রমতে স্ত্রিজাতি মিথ্যা অর্থাৎ অপদার্থ।" ৯/১৮*

আরও বলা হয়েছে,

"স্ত্রীলোকের স্বামী ভিন্ন পৃথক যজ্ঞ নেই। স্বামীর অনুমতি ছাড়া কোনও ব্রত এবং উপবাস নেই। কেবলমাত্র স্বামীর সেবা করেই স্ত্রীলোক স্বর্গে যেতে পারেন।" ৫/১৫৫

শিক্ষাবঞ্চিত নারীদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে,

"বিবাহ সংস্কারই স্ত্রীলোকের বৈদিক উপনয়ন সংস্কার। সেখানে স্বামীর সেবাই হল গুরুকুলে বাস এবং স্বামীর গৃহ কর্মই হল প্রাতঃসন্ধ্যাকালীন হোমরূপ অগ্নি পরিচর্যা।" ২/৬৭

নারীদের সম্বন্ধে করা হয়েছে জঘন্য সব মন্তব্য–

"ইহলোকে পুরুষদের দূষিত করা স্ত্রীলোকেদের স্বভাব। এই জন্য পন্ডিতেরা স্ত্রীলোকদের সম্পর্কে অসাবধান হন না।" ২/২১৩
"স্ত্রীগণ সৌন্দর্য বিচার করেন না। যুবা কী বৃদ্ধ সে ব্যাপারেও তাদের কোনও আপত্তি থাকে না। সুরূপই হোক বা কুরূপই হোক পুরুষ পেলেই তারা তার সঙ্গে সম্ভোগ করেন।" ৯/১৪
"পুরুষের দর্শন মাত্রেই স্ত্রীজাতির মনে তার সঙ্গে মিলনের ইচ্ছা জন্মায়। তাই স্বাভাবিক ভাবেই তাদের চিত্তচাঞ্চল্য থাকে।" ৯/১৫

"শয়ন, আসন, ভূষণ, কাম, ক্রোধ, পুরহিংসা, কুটিলতা ও কুৎসিত ব্যবহার– এইসকল প্রবৃত্তি স্ত্রীলোকের জন্যই সৃষ্টির সময় মনু কল্পনা করেছেন। অর্থাৎ ওইসকল প্রবৃত্তি নারীদের স্বভাবগত ব্যপার।" ৯/১৭

নারীর 'অন্তকরণ নির্মল হয় না।' ৯/১৮

শাস্ত্রমতে স্ত্রিজাতি মিথ্যা অর্থাৎ অপদার্থ। ৯/১৮

"মূর্খই হোক আর বিদ্বানই হোক কাম ক্রোধের বশীভূত পুরুষদের অনায়াসেই বিপথে নিয়ে যেতে কামিনীরা সমর্থ হয়।" ২/২১৪

ঋতুমতী নারীকে অশুচি বলে ঘোষণা করা হয়েছে, চণ্ডাল

প্রভৃতি তথাকথিত অশুচিদের সাথে ঋতুমতী স্ত্রীও অশুচির পর্যায়ে পড়েছে–

"চণ্ডাল, ঋতুমতী স্ত্রী, ব্রহ্মবধ করেছেন এমন পতিত ব্যক্তি, দশদিন পর্যন্ত নবপ্রসূতা সূতিকা,শব ও শবস্পর্শী- এদের স্পর্শ করলে স্নানের মাধ্যমেই শুদ্ধ হওয়া যায়।" ৫/৮৫

সুতরাং ভগবান মনুর কাছ থেকে আমরা কি শিখলাম? শিখলাম- চণ্ডাল, মরদেহ, খুনি, ঋতুমতী নারী, দশদিনের সন্তান প্রসবকারিনী সম অপবিত্রা।

ভ্রষ্ট পুরুষদের দোষ আড়াল করে মনু আউড়েছেন ভিন্ন বাণী, দোষ দিয়েছেন নারীর উপরেই–

"ইহ সংসারে দেহধর্মবশত সব মানুষই কাম ক্রোধের বশীভূত। তাই মূর্খই হোক আর বিদ্বানই হোক কাম ক্রোধের বশীভূত পুরুষদের অনায়াসেই বিপথে নিয়ে যেতে কামিনীরা সমর্থ হয়।" ২/২১৪

'নারীদের এমন স্বভাবেই সৃজন করেছেন বিধাতা', তাই নারীদের সব সময় বশে রাখার (রক্ষার) ব্যাপারে পুরুষদের সচেষ্ট হতে বলেছেন মনু (৯/১৬)–

মনু বলেছেন,

"বাল্যকালে স্ত্রীলোক পিতার বশে, যৌবনে স্বামীর বশে এবং স্বামীর মৃত্যু হলে পুত্রের বশে থাকবেন।পুত্র না থাকলে স্বামীর সপিণ্ডের বশে থাকবেন। অর্থাৎ স্ত্রীলোক কখনওই স্বাধীনভাবে অবস্থান করবেন না।" ৫/১৪৮

"শাস্ত্রমতে বিবাহের পূর্বে স্ত্রী জাতিকে কন্যা অবস্থায় পিতা রক্ষা করবেন।যৌবন অবস্থায় বিবাহিত স্ত্রীকে স্বামী রক্ষা করবেন। বৃদ্ধ কালে পুত্র রক্ষা করবেন। এমনকি পতিপুত্রহীন নারীকেও নিকটস্থ পিতৃ প্রভৃতিরা রক্ষা করবেন, কোনও অবস্থাতেই স্ত্রী জাতি স্বাধীন থাকবেন না।" ৯/৩

"স্বামী প্রভৃতি আত্মীয় পরিজনেরা দিনরাত্রির মধ্যে

কখনওই স্ত্রীজাতিকে স্বাধীনভাবে অবস্থান করতে দেবেন না। বরং সর্বদাই নিষিদ্ধ রূপ ও রসের ব্যাপারে তাদের অনাসক্ত করে তাদেরকে নিজের বশে রাখবেন।” ৯/২

“কী বালিকা, কী যুবতী, কী বৃদ্ধা গৃহে থাকাকালীন কোনও কাজই স্বতন্ত্রভাবে করতে পারবেন না।” ৫/১৪৭

“স্ত্রীলোক কখনওই পিতা,স্বামী বা পুত্রের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার চেষ্টা করবেন না। কারণ এদের থেকে পৃথক হলে পিতৃকুল ও পতিকুল– উভয় কুলকেই তিনি কলঙ্কিত করবেন।” ৫/১৪৯

নারীদের বশে রাখার বিভিন্ন উপায় বর্ণনা করেছেন মনু–

“কোনও পুরুষই বল প্রয়োগ করে কোনও স্ত্রীকে সৎ পথে রক্ষা করতে পারে না। তবে নিম্নোক্ত উপায় অবলম্বন করলে স্ত্রীদের সহজেই রক্ষা করা যায়।” ৯/১০

উপায়গুলো হল–

“অর্থের সংগ্রহ ব্যয় সাধনে, নিজের শরীর ও গৃহ দ্রব্যের শুদ্ধিবিধানে, স্বামীর স্থাপিত অগ্নির শুশ্রুসায়, পাককার্যে এবং বিভিন্ন গৃহ দ্রব্যের পর্যবেক্ষণে স্ত্রী জাতিকে সর্বদা নিযুক্ত রাখা উচিত। এই সকল বিষয়ের কার্যভার স্ত্রীর উপর অর্পণ করলে সর্বদাই সৎ কর্মে ব্যস্ততায় মগ্ন থাকায় কুকর্ম ঘটানোর সম্ভাবনা থাকে না।” ৯/১১

নারীদের বশে রেখে শাসন করার জন্য ভগবান মনু বানিয়েছেন সকল বৈষম্যমূলক আইন; এমনকি নারীদের প্রহার করতেও বলা হয়েছে তার রচিত মানবশাস্ত্রে–

“পত্নীর সঙ্গে কখনওই তিনি (স্নাতক ব্রাহ্মণ) একপাত্রে ভোজন করবেন না।” ৪/৪৩

“স্ত্রী,পুত্র,দাস,শিষ্য এবং সহোদর কনিষ্ঠ ভাই অপরাধ করলে সূক্ষ্ম রজ্জু দিয়ে অথবা বেণুদল বা বাঁশের বাখারি দিয়ে শাসনের জন্য তাদের আঘাত করবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে রজ্জু বা বাখারি দিয়ে শরীরের পৃষ্ঠ দেশেই

একমাত্র আঘাত করতে হবে কখনওই উত্তমাঙ্গে বা মস্তকে আঘাত করা যাবে না।" ৮/২৯৮-৩০০

স্বামী অপরাধ করলে স্ত্রী কি করবে, এ বিষয়ে যে কিছু বলা নেই, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

নারীকে সম্পদ থেকে বঞ্চিত করে বলা হয়েছে-

"বন্ধ্যা নারী অর্থাৎ যার স্বামী অন্য স্ত্রী গ্রহণ করে গ্রাসাচ্ছাদন বহনোপযোগী অর্থ দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে, পুত্রহীন প্রোষিতভর্তৃকা, যে স্ত্রীর কোনও সপিণ্ড অভিভাবক নেই অথচ যে নিজে সাধ্বী, বিধবা এবং রুগ্না স্ত্রী – এদের সকলের ধন অনাথ বালকের সম্পদের মতোই রাজা নিজে রক্ষা করবেন।" ৮/২৮

নারীর বাল্যবিবাহ ও বিবাহে বয়সবৈষম্য

"তিরিশ বছরের যুবক মনোমতো বারো বছরের কন্যাকে বিবাহ করবে। চব্বিশ বছরের যুবক মনোমতো আট বছরের কন্যাকে বিবাহ করবে। কিন্তু যদি ধর্মহানির আশঙ্কা থাকে অর্থাৎ ব্রহ্মচারীর বেদ গ্রহণ যদি তিরিশ বা চব্বিশ বছরের আগেই শেষ হয় তাহলে আগেই বিবাহ করা যেতে পারে। টীকাকার কুল্লুকের মতে, কন্যার বয়স অপেক্ষা বরের বয়স প্রায় তিন গুণ বেশি হবে- এই মাত্রা জ্ঞাপন করাই এই বচনের তাৎপর্য। কন্যার বয়ঃক্রম নির্ধারণ করা এই বচনের তাৎপর্য নয়।" (৯/৯৪)

এইভাবে একদিকে নারীদের বাল্যবিবাহের বিধান দেওয়া হয়েছে এবং অপরদিকে শিশু কন্যার সাথে তার তিনগুণ বয়সের পুরুষের বিবাহের নিয়ম তৈরি করা হয়েছে।

নিচুজাতির কন্যাকে ভোগ করার প্রবৃত্তি এবং উচ্চবর্ণের কন্যার সাথে নিম্নবর্ণের পুরুষের বিবাহের অস্বীকৃতি।

আর্যদের বর্ণপ্রথা সম্বন্ধে আপনারা সকলেই হয়তো কমবেশি জানেন। এই প্রথায় ব্রাহ্মণ সবচেয়ে সুবিধাভোগী, শূদ্র সবচেয়ে নির্যাতিত আর অস্পৃশ্যদের তো মানুষ হিসাবে স্বীকৃতিই নেই। এই বর্ণপ্রথায় নারীভোগের এক বিশেষ পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল সুচতুর ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। ব্রাহ্মণ এর ঘাড়ে দোষ চাপানোর কারণ হল, এইসব রীতি নীতির তারাই প্রবক্তা এবং

তারাই এর সবচেয়ে নির্লজ্জ সুবিধাভোগী। বর্ণপ্রথাতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সবার মধ্যে শিক্ষা, জীবিকা, ধর্মাচার সকল বিষয়ে অসাম্য ও বৈষম্য কাজ করতো এবং সেই বৈষম্যের কুৎসিত প্রকাশ পায় নারী বিবাহ/ ভোগ বিষয়ে।

বিবাহের ক্ষেত্রে বর ও কনের বর্ণ বিবেচনা করে বিবাহকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছিল।

১/ অনুলোম বিবাহঃ উচ্চ বর্ণের পুরুষের সাথে নিম্নবর্ণের স্ত্রীর বিবাহ।

২/ প্রতিলোম বিবাহঃ এক্ষেত্রে কন্যা উচ্চবর্ণের ও বর নিম্নবর্ণের হয়ে থাকে।

ব্রাহ্মণ মনু তার শাস্ত্রে অনুলোম বিবাহের অনুমোদন দেন এবং প্রতিলোম বিবাহকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন।

এই অনুলোম-প্রতিলোম নিয়মের ফলে ব্রাহ্মণ চাইলে ব্রাহ্মণী,ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা যেকোনও বর্ণের স্ত্রীকে বিবাহ করতে পারতো।

ক্ষত্রিয় পারতো ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা, শূদ্রা রমণীকে বিবাহ করতে। কিন্তু ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণীকে বিবাহ করা নিন্দনীয় ছিল।

বৈশ্য, বৈশ্যা ও শূদ্রা নারীকে বিবাহ করতে পারতো কিন্তু ক্ষত্রিয়া ও ব্রাহ্মণীকে বিবাহ করতে পারতো না।

কিন্তু শূদ্র বেচারা সবার নিচে অবস্থান করায় সে কেবল শূদ্রাকেই বিয়ে করতে পারতো তার অন্য বর্ণে বিবাহের কোনও অধিকার ছিল না।

এই পদ্ধতির বিশ্লেষণে দেখা যায় কূট বুদ্ধিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের নারীর উপর তার হস্ত চালনা করেছে।বাকি বর্ণ গুলোও পারছে অন্যান্যা বর্ণের নারীকে বিবাহ করতে কিন্তু শূদ্র জাতি (বিশেষত শূদ্র পুরুষ) বঞ্চিত হচ্ছে অন্য বর্ণে বিবাহে এবং শূদ্রা পরিণত হয়েছে সকল উচ্চবর্ণের সাধারণ ভোগ্যপণ্যে।

অপরদিকে, আর্যরা তাদের নারীদের ভালোভাবেই নিয়ন্ত্রণ

করেছে। যখন উচ্চবর্ণের কোনও নারী নিম্নবর্ণের কোনও পুরুষকে বিবাহ করতে গিয়েছে তখনই উৎপন্ন সন্তানকে নিন্দনীয় বর্ণসংকর ঘোষণা করা হয়েছে এবং তাদের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান করা হয়েছে।

মনু বলেন,

"নিকৃষ্ট জাতির কন্যা যদি সম্ভোগের জন্য নিজের থেকে উৎকৃষ্ট জাতির পুরুষকে ভজনা করে তাহলে ঐ কন্যার কিছুই দণ্ড হবে না।কিন্তু সে যদি অপকৃষ্ট জাতির পুরুষকে ভজনা করে তাহলে যে পর্যন্ত তার কাম নিবৃত্তি না হয় সে পর্যন্ত তাকে গৃহে আটকে রাখতে হবে।" ৮/৩৬৫

"উত্তম জাতির সকামা কন্যাকে অধম জাতির পুরুষ যদি ভজনা করে তাহলে ঐ পুরুষের শারীরিক বধ দণ্ড হবে। ..." ৮/৩৬৬

মহর্ষি মনু 'কোনও অভিযোগ না করে উচ্চ তিন বর্ণের দাসত্ব (সেবা) করে যাওয়াকে' – শূদ্রের কর্তব্য বলে বর্ণনা করেছিলেন কিন্তু তার সমাজে নারী যেন অলিখিত শূদ্র। কোনও বর্ণেই তার যেন মর্যাদা নেই, স্বাধীনতা নেই। শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নারীকে পিতা-ভ্রাতা-স্বামী-রাজার দাস করে রেখেছিলেন মনু ও তার সমাজ। তাই তো দাসরূপ নারীকে বলা হয়েছে,

পতিসেবাই তার একমাত্র ধর্ম–

"পিতা স্বয়ং যে ব্যক্তির কাছে কন্যা দান করেছেন কিংবা পিতার অনুমতিক্রমে ভাই যে ব্যক্তির কাছে বোনকে দান করেছেন, সেই স্বামীর জীবিতকাল পর্যন্ত তার সেবা করা এবং স্বামীর মৃত্যুর পরও ব্যভিচার না করা স্ত্রীলোকের কর্তব্য।" ৫/১৫১

স্ত্রীলোককে গৃহ কর্মে দক্ষ হতে বলা হয়েছে। (৫/১৫০)

কায়মনোবাক্যে পতিসেবা পরায়ণতাই স্ত্রীজাতির ধর্ম। পতিসেবাপরায়ণ ভক্তিমতী স্ত্রীদের পুরস্কার স্বরূপ স্বামী-পিতামহের পিণ্ডের উচ্ছিষ্ট দান করার কথা বলা হয়েছে।

(৩/২৬২) কায়মনোবাক্যে পতিসেবাপরায়ণ নারীধর্ম পালনকারী নারী ইহলোকে অত্যন্ত সুখ্যাতি পান এবং মৃত্যুর পরে পতিলোকে গমন করেন। (৫/১৬৬-১৬৭) তাই স্বামীর জীবনকালে, এমনকি মৃত্যুর পরেও স্ত্রীদের অনিষ্টাচরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। স্বামীর মৃত্যুর পরেও কখনওই তার মৃত স্বামীর অপ্রিয় আচরণ না করতে বলা হয়েছে। এর ফলেই নাকি স্ত্রী তার উপার্জিত পূণ্যে স্বামীর কাছে স্বর্গে গমন করবেন (৫/১৫৬) এবং ইহলোকে সাধ্বী স্ত্রীর খেতাব প্রাপ্ত হবেন! (৯/২৯)

স্বামী ধন,মান,কূল,শীলে অপকৃষ্ট হলে স্ত্রীলোকের অন্যকোনও পুরুষকে গ্রহণ করাকে নিন্দনীয় বলা হয়েছে। (৫/১৬৩)

‘আমি ধনীর কন্যা’- এরূপ দম্ভরূপে অথবা নিজের সৌন্দর্যের অহংকারে কোনও নারী স্বামীকে ত্যাগ করে অন্য পুরুষকে গ্রহণ করলে তাকে লোকজনের সামনে কুকুর দিয়ে খাওয়ানোর কথা বলা হয়েছে। আর সেই নারী যে পুরুষের সঙ্গ লাভ করেছিল তাকে গরম লৌহ শয্যায় শুইয়ে রেখে পুড়িয়ে মেরে ফেলার কথা বলা হয়েছে এবং যতক্ষণ না সেই পুরুষ পুড়ে ছাই হয়ে যায় ততক্ষণ আগুনে কাঠ নিক্ষেপ করতে বলা হয়েছে। (৮/৩৭১-৩৭২)

স্ত্রীর দাসত্ব স্বামীর মরণেও শেষ হয় না, তাকে মৃত স্বামীরও দাসত্ব করতে হয়।

স্বামী মারা গেলে স্ত্রীজাতির কর্তব্য-

স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীদের পুনর্বিবাহ অর্থাৎ বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ করে বলা হয়েছে-

“...বিবাহ সম্বন্ধীয় শাস্ত্রে এমন কোনও বিধি লিখিত নাই যে বিধবাদের পুনর্বিবাহ হতে পারে।” ৯/৬৫

বিধবার জীবন ছিল মৃত্যুর থেকেও ভয়ঙ্কর, বিধবার যাতে আর দৈহিক সৌন্দর্য না থাকে, সে যাতে আর অন্য পুরুষকে আকৃষ্ট করতে না পারে তাই কঠোর ব্রহ্মচর্যের মাধ্যমে তার সৌন্দর্য নষ্ট করে দেয়ার জন্য বলা হয়-

“স্বামী মারা গেলে স্ত্রী পবিত্র ফলমূল আহার করে জীবন যাপন করবেন। কিন্তু কখনওই ব্যভিচারের ইচ্ছায় পরপুরুষের নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করবেন না।” ৫/১৫৭

“যতদিন না নিজের মৃত্যু হয় ততদিন পর্যন্ত পতিপরায়ণা স্ত্রী ক্লেশ সহিষ্ণু ও নিয়মচারিণী হয়ে মধু মাংস ও মৈথুন বর্জন করে ব্রহ্মচর্য পালন করবেন। অর্থাৎ সতী সাধ্বী স্ত্রীলোকের যা অন্যতম পরম ধর্ম সেই ধর্ম পালনেই তিনি একাগ্র হবেন।” ৫/১৫৮

“ সদাচারশালী স্ত্রী স্বামীর মৃত্যু হলে ব্রহ্মচর্য ব্রত অবলম্বন করবেন। কিন্তু কখনওই পরপুরুষের সংযোগে পুত্র উৎপাদন করবেন না। কারণ অপুত্রা হলেও উক্ত ব্রহ্মচারীদের (বালখিল্য ঋষি) মতোই তিনিও স্বর্গে গমন করতে পারবেন।”৫/১৬০

স্ত্রী যাতে পরপুরুষের সাথে কোনোরূপ সম্পর্ক না করতে পারে সেদিকে আর্যরা বেশ সচেষ্ট ছিল। (৯/৮-৯)বিধবা রমণীকে ভয় দেখিয়ে বলা হয়েছে,

“স্ত্রীলোক যদি পরপুরুষের উপভুক্ত হন তাহলে ব্যভিচার দোষে সংসারে নিন্দনীয় হন। এইরূপ স্ত্রীলোক পরকালে শেয়াল হয়ে জন্মান এবং কুষ্ঠ প্রভৃতি বিভিন্ন পাপরোগে আক্রান্ত হয়ে অত্যন্ত পীড়া ভোগ করেন।” (৫/১৬৪ ; ৯/৩০)

সুতরাং স্ত্রীজাতির দায়িত্ব আমরণ তার স্বামীর সেবা করা এবং স্বামীর মারা গেলেও তার অপ্রিয় আচরণ অর্থাৎ অন্য পুরুষের সংসর্গ না করা এবং পুনরায় বিবাহ থেকে বিরত থাকা এবং কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করা।

এবার তাদের স্ত্রীদের আজীবন কষ্টের কি প্রতিদান দিয়েছেন আর্যপুরুষেরা দেখা যাক-

নারীদের সাথে প্রতারণার ভালোই পথ তারা বেছে নিয়েছিল আর্য পুরুষেরা। মনু তাদের সেইরকমই শিক্ষা দিয়ে বলেন,

"'তুমি আমার পরম প্রেয়সী, অন্যকে আমি প্রার্থনা করিনি' – এইভাবে সঙ্গ লাভের জন্য কামিনী (নারী) বিষয়ে মিথ্যা শপথ করলে পাপ হয় না। 'আমি অন্য বিবাহ করবো না', এইরূপ ক্ষেত্রে বিবাহ বিষয়ে এবং গোরুর ভক্ষ্য বিষয় সম্বন্ধে, হোমের জন্য কাষ্ঠ আহরণ বিষয়ে এবং ব্রাহ্মণের রক্ষার জন্য মিথ্যা শপথে কোনও পাপ হয় না।" ৮/১১২

বিবাহিতা নারীর প্রতি শক্ত হয়েছে আর্যসমাজ, নারীর ত্রুটি পেলেই তাকে ত্যাগ করতে বলা হয়েছে। মনুর শাস্ত্রে বলা হয়েছে–

মদ্যপানে আসক্ত, দুশ্চরিত্র, পতিবিদ্বেষিণী, কঠিন রোগগ্রস্থ, অপকার সাধনে সক্ষম, ধনক্ষয়কারী স্ত্রীকে ত্যাগ করে স্বামীকে দ্বিতীয় বিবাহ করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। (৯/৭৯-৮০)

"...স্ত্রী যদি অপ্রিয়ভাষিণী হন তাহলে কালক্ষয় না করে তৎক্ষণাৎ স্বামী বিবাহ করবে।" ৯/৮১

"স্ত্রী যদি স্বামীর প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হন তাহলে স্বামী স্ত্রীর জন্য এক বৎসর কাল প্রতীক্ষা করবে। তার মধ্যে স্ত্রীর দ্বেষভাব গত না হলে স্বামী তাকে অলঙ্কার প্রভৃতি সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে তার সহবাস ত্যাগ করবে।" ৯/৭৭

ঘরে স্ত্রী থাকার পরেও স্বামী যদি পুনরায় বিবাহ করেন, আর তাতে স্ত্রী যদি নারাজ হয়ে ঘর ছেড়ে চলে যেতে উদ্যত হন তাহলে সেই স্ত্রীকে অবরুদ্ধ করার উপদেশ দেয়া হয়েছে মনুস্মৃতিতে অথবা সেই স্ত্রীকে আত্মীয় স্বজনের সামনে ত্যাগ করার কথা বলা হয়েছে। (৯/৮৩)

এবং সর্বোপরি সতী সাধ্বী স্ত্রী মারা যাওয়ার পর স্বামীকে পুনরায় বিবাহ করতে বলা হয়েছে–

"সতী সাধ্বী স্ত্রী আগে মারা গেলে তার দাহকার্য ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপ্ত করার পর পুরুষ পুনরায় বিবাহ করবেন এবং পুনরায় অগ্ন্যাধান কর্ম সম্পন্ন করবেন। এইভাবে পূর্বোক্ত বিধান অনুযায়ী নিত্য পঞ্চমহাযজ্ঞ সম্পাদন করবেন এবং পুনরায় দার পরিগ্রহ করে

পরমায়ুর দ্বিতীয় ভাগে গৃহস্থাশ্রমেই বাস করবেন। "৫/১৬৮–১৬৯

পুত্রপ্রাপ্তিতে মরিয়া মনুর সমাজ–

পুত্রের জন্য মানুষ স্বর্গ লাভ করে। পৌত্রের জন্য মানুষ ঐ স্বর্গ লোকে চিরস্থায়িত্ব লাভ করে এবং প্রপৌত্রের জন্য মানুষ সূর্যলোক লাভ করে। মনুসংহিতা ৯/১৩৭

পুত্র শুধু স্বর্গে পোঁছাতে সাহায্য করে না, স্বর্গের সাথে সাথে পুত্র নরক থেকেও তার পিতৃকুল ও মাতৃকুলকে ও রক্ষা করে–

"পুত্র যেহেতু পিতাকে পুৎ নামক নরক থেকে ত্রাণ করে তাই ব্রহ্মা স্বয়ং 'পুত্র' এই নাম রেখেছেন। পৌত্র এবং দৌহিত্রের মধ্যে এমন কিছু পার্থক্য শাস্ত্রে বলা হয়নি। কারণ দৌহিত্র পরলোকে পৌত্রের মতোই মাতামহকে পরিত্রাণ করে।..." ৯/১৩৮–১৩৯

সনাতন নারী শস্যক্ষেত্র, পুরুষ সেই ক্ষেত্রের মালিক–

পুত্র যেহেতু স্বর্গের দ্বার ও নরক হতে উত্তরণের পথ তাই আর্যরা পুত্রলাভের জন্য অত্যন্ত মরিয়া হয়ে উঠেছিল। কিন্তু কখনও কখনও দেখা গেল, কোনও কোনও আর্যপুরুষ ললাটদোষে উর্বরতাহীনতার কারণে পুত্র উৎপাদনে অক্ষম। কেউ কেউ অপুত্রক অবস্থায় ভুত-প্রেতে পরিণত হল। এমন জটিল পরিস্থিতিতে ভগবান মনুই তাদের পথ দেখালেন, বাতলে দিলেন পুত্রপ্রাপ্তির পথ। যেহেতু বেদে বলা আছে বিধাতা নারীকে গর্ভ ধারণের জন্যই সৃষ্টি করেছেন (৯/৯৬) তাই, স্থির হল, চুপিসারে গভীর রাতে নপুংসক স্বামী অথবা গুরুজনের আদেশে সধবা অথবা বিধবা স্ত্রীকে ঘি মাখিয়ে প্রস্তুত করে রাখা হবে, আর ওই রমণীর সাথে কোনও পরিচিত পরপুরুষ রমণ করবে এবং তার গর্ভে একটি পুত্র উৎপাদন করবেন।কখনও একাধিক পুত্র উৎপাদনের বিধানও দিয়েছিলেন মহর্ষি মনু। (৯/৬০, ৯/৬১) এই গোপন কর্মে পরপুরুষ যত কাছের হবে, ব্যাপারটিও ততোই গোপন রবে।

তাই আর্যধর্ম অনুযায়ী দেবর আর ভাসুরের কর্তব্য স্থির হল- গভীর রাতে ভ্রাতৃবধূরমণ। (৯/১৪৬) তবে, দেবর- ভাসুরের অভাবে বংশের অন্য কোনও পুরুষকেই এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে হত। যেভাবেই হোক নরক থেকে নিষ্কৃতি ও স্বর্গ মার্গে পদক্ষেপন করতে তো হবে!

পাঠকদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে। এই যে গুপ্ত পদ্ধতিতে পুত্র উৎপন্ন হল, এই পুত্র তো স্বর্গগমনেচ্ছুক আর্যপুত্রের ঔরসজাত নয়। তাহলে কি করে সে মৃত্যু-পরে স্বর্গোপরে লীলা-খেলা করবে?

এই প্রশ্ন ও বিস্ময়ের সমাধান দিয়েছেন, আমাদের মনু ভগবান। তিনি দাঁড় করিয়েছেন তার 'ক্ষেত্রজপুত্র' নামক থিওরি। এই তত্ত্বে তিনি নারীকে, এবার পরিণত করেছেন ক্ষেতে। মনু বলেছেন, নারী হল পুরুষের ক্ষেত আর পুরুষ এর থাকে বীজ। (৯/৩৩-৩৪) আর খেতে বীজ লাগিয়েই চারাগাছ উৎপন্ন করা হয়। কিন্তু রাম এর ক্ষেতে যদি বলরাম অমাবস্যার রাতে, অন্ধকারে,বীজ লাগিয়ে আসে, আর তাতে ধান, গম এর ফলন হয়, তবে রাম তার ক্ষেতের ফসল বলরামকে দেবে কেন, যতই বলরামের বীজ হোক না কেন?

ভগবান মনুর ভাষায়,

> ***"যেমন অন্যের গাভী,মহিষী,স্ত্রী উট ও স্ত্রী ঘোড়া প্রভৃতি জন্তুদের সঙ্গে অন্যের বৃষ, মহিষ,উট এবং ঘোড়া প্রভৃতির মিলনে উৎপন্ন সন্তান গাভী প্রভৃতি পশু মালিকদেরই অধিকৃত হয়ে থাকে; বৃষ প্রভৃতি পশু মালিকদের হয় না। সেইরূপ পরক্ষেত্রে অর্থাৎ পরস্ত্রীতে উৎপাদিত সন্তান উৎপাদকের হয় না, ক্ষেত্র স্বামীরই হয়ে থাকে। যার ক্ষেত্র নেই কেবল বীজ আছে সে যদি পরের ক্ষেত্রে বীজ বপন করে তাহলে তার শস্যফল কিছুই লাভ হয় না। ক্ষেত্রস্বামীই ঐ ফল ভোগ করে থাকে।"***

(৯/৪৮-৪৯)

এইভাবেই নারীকে ক্ষেতে রূপান্তরিত করে তাতে নানান জাতের বীজ লাগাতেন প্রতিভাবান আর্যপুত্রগণ।

ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনের ক্ষেত্রে সবসময় নারীর ইচ্ছার মূল্য দেওয়া হত না, স্বামীর মৃত্যুর পর নারী যাতে স্বেচ্ছায় ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনের মাধ্যমে পরপুরুষের সাথে মিলিত হতে না পারে এবং নারীর তথাকথিত সনাতন সতীত্ব যেন কোনোমতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেজন্য নারীকে এই কাজ করতে নিরুৎসাহিত করে মনু ভগবান চরম স্ববিরোধী কথা বলেন–

(উল্লেখ্যঃ– বিধবা নারীর পুনর্বিবাহও নিষিদ্ধ করেছিলেন মনু, কিন্তু স্ত্রী মারা যাওয়ার সাথে সাথেই পুরুষকে পুনরায় বিবাহ করতে বলেছিলেন।)

"সন্তান না থাকলে স্বর্গ গমন হয় না একথা ভুল। বালখিল্য প্রভৃতি বহু সহস্র ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ সন্তান উৎপাদন না করেই কেবলমাত্র ব্রহ্মচর্য বলেই অক্ষয় স্বর্গ লোক লাভ করেছেন। সুতরাং ওই সকল ব্রহ্মচারীর মতোই সাধ্বী স্ত্রী সন্তানবতী না হলেও স্বীয় ব্রহ্মচর্য বলেই স্বর্গ গমন করেন।" ৫/১৫৯

ক্ষেত্রজ পুত্রের উদাহরণ হিসাবে বলা যায় মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্র, পান্ডু প্রভৃতির জন্মকথা। মহাভারতের রাজা বিচিত্রবীর্য অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে, বংশের গুরুজনেরা তার স্ত্রী অম্বিকা এবং অম্বালিকার গর্ভে ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনের পদক্ষেপ নেন। মাতা সত্যবতী স্থির করেন তার পুত্র বেদব্যাস দ্বারা মৃত পুত্রের স্ত্রী অম্বিকা ও অম্বালিকার গর্ভে পুত্র উৎপাদন করবেন। ডাকা হল বেদব্যাসকে। গভীর রাতে তিনি বৌদিদের শয়নকক্ষে প্রবেশ করলেন। যেহেতু বেদব্যাস অত্যন্ত কুৎসিত, কদাকার দেখতে ছিলেন তাই অম্বিকা ও অম্বালিকা সম্মত ছিলেন না বেদব্যাসের সাথে পুত্র উৎপাদনে।

সঙ্গমকালে অম্বিকা চোখবুজে কুরু বংশের অবিবাহিত বীর ভীষ্মের কথা ভাবছিলেন, আর অপরদিকে অম্বালিকা ভয়ে পাণ্ডু বর্ণ হয়ে গিয়েছিলেন। সহবাসকালে অম্বিকার চোখ

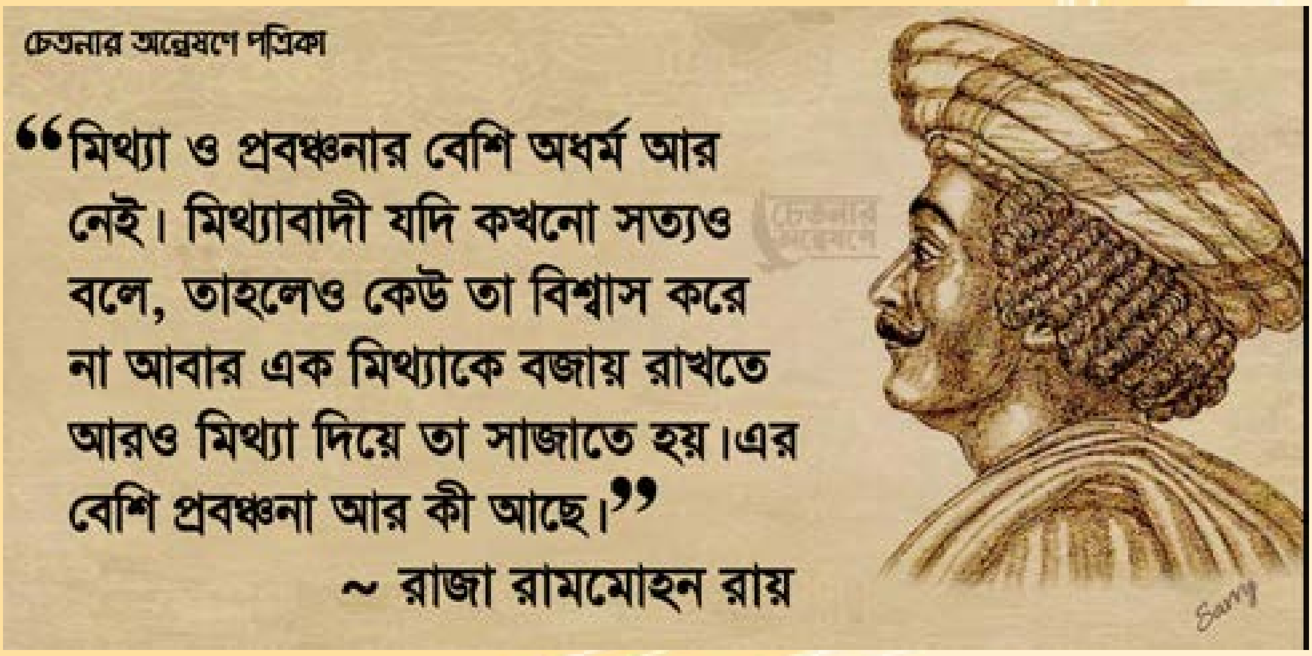
বন্ধ থাকার কারণে কারণে তার পুত্র ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ হলেন, আর ভয়ে অম্বালিকার গায়ের রঙ পান্ডু বর্ণ হয়ে যাওয়ার ফলে তার পুত্রের নাম হল পান্ডু।

অর্থাৎ দেখা যায়, বেদব্যাস ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনের জন্য অম্বিকা ও অম্বালিকাকে একপ্রকার ধর্ষণ করেছিলেন।

কতইনামহৎছিলেন আর্যপুরুষগণ। প্রয়োজনে স্ত্রীকে ক্ষেত বানিয়েছেন। সেই ক্ষেতে নানা জাতের বীজ লাগিয়েছেন। সেই ক্ষেত থেকে অদ্ভুত রকম ফলন পেয়েছেন এবং প্রয়োজনে স্ত্রীদের ধর্ষণও করিয়েছেন!

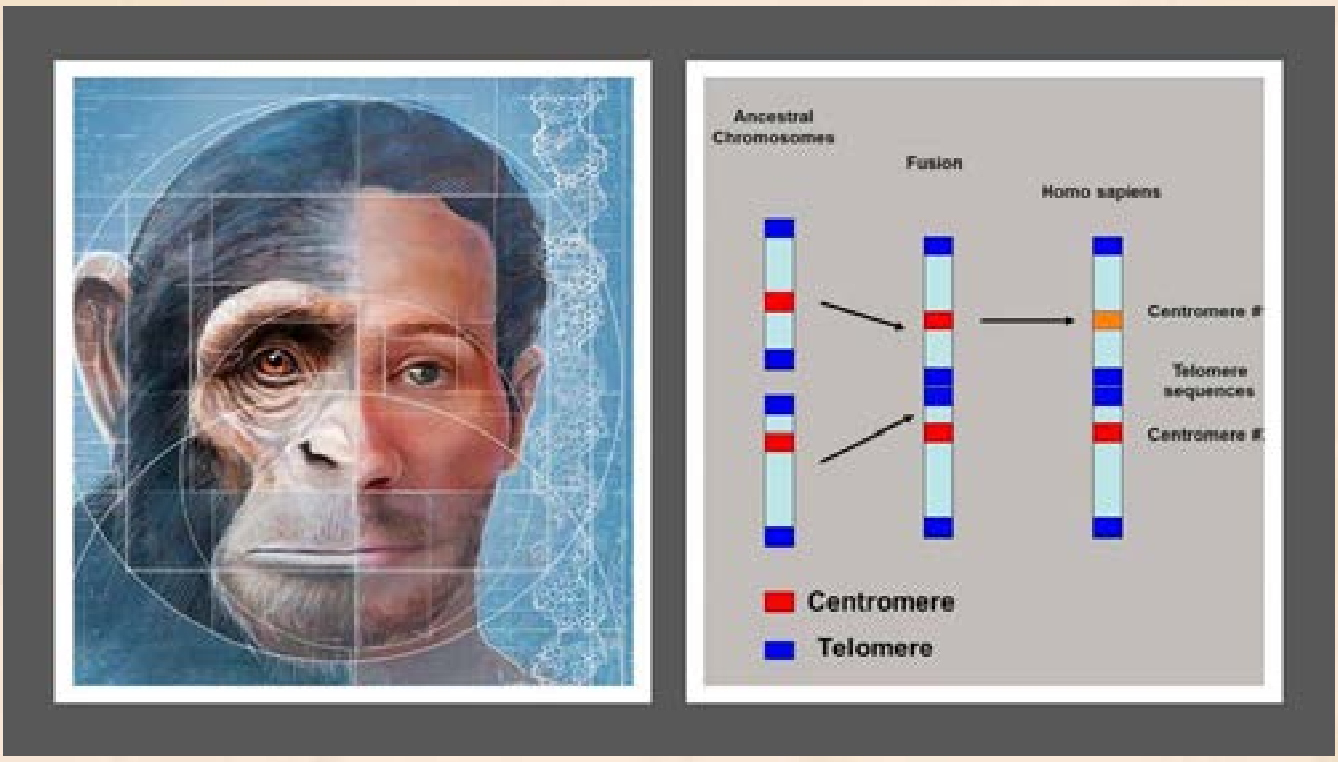
সহায়ক গ্রন্থ-

মনুসংহিতার অধিকাংশ শ্লোকের তর্জমা চৈতালি দত্তের অনুবাদকৃত মনুসংহিতা হতে গৃহীত হয়েছে



মানুষের একজোড়া ক্রোমোজোম কোথায় হারিয়ে গেল?

লিখেছেন – নির্মাল্য দাশগুপ্ত



আমরা জানি, শিম্পাঞ্জি, গরিলা, বেবুন, ওরাংওটাং, মানুষ এদের সবার একজন সাধারণ পূর্বপুরুষ ছিল, যার থেকে বিভিন্ন সময়ে বিবর্তনের মাধ্যমে বিভিন্ন বানর প্রজাতির সৃষ্টি হয়েছে কোটি কোটি বছর ধরে। শিম্পাঞ্জি আর মানুষ আলাদা হয়ে যায় ষাট লক্ষ বছর আগে। এই বিবর্তনের পাথুরে প্রমাণ হল, শিম্পাঞ্জি আর মানুষের ডিএনএ ক্রম ৯৯% হবহু এক।

কিন্তু ৯৯% জিনোমক্রম হবহু মিলে গেলেও, মানুষের সাথে কিন্তু শিম্পাঞ্জি, গরিলা, বেবুন, ওরাংওটাং এদের ক্রোমোজোম সংখ্যার কিন্তু পার্থক্য আছে। মানুষের আছে ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম, আর এসব বানর প্রজাতির ক্রোমোজোম সংখ্যা ২৪ জোড়া।

এবার যাঁরা বিবর্তনে বিশ্বাস করেন না, তাঁরা হইহই

করে উঠবেন, বানরের বিবর্তনেই যদি মানুষের সৃষ্টি, তবে একজোড়া ক্রোমোজোম গেল কোথায়? এজন্য বলি বিবর্তন ভুয়ো।

সত্যিইতো! "পক্ষীরাজযদিহবে, তাহলেন্যাজনেইকেন?" কিন্তু এখানেই মজা বিবর্তনের আর আণবিক জীববিদ্যার। বিবর্তনের কোন এক বাঁকে মানুষের ক্ষেত্রে দুটো ক্রোমোজোম জুড়ে গিয়েছিল। আমাদের ২ নম্বর ক্রোমোজোমটি হল সেই জোড়া ক্রোমোজোম। এবার ইহা যে সত্য, তার প্রমাণ কি? প্রমাণ ছাড়া কি বিজ্ঞান হয়? হয়না! তাহলে দেখা যাক কি ভাবে এই জুড়ে যাবার প্রমাণ পাওয়া গেল।

ক্রোমোজোমের থাকে সেন্ট্রমিয়ার (Centromere) বলে একটি অংশ, যা কোষ বিভাজনের সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। আর ক্রোমোজোমের দুপ্রান্তে থাকে টুপির মত টেলোমিয়ার (Telomere) অংশ। এবার দুটি ক্রোমোজোম জুড়লে দুপ্রান্তের টোলোমিয়ার নিশ্চয় মাঝে দেখা যাবে, আর একটার জায়গায় দুটো সেন্ট্রোমিয়ার অঞ্চল। তাইতো?

আমাদের ক্রমোজোম ২ এ কিন্তু ঠিক তাই থাকে। ক্রোমোজোমের দুপ্রান্তের সাথে মাঝেও থাকে টেলোমিয়ার অঞ্চল, আর থাকে দুটি সেন্ট্রমিয়ার অঞ্চল। এই দুটির মধ্যে একটি অবশ্য নিষ্ক্রিয়। প্রদত্ত ছবিতে দেখুন, আরও স্পষ্ট হবে ব্যাপারটা।

তাহলে প্রমাণিত হল, মানুষের ক্ষেত্রে আদি বানরের দুটো ক্রোমোজোম জুড়ে গিয়েছিল বলে মানুষের ক্রোমোজোম এক জোড়া কম। আর এভাবেই আরেকবার প্রমাণ হল, শিম্পাঞ্জি বা অন্যান্য বানরেরা ও মানুষ একই আদিম বানর পূর্বপুরুষ থেকে বিবর্তিত হয়ে সৃষ্টি হয়েছে।

বিঃদ্রঃ- এসব বহুল প্রচারিত সাধারণ তথ্য। তাই আর নির্দিষ্ট কোন সূত্র দিলাম না। বিস্তারিত জানতে গুগলে "chimpamzee 24 chromosomes" বা "chromosome 2 mystry" search দিলেই অনেক নির্ভরযোগ্য সূত্র পাবেন।

সূচিপত্র

ফাঁকাতন্ত্র

লিখেছেন – মোশাররফ হোসেন মুসা



রাজতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, আমলাতন্ত্র ইত্যাদি নামে কয়েক প্রকার তন্ত্রের কথা আমরা জানি। এগুলোর পাশাপশি 'ফাঁকাতন্ত্র' নামে আরও একটি 'তন্ত্র' থাকা উচিত বলে মনে করি। রাজতন্ত্রে রাজার ইচ্ছা-অনিচ্ছায় জনগণের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয়। সামন্ততন্ত্র হলো ভূস্বামীদের তন্ত্র। ভূস্বামীদের স্বার্থরক্ষাসহ তাদের আচার-অনুষ্ঠানের ওপর ভিত্তি করে এ তন্ত্র পরিচালিত হয়। সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্রই সব। সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্রকে জনগণের অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার সুষম বণ্টনের একমাত্র বিধাতা হিসেবে গণ্য করা হয়। গণতন্ত্রের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে- জনগণকে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য করে যে শাষণ ব্যবস্থা পরিচালিত হয়, তাকেই গণতন্ত্র বলে। যে তন্ত্র আমলাদের ইচ্ছায় পরিচালিত হয় কিংবা তাদের রচিত বিধি- উপবিধি দ্বারা পরিচালিত হয় তাকে আমলাতন্ত্র বলে। পাশাপাশি ফাঁকাতন্ত্র সম্পর্কে বলা যায়-যে তন্ত্র ফাঁকা বিশ্বাসকে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য করে আবর্তিত হয় তাকে ফাঁকাতন্ত্র

বলে।

জর্জ বার্নাড শ বলেছেন– 'যাদের ঈশ্বর আকাশে থাকে, তাদের থেকে সাবধান থেকো'। আকাশ হলো ফাঁকা জায়গা।

মাদার তেরেসা বলেছেন– 'তুমি যদি দৃশ্যমান মানুষকে ভালোবাসতে না পারো, তবে অদৃশ্য ঈশ্বরকে কীভাবে ভালোবাসবে!'

সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, প্রায় ৫০০ কোটি বছর আগে পৃথিবীর সৃষ্টি হলেও মাত্র ২০ লাখ বছর আগে মনুষ্য জীবের জন্ম। তারা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের উপর ভিত্তি করে আরও বলে থাকেন– 'প্রচলিত ধর্মগুলোর অধিকাংশের উৎপত্তি ঘটেছে খ্রীষ্টপূর্ব ৩ হাজার থেকে ৩ হাজার ৫শ সালের মধ্যে। ঐশিবাণী প্রধান ধর্মগুলোর মধ্যে খ্রীষ্টধর্মের অনুসারীরা সর্বপ্রথম রাজনীতিকে ধর্মের অধীনস্থ করেন। ধর্মে উল্লেখ আছে, ঈশ্বরের নির্দেশ অমান্য করায় মনুষ্য জীবের আদি পিতা মাতাকে প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়। পৃথিবী হল পাপীদের স্থান। বিধায়, পাপীদের দ্বারা নির্বাচিত কোনও প্রতিনিধি কিংবা তাদের রচিত কোন মতবাদ মনুষ্য জীবকে শুদ্ধ করতে পারে না। শুদ্ধতম রাজনীতি–অর্থনীতি–সংস্কৃতি পেতে হলে প্রেরিত পুরুষ কিংবা তাঁদের নির্দেশিত নীতির অধীনে থাকতে হবে। শুরু হয় যাজকদের শাসন। রাজা গীর্জার অধীনে থেকে শাসন কার্য চালাতেন। উৎপত্তি ঘটে এক তরবারির তত্ত্বের।

বলা হয়, ঈশ্বর পরলোক ও ইহলোকের মুক্তির জন্য এক তরবারি দিয়ে যাজকদের প্রেরণ করেছেন। কিন্তু প্রগতির পিছনে থাকে সন্দেহ, অবিশ্বাস আর অস্বীকৃতির প্রবণতা। ফলে যাজকদের হাতে প্রগতিপন্থীরা নানাভাবে নিপীড়নের শিকার হতে থাকেন। এমন দুর্বিষহ অবস্থা থেকে মুক্তির উপায় খুঁজতে সৃষ্টি হয় রেঁনেসাসের (রেঁনেসার শাব্দিক অর্থ পুনর্জীবন কিংবা নবজাগরণ। এর সংজ্ঞায় বলা আছে – চৌদ্দ, পনের, ও ষোল শতকে ইউরোপ জুড়ে খ্রীষ্টপূর্ব গ্রীকের বিজ্ঞান, শিল্প–সাহিত্য ও চিত্রকলার উপর ভিত্তি করে যে জাগরণের

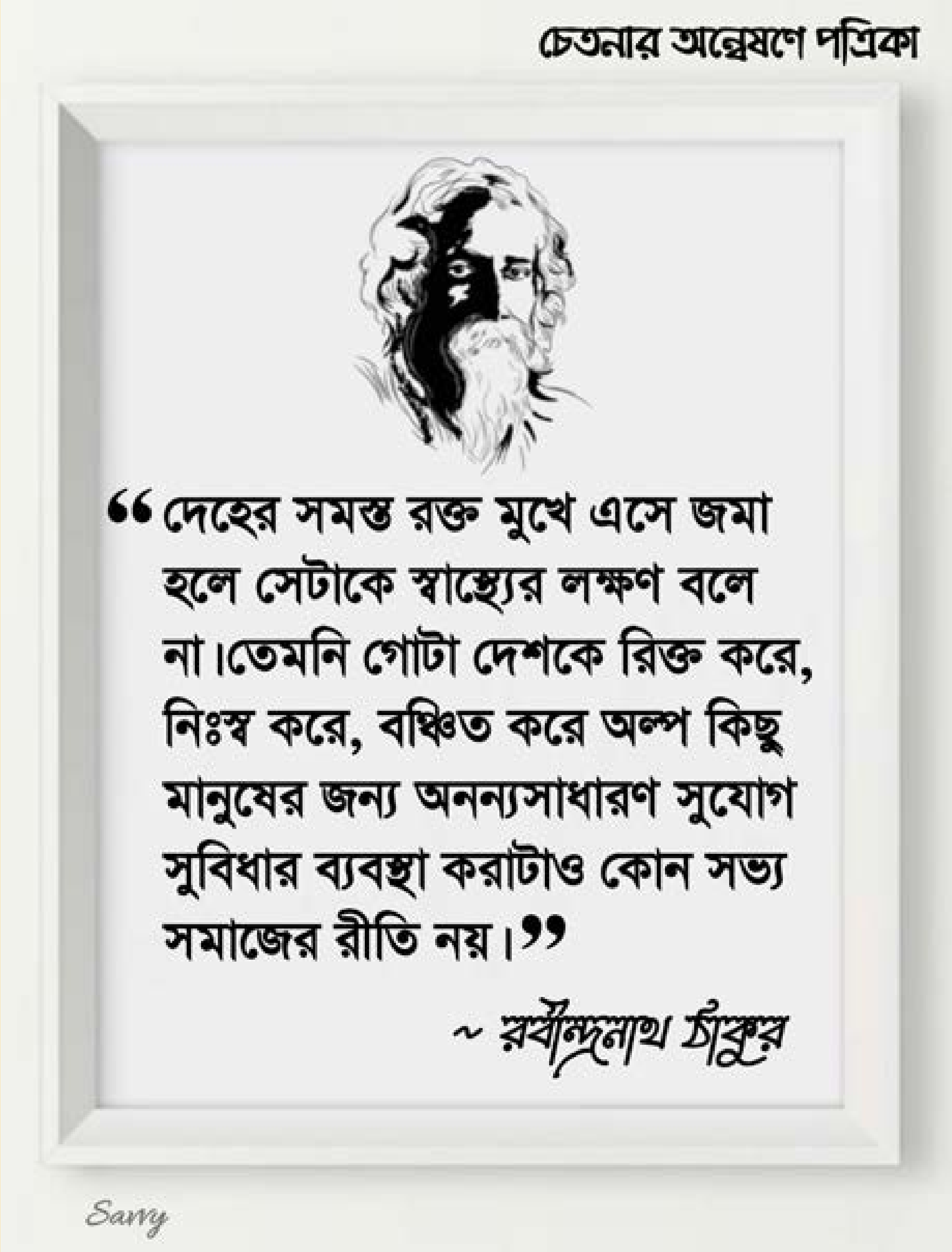
সৃষ্টি ঘটে তাই রেঁনেসা)। ফলে রাজনীতি থেকে ধর্মকে পৃথক করার বিষয়টি সামনে চলে আসে। কিন্তু বাস্তবে খ্রীষ্টপূর্ব জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে মধ্যযুগের ধর্মবাদের সমন্বয় ঘটতে দেখা যায়। সে সময় প্রতিবাদকারীরা (Protestant) বলা শুরু করেন- যাজকরা বাইবেলের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে ঈশ্বরকে উর্দ্ধাকাশে রেখে দিয়েছেন। আসলে ঈশ্বর রয়েছেন মনুষ্যলোকে। সকল সৃষ্টির মাঝেই ঈশ্বর বিরাজমান রয়েছে। ঈশ্বরকে পেতে হলে তার সৃষ্টির কল্যাণ করতে হবে। জনৈক মিশনারী প্রধান বলেছেন- 'আমি যখন এক জন দুস্থকে সেবা করি, তখন মনে হয় স্বয়ং ঈশ্বরকেই সেবা করছি'। তাঁরা ঈশ্বরপ্রাপ্তির আশায় এভাবে লক্ষ্য আর মাধ্যমের পরিবর্তন আনেন। সে সময় সৃষ্টি ঘটে দুই তরবারি তত্ত্বেরও। বলা হয় যাজকের কাজ হলো পারলৌকিক জীবনের মুক্তি খোঁজা এবং রাজনীতিবিদদের কাজ হলো ইহলৌকিক সমস্যার সমাধান বের করা। সে হিসাবে রেনেসাসের অর্থ হওয়া উচিত 'নবজাগরণ'।

তবে কিছু ধর্মের লোকেরা রেঁনেসাসকে অস্বীকার করে বলতে থাকেন- 'তাদের ধর্মে লক্ষ্য এবং লক্ষ্যে পৌছানোর পথ উভয়ই নির্দিষ্ট করা আছে। তারাই কেবল বিশুদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ ধর্মের অনুসারী। লক্ষ্য আর মাধ্যমের সামান্যতম সংস্কার বরদাস্ত করা হবে না'। এভাবে তারা বৃত্তাবদ্ধ চেতনা দ্বারা আক্রান্ত হয়ে অন্য ধর্মাবলম্বীদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার হুমকিও দিয়ে থাকে মাঝে মধ্যে। তাঁরা বিশ্বাসের আলোকে বাস্তবতাকে বলদাতে না পেরে যুগে যগে আহাজারী করে থাকে। তাঁরা ভুলে যান যে- 'পরিবর্তন' শব্দটি ছাড়া পৃথিবীর সব কিছুই পরিবর্তনশীল। মজার বিষয় হলো বিলম্বে হলেও তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলো গ্রহণ করে। তবে রেঁনেসার প্রসঙ্গ উঠলেই তাঁরা আগের মত বলে থাকেন- 'পার্থিব জগৎ ক্ষণস্থায়ী। পারলৌকিক জীবন দীর্ঘস্থায়ী। প্রকৃত ঈশ্বর বিশ্বাসীরা কখনও পার্থিব জগৎকে জয়ের চিন্তায় মশগুল থাকতে পারে না'।

অধ্যাপক রুহুল আমিন প্রামাণিক (বিশিষ্ট আধ্যাত্মবাদী

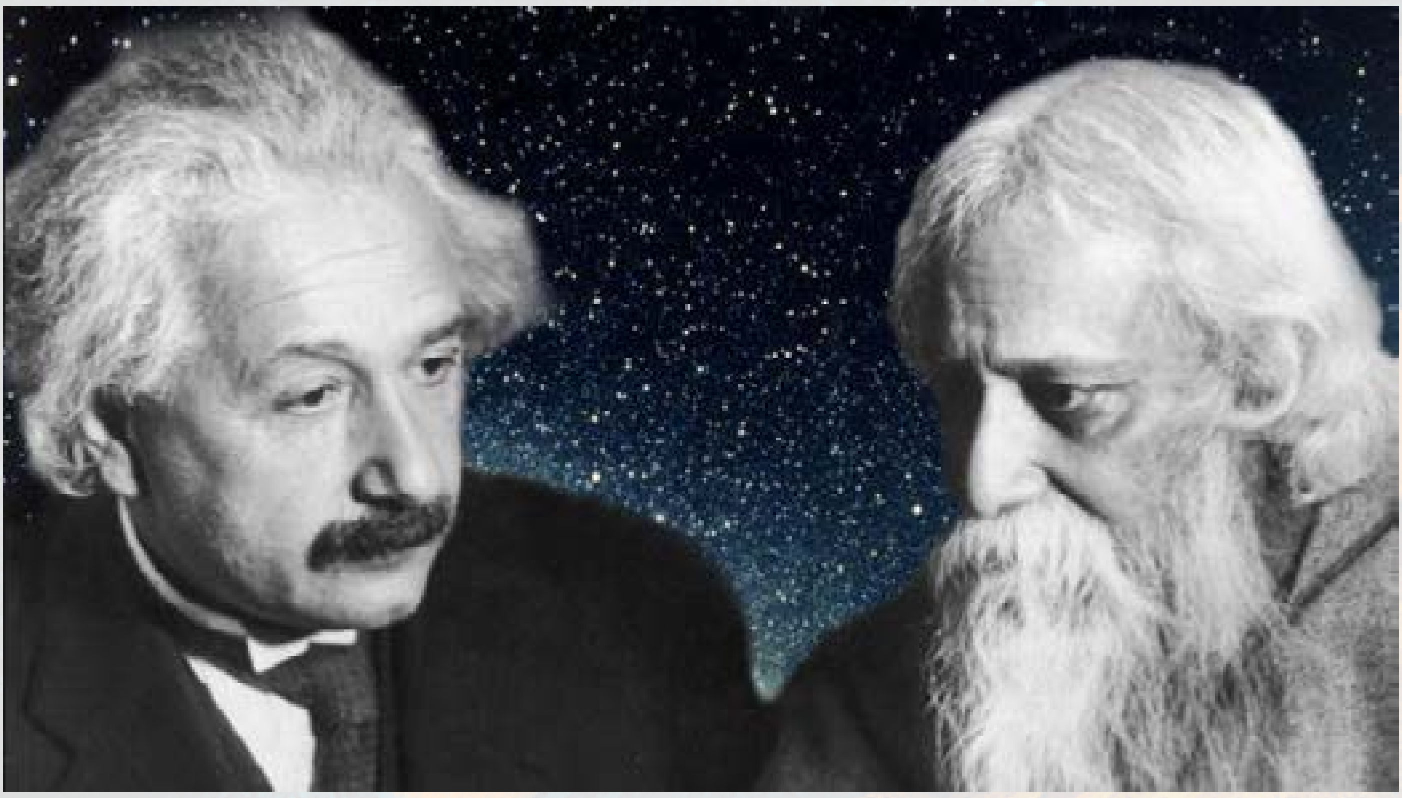
নেতা) এ প্রসঙ্গে বলেন-'মানুষ পৃথিবীতে ফাঁকা হাতে আসে এবং ফাঁকা হাতে চলে যায় বটে; কিন্তু পৃথিবীতে সে পূর্বসুরীর অর্জনকে ধারণ করে পরিপূর্ণ মানুষ হওয়ার চেষ্টা করে'।

লেখক: গণতন্ত্রায়ন ও গণতান্ত্রিক স্থানীয় সরকার বিষয়ক গবেষক। পাবনা, বাংলাদেশ।



রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান ভাবনা

লিখেছেন – পঞ্চানন মণ্ডল



রবীন্দ্রনাথের কাছে বিজ্ঞান ছিল সংস্কৃতিরই একটা অঙ্গ। বিজ্ঞানের মাঝে লুকিয়ে থাকা সাহিত্য সংস্কৃতিকে বারংবার চিনে নিতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তাই তাঁর জীবন দর্শনে বার বার প্রতিফলিত হয়েছে বিজ্ঞানমনস্কতা।

মাত্র সাড়ে বারো বছর বয়সে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ একটি অস্বাক্ষরিত বিজ্ঞানভিত্তিক প্রবন্ধ লেখেন– 'গ্রহগণ জীবের আবাসভূমি'। অনেকে বলেন যে, গ্রহগণ জীবের আবাসভূমিই রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত গদ্য রচনা। পরবর্তী জীবনে রবীন্দ্রনাথ অন্তত দু' জায়গায় সেই কিশোর বয়সে লেখা রচনাটির উল্লেখ করেছিলেন। এই লেখার অনেক অনেক বছর পর শেষ বয়সে এসে কবিগুরু একশ' পনেরো পৃষ্ঠার আরেকটি বিজ্ঞানভিত্তিক বই প্রকাশ করেন, 'বিশ্বপরিচয়'। শুধু তা-ই নয়, তিনি বইখানি উৎসর্গ করেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সময়কার কৃতি শিক্ষক ও ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আচার্য

সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে।

রবীন্দ্রনাথ তার উৎসর্গপত্রে লিখলেন—

'বয়স তখন হয়তো বারো হবে, পিতৃদেবের সঙ্গে গিয়েছিলুম ডালহৌসি পাহাড়ে। সমস্ত দিন ঝাঁপানে করে গিয়ে সন্ধ্যাবেলায় পৌঁছতুম ডাকবাংলোয়। তিনি চৌকি আনিয়ে আঙিনায় বসতেন। দেখতে দেখতে গিরিশৃঙ্গের বেড়া দেওয়া নিবিড় নীল আকাশের স্বচ্ছ অন্ধকারে তারাগুলি যেন কাছে নেমে আসত। তিনি আমাকে নক্ষত্র চিনিয়ে দিতেন, গ্রহ চিনিয়ে দিতেন। শুধু চিনিয়ে দেওয়া নয়, সূর্য থেকে তাদের কক্ষচক্রের দূরত্বমাত্রা, প্রদক্ষিণের সময় এবং অন্যান্য বিবরণ আমাকে শুনিয়ে যেতেন। তিনি যা বলে যেতেন তাই মনে করে তখনকার কাঁচা হাতে আমি একটা বড় প্রবন্ধ লিখেছিলুম। স্বাদ পেয়েছিলুম বলে লিখেছিলুম। জীবনে এই আমার প্রথম ধারাবাহিক রচনা, আর সেটা বৈজ্ঞানিক সংবাদ নিয়ে।'

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের নিবিড় সম্পর্ক ছিল। একজন মহাকবির সাথে এক মহাবিজ্ঞানীর দেখা হতেই হবে। যদিও বয়সের একটা বড় ব্যবধান ছিল। সেটা ১৯৩০ সাল। রবীন্দ্রনাথ ঊনসত্তর বছর পেরিয়ে সত্তরে পা দিয়েছেন। আইনস্টাইনের বয়স তখন বাহান্ন। রবীন্দ্রনাথের থেকে আইনস্টাইন ১৮ বছরের ছোট ছিলেন। ১৯৩০ সালেই রবীন্দ্রনাথ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে হিবার্ট বক্তৃতা দিতে গিয়ে 'সভ্যতার সংকট' পাঠ করেছিলেন। ১৯৩০ সালে কবি ইউরোপ, আমেরিকা, রাশিয়া ও পারস্যে তাঁর চিত্রকর্ম নিয়ে যান। বার্লিনে আইনস্টাইনের সঙ্গে দেখা হয়। দেখা হবার আগে রবীন্দ্রনাথ কি আইনস্টাইনকে জানতেন? জানতেন বৈকি।

১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল সংঘটিত হয় ইতিহাসের জঘন্যতম জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড। এই বর্বরতার প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ 'নাইট' উপাধি পরিত্যাগ করলেন।

১৩ এপ্রিল অমৃতসরের চারদিকে পাকা প্রাচীরের ভেতর

চলছিল একটি ব্রিটিশবিরোধী সভা। বের হবার পথ ছিল একটাই। হঠাৎ ব্রিটিশ সামরিক অফিসার জেনারেল ডায়ারের নেতৃত্বে একদল সৈন্য বেপরোয়া গুলি বর্ষণ করে। ১৬০০ রাউন্ড গুলি চালানোর পর গুলি ফুরিয়ে যায়। এই হত্যাকাণ্ড এমনি জঘন্য ছিল কতজন মারা গিয়েছিল তার চেয়ে দেখার ছিল কতজন বেঁচে ছিল। যাইহোক, গভর্নর জেনারেলের একজন এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সভ্য স্যার শঙ্করণ নায়ার বার্ষিক চৌষট্টি হাজার টাকার বেতনের চাকরিতে ইস্তফা দেন; কিন্তু 'নাইট' খেতাব বর্জন করেননি। অথচ পরবর্তী কংগ্রেস অধিবেশনে চাকরি ত্যাগ করার জন্য স্যার শঙ্করণ নায়ারকে শুভেচ্ছা জানিয়ে একটি প্রস্তাব পাস করা হলেও 'নাইট' ত্যাগ করার জন্যে রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করতে দেওয়া হয়নি। ১৯১৯ সালেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে নোবেলজয়ী সাহিত্যিক রোমাঁ রোলাঁ যখন মানুষের স্বাধীনতা বিষয়ক দলিল তৈরি করেছেন, সেই দলিলে স্বাক্ষরকারী মানুষদের মধ্যে দু'জন মানুষের নাম ছিল রবীন্দ্রনাথ ও আইনস্টাইন।



১৯০২, সালের ১০ মে বিশ্বনন্দিত বাঙালি বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু রয়্যাল ইনস্টিটিউটে 'যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক

তাড়নায় জড়পদার্থের সাড়া' বিষয়ক গবেষণাপত্র পাঠ করেছিলেন। তার দশদিন আগে ১ মে তারিখে রবীন্দ্রনাথকে লন্ডন থেকে জগদীশচন্দ্র লিখলেন –

'তুমি তো এতদিন নির্জ্জনে সাধনা করিয়াছ, বলিতে পার কী, কী করিলে সুখদুঃখের অতীত হইতে পারা যায়? একদিন ভারতে সুদিন আসবেই, কিন্তু একথা সর্বদা মনে থাকে না। ইহা যে সত্য একথা আমার মনে মুদ্রিত করিয়া দাও। একটা আশা না থাকিলে আমার শক্তি চলিয়া যায়।'

১০ মে বিলেতে পরীক্ষা দিয়েছিলেন জগদীশচন্দ্র। দু'দিন আগে ৮ মে তাঁর মানসিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় নিচের চিঠিতে –

'আমি যে কি কষ্টের ভেতর দিয়া যাইতেছি তুমি জানিবে না। তোমরা নিরাশ হইবে একথা মনে করিয়া আমি এখানে কিরূপ বাধা পাইতেছি তা জানাই নাই।... এই যে গত বৎসর মে মাসে যে আবিষ্কার সম্বন্ধে লিখিয়াছিলাম......। আমার সেই আবিষ্কার চুরি করিয়া ... নভেম্বর মাসে এক কাগজে বাহির করিয়াছে!'

আসলে লিনিয়ান সোসাইটির কাউন্সিল সভায় যখন ঠিক হয় যে জগদীশচন্দ্রের গবেষণাপত্রটি ছাপা হবে, তখন বিজ্ঞানী এর বন্ধু বিজ্ঞানীরা কাউন্সিল সভায় জানান যে, এমন কাজ নাকি একজন গত নভেম্বরে প্রকাশ করেছেন। এ কাজের আর কোন গুরুত্ব নেই। জগদীশচন্দ্রের গবেষণাপত্রটি তাই মুদ্রণের জন্য বিবেচিত হতে পারে না।

একসময় কথাটা জগদীশচন্দ্রের কানে যায়। জগদীশচন্দ্র সব জানিয়ে লিনিয়ান সোসাইটির সভাপতিকে চিঠি লেখেন। সভাপতি তাঁকে একসময় জানান, ভুল বুঝতে পেরেছেন ওঁরা।

তখনই জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন –

'.... ভাঙিয়া গেলে আর কি থাকে। এতদিন এদেশের বিজ্ঞানসভায় অনেক বিশ্বাস করিয়াছি_ তাহা দূর করিয়া লাভ কি? অধিক দিন থাকিতে পারিলে আমি একাই বৃহ্য ভেদ করিতাম_ কিন্তু আমার মন ভাঙিয়া গিয়াছে।'

১ মে জগদীশচন্দ্র লিখছেন, 'একটা আশা না থাকিলে আমার শক্তি চলিয়া যায়। ৮ মে লিখছেন, '... আমার মন ভাঙিয়া গিয়াছে।'

বিজ্ঞানীর এই মানসিক বিষণ্নতা অনুভব করে রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রকে বারবার অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। তাঁর প্রতিভা যে ব্যতিক্রমী, একথা কবি তাঁকে অনেকবার নানাভাবে বুঝিয়েছেন।

জগদীশচন্দ্র প্রত্যুত্তরে লিখছেন, 'তুমি কি মনে কর যে আমি এক কেষ্টবিষ্টু হইয়াছি। গলায় পাথর বান্ধিয়া জলে ফেলিলে ভাসিয়া উঠিব?' (৩০ মে, ১৯০২)।

রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগতভাবে চিঠি লিখে জগদীশচন্দ্রকে বারবার উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন। আর স্বদেশে তাঁর কাজের বিষয়ে, তাঁর সাহসী লড়াইয়ের বিষয়ে নিবন্ধ রচনা করা উপযুক্ত বিবেচনা করেছেন। সেই বিবেচনাবোধ থেকেই 'আচার্য জগদীশের জয়বার্তা' রচিত হয়েছে।

আইনস্টাইনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুখোমুখি পরিচয় হয় ১৯২৬ সালে। কবি তখন দ্বিতীয়বার জার্মানি গিয়েছেন। হিটলারের উত্থান তখনও স্পষ্ট হয়নি। কী আলোচনা হয়েছে দু'জনের সে সময়, কোন লেখাপত্র বা প্রমাণ পাওয়া যায়নি। রবীন্দ্রনাথ আইনস্টাইনের মনে যে শ্রদ্ধার রেখা টেনেছিলেন, ১৯২৬ সালে লেখা আইনস্টাইনের একটি চিঠি থেকে সে প্রমাণ পাওয়া যায়। চিঠির তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯২৬। ছোট্ট চিঠি, দু'একটি লাইন উল্লেখ করলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

মাননীয় আচার্য,

... আপনাকে স্বচক্ষে দেখে আসতে না পারার জন্য দুঃখিত। শুনেছি আপনার উপর প্রচুর ধকল গেছে। তাই ভিড় বাড়িয়ে আপনার বিশ্রাম এবং শান্তিতে ব্যাঘাত ঘটাতে চাইনি। জার্মানিতে যদি এমন কিছু থাকে যা আপনি চান এবং যা আমি করতে পারি, দয়া করে, যখন খুশি আমায় আদেশ করবেন।"

আইনস্টাইন ১৯২৬ সালে অপরিচিত কেউ নন। নোবেল জয় করেছেন পাঁচবছর আগে। রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর এমন

নিবেদন আমাদের অন্য একটি ঘটনার কথাও মনে করিয়ে দেয়। ১৯২৪ সালে সত্যেন্দ্রনাথের যে বিখ্যাত গবেষণাপত্র বেরিয়েছিল তাঁর জন্য আইনস্টাইনের ভূমিকা কী ছিল আমরা জানি। সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন অপরিচিত যুবক। তিনি আইনস্টাইনকে গভীর বিনয়ী চিঠি লিখতেই পারেন। আইনস্টাইনের লেখা রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে চিঠি আমাদের আইনস্টাইনের প্রতি শ্রদ্ধা বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। রবীন্দ্র প্রতিভার বিশ্বজনীনতাকে বুঝতে সহায়তা করে।

আইনস্টাইন ও রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকারের দিনটি ছিল ১৪ জুলাই, ১৯৩০। বিশ্বের বহু সংবাদপত্রে তার সবিস্তার বিবরণী বেরিয়েছিল। ‘প্রবাসী’ সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর সম্পাদিত ‘গোল্ডেন বুক অব টেগোর’-এ সেই বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এই বইয়ে আইনস্টাইন নিজে রবীন্দ্রনাথের ওপর একটি লেখাও দিয়েছিলেন। ১৪ জুলাই বিজ্ঞান ও দর্শনের নানা বিষয় নিয়ে দু’জনের কথাবার্তা হয়েছে। এমনকি আলোচনায় ঈশ্বর প্রসঙ্গও এসেছে। আইনস্টাইন তখন বার্লিন থেকে খানিকটা দূরে কাপুথ নামে একটা ছোট্ট শহরে থাকতেন। আইনস্টাইনের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ যান। দু’জনের বেশ খানিকটা সময় ধরেই কথা হয়। দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় তাঁর বইতে লিখেছেন-’কোথাও কি তাঁদের মিল ছিল না? অবশ্যই ছিল। দু’জনেই আদর্শবাদী ছিলেন। দু’জনেরই প্রবল বিশ্বাস ছিল ব্যক্তিমানুষের স্বাধীনতার অধিকার। দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সেই বিপন্ন সময়ে দু’জনেই বিশ্বশান্তির সপক্ষে কাজ করেছিলেন এবং সে-বিষয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন দীর্ঘকাল ধরে। আধুনিক রাষ্ট্রশক্তির প্রবল প্রতাপ সম্বন্ধে দুজনেই প্রতিকূল ছিলেন। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তার দিক দিয়ে তাঁদের মনে মিল ছিল।’

১৪ জুলাইয়ের পর ১৯৩০ সালে আরও তিনবার দু’জনের দেখা হয়। ১৯ আগস্ট বার্লিনে দেখা হয়। সেপ্টেম্বরের শেষে আবার বার্লিনে দেখা হয়। ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে নিউইয়র্কে দেখা হয়। দু’জন বড় মাপের মানুষ এক বছরে

চারবার পরস্পর মিলিত হচ্ছেন, হৃদমাঝারে কোন আত্মীয়তা না থাকলে তা কখনও সম্ভব হয়ে উঠতে পারে না।

ওই সময় ১৯ আগস্ট কোয়ান্টাম তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। একটু বিষয় বদলে যায়। আইনস্টাইন প্রথম ক'বছর কোয়ান্টাম তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন না। সে কথার ইঙ্গিত আমরা আগে রেখেছি। কথায় কথায় সঙ্গীত প্রসঙ্গ চলে এল। পুবের সঙ্গীত ও পশ্চিমের সঙ্গীত নিয়ে কথা হলো। রবীন্দ্রনাথ বললেন, পাশ্চাত্যে স্বরলিপি কঠোরভাবে মানতে হয়। ভারতীয় সঙ্গীতে স্বরলিপি থাকলেও শিল্পীদের স্বাধীনতা রয়েছে। ফলে সঙ্গীতকে 'শিল্প' করে তোলার সম্ভাবনা রয়েছে। আইনস্টাইন জানতে চেয়েছিলেন, ভারতীয় সঙ্গীতে বাণীর প্রাধান্য কেমন। রবীন্দ্রনাথ বললেন, উত্তর ভারতে কম, বাংলায় বেশি। কতটা বাদ্যযন্ত্র থাকে, জানতে চাইলেন আইনস্টাইন। রবীন্দ্রনাথের উত্তর ছিল, পশ্চিমি গানের 'হারমনি' তৈরির জন্য নয়। তাল ও মাত্রা ঠিক রাখার জন্য বাদ্যানুষঙ্গ ব্যবহৃত হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর অন্যতম মেধাবী ছাত্র ছিলেন প্রমথনাথ সেনগুপ্ত। বিজ্ঞানভিত্তিক লেখা 'বিশ্বপরিচয়' এর সাথে তাঁর নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ একবার প্রমথনাথকে বলেছিলেন – 'শান্তিনিকেতন ছেড়ে যেও না, এখানে তোমার প্রয়োজন আছে... যেদিন দেখবে এখানে তোমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে, শিক্ষার চেয়ে শাসনযন্ত্রটাই বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে, সেদিন তুমি চলে যেও।'

সহজ ভাষায় বিজ্ঞানের গ্রন্থ লিখতে বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। বলেছেন, 'এই পুণ্যকাজে আমার আশীর্বাদ রইল।' (আনন্দরূপম পৃষ্ঠা ১৬৩-৬৪)

এখানে আমাদের আলোচনার বিশেষ সুযোগ নেই। তবু মনে রাখতে হয়, শেষ জীবনে রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানকে তাঁর ভাবনার অন্যতম প্রধান উপজীব্য বিষয় করে তুলেছিলেন। আগেই বলেছি, ছিয়াত্তর বছর বয়সে 'বিশ্বপরিচয়'-এর পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেছেন তিনি। জীবন সায়াহ্নে তাঁর 'তিন

সঙ্গী' গল্পগ্রন্থ, যা 'রবিবার', 'শেষ কথা' ও 'ল্যাবরেটরি' নামের তিন বিখ্যাত ছোট গল্পের সংকলন, সেখানেও তিনি বিজ্ঞান চিন্তাকেই গল্প তিনটির মূল ভাবনা হিসাবে পেশ করেছেন। তিন গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্রেরা সকলে জীবিকাসূত্রে 'বিজ্ঞান' নির্বাচন করেছিলেন। গল্পের শেষে দেখা যায়, তারা সকলেই অন্ধ বিশ্বাস ও সংস্কারের জালে বাঁধা পড়ে আছেন। 'সমগ্র' বিজ্ঞানকে অনুভব করার কথা বলতেন তিনি। 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থে তথ্যের প্রাচুর্য থাকলেও এই ভাবনাকেই তিনি চূড়ান্ত রূপ দিতে চেয়েছেন। আমরা বলব, সার্থক হয়েছে তাঁর এই চাওয়া।

তাঁর বিজ্ঞানশিক্ষা বা বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাস যাই হোক, এটা সত্যি এক অভাবিত বিজ্ঞানবোধ তাঁর মনন ও কল্পনা উভয়কেই আচ্ছন্ন করেছিল। তার একটি উপাদান হলো এই বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা। খুব অল্পবয়সেই এই অস্তিত্বের বিশাল পরিসর সম্বন্ধে তার ধারণা ছিল, গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান বুঝে উদ্ভাসিত হয়ে 'আকাশভরা সূর্যতারা বিশ্বভরা প্রাণ' সম্বন্ধে তার একটি বোধ তৈরি হয়েছিল। এই বোধ তার কবিত্বকে সমৃদ্ধ করেছে, কারণ এর উৎস বিজ্ঞান হলেও এর মধ্যে জন্ম দিয়েছে এমন এক বিস্ময়, তাই বলেছিলেন –

'তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান, বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান ..

(বিভিন্ন পত্রপত্রিকা থেকে সংকলন করে লেখা)
(আমার কণ্ঠস্বর বা বাচনভঙ্গি কোনোটাই ভালো নয়। তবুও এই প্রথম লেখা পাঠ করলাম। ভুলত্রুটি নিজগুণে ক্ষমা করবেন।)
https://youtu.be/5UlYa2N2As4

বোঝা (cognition)

লিখেছেন – উল্লাসকর বন্দ্যোপাধ্যায়



প্রতিদিনের কাজকর্ম করতে গিয়ে সবসময়ই আমাদের বিভিন্ন বিষয় জেনে, বুঝে নিতে হয়। এখন যদি বিষয়টা একটু খতিয়ে দেখি আর এটা বুঝতে চেষ্টা করি যে আমরা কোনও বিষয় বুঝি কীকরে, তাহলে একটু গোড়ার বিষয় জেনে নিতে হবে।

প্রথমত: আমরা যা বুঝতে চাই সেগুলোর কোনও না কোনোভাবে বস্তুগত ভিত্তি আছে। অর্থাৎ সেটা হয় নিজে বস্তু না হলে বস্তুসহযোগে উৎপন্ন। যেমন গান, কবিতা, ছবি, অঙ্ক, ঘটনা, শক্তি, বল(force), মানুষ, সামাজিক অবস্থা, সাংস্কৃতিক মান, দেশ, কাল ইত্যাদি। সবই আসলে বস্তু সম্পৃক্ত। তাই বোঝার প্রথম শর্ত হলো বোঝার বিষয়ের বস্তুগত ভিত্তি থাকতে হবে। অবস্তু কিছু আমাদের বোঝার পরিসরে আসবে না, থাকবে না। এর অপর একটি কারণ অবস্তুভিত্তিক অস্তিত্ব হয় না। বিপরীতে যে কথাটা আসে তা হল আমাদের এই বিশ্বে এমন কিছু নেই তার বস্তুগত ভিত্তি নেই। তাই সম্পূর্ণ বিশ্ব

তত্ত্বগতভাবে মানুষের বোধগম্যতার পরিসরের মধ্যেই পড়ে। অর্থাৎ Universe is cognitive.

দ্বিতীয়ত: বিশ্বের সমস্তকিছুই আমাদের কাছে অস্তিত্ববান হয়ে ওঠে তার থেকে আসা স্পন্দনের মাধ্যমে। আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যখন আমরা এই স্পন্দন ধরতে পারি এবং মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা দিয়ে সেই স্পন্দন বিশ্লেষণ করতে পারি তখনই আমরা সেই বিষয়টাকে বুঝতে শুরু করি। তারপর সেই সম্পর্কে ততবেশি তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করতে পারি তত আমাদের বোঝা (cognition) গভীর স্তরে প্রবেশ করে। এইভাবেই আমরা সমস্তকিছু বুঝি। আরও কিছু কথা বলার আছে। যন্ত্র তেমন টেলিস্কোপ, মাইক্রোস্কোপ, স্টেথোস্কোপ এগুলো আসলে আমাদের ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা বাড়ানোর প্রযুক্তি নির্ভর প্রচেষ্টা। এমনকি যে স্পন্দন আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রহণ করতে পারে না সেটা ধরবার জন্য আমরা যন্ত্র বানিয়ে আমাদের ক্ষমতা বাড়িয়ে নিয়েছি। তেমন চৌম্বকত্ব,তড়িৎক্ষেত্র প্রভৃতি। একটা বিষয় আছে যেটা নিয়ে বলতে হবে সেটা হলো কল্পনা (imagination)। কল্পনায় আমাদের মনে অনেক কিছুই আস্তে পারে কিন্তু সেটা যতক্ষণ বস্তুভিত্তিক যুক্তিকাঠামো (objective logical structure) এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত না হচ্ছে ততক্ষণ তার মনে থাকলেও মগজ দিয়ে বোঝা যায় না। এ ছাড়াও বিমূর্ত গাণিতিক কাঠামো দিয়ে অনেক কিছুই আমরা ধরা বা বোঝার চেষ্টা করলেও সেই বিষয়টা অবস্তু কিছু নয়। তবে সেটাও সম্পূর্ণ রূপে বোঝা যায় পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ সিদ্ধান্তের পথ ধরে। মানুষের চিন্তা,কল্পনা সবকিছুই বস্তুর সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ায় উৎপন্ন হয়। সেই কল্পনা যুক্তিকাঠামোর সবগুলো শর্ত পূরণ করলে তবে বোঝার জায়গায় আসে। আশাকরি বোঝা গেল আমরা কোনোকিছু বুঝি কী করে।

দেশবন্ধুনগর, কলকাতা-৭০০০৫৯.

সঙ্ঘ পরিবারের আসল চেহারা

লিখেছেন – অভিষেক দে



অখণ্ড ভারত বা অখণ্ড হিন্দুরাষ্ট্র আদতে সম্পূর্ণ ভাঁওতা। আসল কথাটি হচ্ছে অখণ্ড ব্রাহ্মণরাষ্ট্র। এই ব্যপারে The All India BAMCEF নামক সংগঠনের সভাপতি Waman Chindhuji Meshram জানিয়েছেন, "হিন্দুরাষ্ট্র মানে শাস্ত্র অনুযায়ী ব্রাহ্মণদের সমস্ত জায়গায় আধিপত্য। তাই ব্রাহ্মণরা কখনওই 'ব্রাহ্মণরাষ্ট্র'এর দাবি করে না। একটু ঘুরিয়ে হিন্দু রাষ্ট্রের দাবি করে।"

যুগে-যুগে ব্রাহ্মণেরা প্রচার করেছে তারা সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বগুণসম্পন্ন। তারা সকল প্রকার দোষত্রুটির ঊর্ধ্বে। এক্ষেত্রে কিছু উদাহরণ দিলেই বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যাবে। যেমন, চাণক্য বলেছেন, ব্রাহ্মণ যে অপরাধই করুক না কেন তাকে হত্যা করা বা শারীরিক দণ্ড দেওয়া চলবে না (সূত্র-অর্থশাস্ত্র ৪/৮/৯)। রামকৃষ্ণ দেবের মতে, ব্রাহ্মণ হলেই সব দোষ মাফ (সূত্র-শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ভক্তসঙ্গে / ১৩ পরিচ্ছেদ, ১৮৮৪,১৯শে সেপ্টেম্বর)। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ছাড়া শূদ্র এবং শূদ্রের মত অন্যান্য মানুষদের বেদ পড়ার

কোনও অধিকার নেই (সূত্র- গীতা ১৮/৪১ এর শঙ্করভাষ্য)।

আজকের ব্রাহ্মণ রাষ্ট্র থুড়ি অখণ্ড হিন্দুরাষ্ট্রের দাবীদারদের চিন্তাধারা কেমন সেটা জানতে একটু তলিয়ে দেখতে হবে আমাদের। 'আরএসএস' বা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক-এর প্রতিষ্ঠা ১৯২৫ সালে। প্রতিষ্ঠাতা ড: হেডগেওয়ারের পরে এম. এস. গোলওয়ালকর আরএসএস-এর পরিচালক হন। গোলওয়ালকর ১৯৪০ সালে এই দায়িত্ব নেওয়ার পর ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত টানা ৩৩ বছর 'আরএসএস'-এর পরিচালক এর দায়িত্ব সামলেছিলেন।

১৯৩০-সালে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময় দেশবাসীকে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের তেরঙ্গা পতাকা বর্জনের আহ্বান জানিয়ে সত্যাগ্রহসহ ব্রিটিশ বিরোধী সমস্ত আন্দোলন থেকে দূরে থাকতে আহ্বান জানান কে. বি. হেডগেওয়ার। আরএসএসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নাথুরাম বিনায়ক গডসেকে 'খাঁটি' দেশপ্রেমিক বলা চলে। জীবনে কোনওদিন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ না নিলেও ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি গান্ধীজীকে হত্যা করে বিজেপির চোখে হিরো হয়ে যায়। এখন ভারতে হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রতীকে পরিণত হয়েছেন। তার নামে হচ্ছে পাঠাগার থেকে মন্দিরও।

'হিন্দুরাষ্ট্র' বই-এর লেখক এবং হিন্দুত্ব আইডিওলজির জনক বিনায়ক দামোদর সাভারকর। ইংরেজ সরকারের কাছে মুচলেকা দিয়ে (বিরোধীদের 'মুচলেকা ম্যান' আখ্যা পেয়েছেন) লেখেন যে তিনি আর কোনও দিনও ব্রিটিশ বিরোধী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেবেন না। দেশভক্তির কী আশ্চর্য নমুনা!

১৭ ডিসেম্বর, ১৯৬০ সাল। গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তব্য দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ পেলেন আরএসএস-এর দ্বিতীয় সঙ্ঘচালক এম. এস. গোলওয়ালকর। সেখানে তিনি বলেন-

"আজ ক্রস-ব্রিডিংয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা কেবল প্রাণীদের উপর করা হয়। কিন্তু মানুষের উপর এ জাতীয় পরীক্ষা করার সাহস আজকের তথাকথিত আধুনিক বিজ্ঞানীও দেখাননি।........ যে কোনও শ্রেণির বিবাহিত মহিলার প্রথম সন্তান অবশ্যই নাম্বুদিরি ব্রাহ্মণ দ্বারা জন্মগ্রহণ করা উচিত এবং তারপরে তিনি তার স্বামী দ্বারা সন্তানের জন্ম দিতে পারেন।"

পরবর্তী কালে 'আরএসএস'-এর মুখপাত্র 'অর্গানাইজার' পত্রিকাতে ১৯৬১ সালের ২ জানুয়ারী ৫ নম্বর পৃষ্ঠাতে এই খবরটি ছাপা হয়েছিল। উনি আরও বলেছিলেন, "হিন্দুরা ব্রিটিশদের সাথে লড়াই করে তোমাদের শক্তি খরচ না করে আসল শত্রু মুসলমান, খ্রিস্টান আর কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে লড়াই করো।"



এবারে বিজেপির কট্টর হিন্দুত্ববাদের মুখ যোগী আদিত্যনাথের কথা কিছু জানাই। উনি উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ২০১৭ সালের ১৯ মার্চ শপথ গ্রহণ করেন। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর (NCRB) তথ্যানুযায়ী যোগী আদিত্যনাথ মুখ্যমন্ত্রী হওয়া ইস্তক উত্তরপ্রদেশ দলিত ও নারী নির্যাতন চরমে যার উল্লেখ প্রথমে করেছি। এনার বক্তব্য ও আচরণ দেখলে মনেই হবে না ইনি কোনও অহিংসবাদী, শান্তসৌম্য যোগী, বরং উগ্রভাবাপন্ন, ফ্যাসিবাদী একজন ভোগী বলাই শ্রেয়। অনেকে ওনাকে উত্তর কোরিয়ার কিম উন জং-এর সাথেও তুলনা করেন। কারণ, যোগী

আদিত্যনাথ-এর আপন দেশে আইন কানুন বড়ই সর্বনেশে। ০১/১০/২০২০-আনন্দবাজার অনলাইন থেকে জানা যাচ্ছে, যোগী আদিত্যনাথের মুখ্যমন্ত্রীত্বের প্রথম দু'মাসে উত্তরপ্রদেশে ৮০৩টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। ২০১৭ সালের জুলাই। যোগী সরকারের বয়স তখন মাত্রই চার মাস। আগস্ট ২০২০ তে অগস্টে প্রকাশিত NCRB রিপোর্ট জানাচ্ছে, ২০১৯ সালে উত্তরপ্রদেশে মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের সংখ্যা ৫৯,৮৫৩। যা দেশের মধ্যে সর্বাধিক। এর মধ্যে ধর্ষণের মামলার সংখ্যাই ৩,০৬৫টি। অর্থাৎ গড়ে দৈনিক প্রায় ১১ জন মহিলা ধর্ষিতা হন ওই রাজ্যে। রিপোর্ট বলছে, এদের মধ্যে ৩৪ জনকে ধর্ষণের পর খুন করা হয়েছে। ২০১১ সালে, ডকুমেন্টারি ফিল্ম জাফরান যুদ্ধ - হিন্দু ধর্মের র‍্যাডিকালাইজেশন ও ঘৃণ্য বক্তৃতার মাধ্যমে উত্তরপ্রদেশে সাম্প্রদায়িক বিভেদ প্রচার করার জন্য আদিত্যনাথকে অভিযুক্ত করেছিল ("How Yogi Adityanath Made it to Where He Is" 'The Wire' 09/02/2019)।

বরাবরই বিতর্কের কেন্দ্রে থেকেছেন উত্তরপ্রদেশের গোরখপুরের গোরখনাথ মঠের মুখ্য পুরোহিত বা মোহন্ত যোগী আদিত্যনাথ। ছাত্রাবস্থা থেকেই এই যোগী ছিল জাতপাত ও বর্নভেদের ঘোর সমর্থক। সাথে চরমতম নারী ও মুসলিম বিদ্বেষী। মুসলিম নারী সম্পর্কে তার বিস্ফোরক মন্তব্য যা ২০১৪ সালে করেন — "কবর থেকে তুলে মুসলিম মেয়েদের ধর্ষন করা হবে।" এখনও পর্যন্ত যোগীর বিরুদ্ধে ৬২ টি দাঙ্গা বাঁধানোর অভিযোগ, ১৭ টি খুনের অভিযোগ (যার মধ্যে ৮ টি দলিত পরিবারকে খুন) রয়েছে (সূত্র- উত্তরপ্রদেশ প্রশাসনিক রিপোর্ট -- ০৩/০২/১৬, দ্য টেলিগ্রাফ পত্রিকা)। দলিতদের প্রতি আদিত্যের ভাবনা অতি ভয়ংকর। "দলিতরা দাস হয়েই জন্মেছে, তাই দাসত্ব করাই তাদের পবিত্র কর্তব্য" (সূত্র- ১৯৯৫/৮/৩ - টাইমস অফ ইন্ডিয়া, লক্ষ্ণৌ সম্মেলনের বক্তব্য)। দলিত নারী সম্পর্কে তার বক্তব্য- "দলিত নারী ধর্ষন করা পাপ নয়, কারণ তার শরীর অপবিত্র হলেও যোনি

অপবিত্র নয়”(২০০১/১/১৩, গোরক্ষনাথ মঠে বসে বলেন যা বর্তমান পত্রিকায় “সন্ন্যাসাশ্রম ও আদিত্যের মানব ভাবনা” শিরোনামে প্রকাশিত)। যোগীবাবুর অনুপ্রেরণা পেয়েই হয়তো ২০২০ সালে আমরা দেখেছি মণীষা বাল্মীকির ধর্ষণকান্ড এবং প্রমাণ লোপাট করতে রাতের অন্ধকারে ধর্ষিতার দেহ জ্বালিয়ে দেওয়ার ঘটনা।

রাজনীতিতে অংশ গ্রহন করা তথা নারী সংরক্ষন নিয়ে বিজেপি পশ্চিমি প্রভাবে নরম মনোভাব দেখাচ্ছে বলে রীতিমত খোলা চিঠি দিয়ে সাংসদ পদ আর দল থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন ২০১৫ সালে। তিনি সেই খোলা চিঠিতে লিখেছিলেন- “নারী আর পুরুষকে মোটেই সমান করে তৈরি করা হয়নি। মেয়েদের ঠাঁই হলো রান্না ঘরে, পুরুষদের দেখাশুনা করার জন্য।” ২০১০ সালে যখন মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষন বিল পাশ করার কথা ওঠে, তখন তিনি বলেন- “আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে (পড়ুন মনুসংহিতা) নারী স্বাধীনতার কথা বলা হয়নি, নিয়ন্ত্রনের কথা বলা হয়েছে। মেয়েদের সত্যি সত্যি স্বাধীনতার প্রয়োজন নেই। এতে ওরা স্বেচ্ছাচারী হয়ে সমাজ ধ্বংস করবে।”

বিজেপির এই অখণ্ড ভারত বা হিন্দুরাষ্ট্র (পড়ুন ব্রাহ্মণ রাষ্ট্র) গঠনের তীব্র ইচ্ছে যা উচ্চবর্ণের আদেশ মেনেই সেটি করবার মূল উদ্দ্যেশ্য পুরোপ্রদেশে মনুসংহিতার শাসন লাগু করা। এই মনুসংহিতা বা মনুস্মৃতিতে রয়েছে মোট ২,৭০০টি শ্লোক এবং ১২ টি অধ্যায় যা খুব মন দিয়ে পড়লেই বোঝা যায় এতে ছত্রে ছত্রে আছে নারী ও শুদ্রদের প্রতি নির্যাতন ও বিদ্বেষের স্পষ্ট সুর। ১৯২৭ সালের ২৫ ডিসেম্বর বাবাসাহেব ড. ভীমরাও আম্বেদকরের নেতৃত্বে ‘মনুস্মৃতি’ পুড়িয়ে দিয়ে প্রতিবাদ বিক্ষোভ দেখানোর ঘটনা যা প্রমাণ করে। বিজেপি, আরএসএস এর প্রিয় গোলওয়ালকর, সারভারকার, মোহন ভাগবত কিংবা যোগী আদিত্যনাথ এই মনুসংহিতার শাসনকেই প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর। এই হিন্দুধর্মীয় আইনি

শাসন গ্রন্থকে অস্ত্র করে ফের তারা সতীদাহপ্রথা, স্তনকর, বাল্যবিবাহ, নির্বিচারে দলিত হত্যা, নারীকে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে গৃহবন্দী রাখা, দেবদাসী প্রথা, বিধবাবিবাহ রোধ ইত্যাদি করে মধ্যযুগ ফিরিয়ে আনতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তাই তাদের ব্রাহ্মণরাষ্ট্র থুড়ি অখণ্ড হিন্দুরাষ্ট্র চাইই চাই।

হিন্দুধর্মে জাতপাত এর স্রষ্টা জৈবলি, উদ্দালক ও আরুণি এবং আরুণি শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য যাদের উত্তরসূরি সঙ্ঘ পরিবারের সদস্যরা হিন্দুধর্মের সবচেয়ে বড় হাস্যকর দিক হচ্ছে হিন্দুদের চারবর্ণে বিভক্ত করবার পরে এখন মোহন ভাগবত থেকে নরেন্দ্র মোদীর গলায় শোনা যাচ্ছে- 'সকল হিন্দু এক হও।' যদি এক হওয়াই লক্ষ্য ছিল তাহলে ভাগাভাগি কেন? পৃথিবীর অন্যান্য দেশে দাস-বিদ্রোহের আগুন জ্বলতে দেখেছি কিন্তু ভারতে জ্বলতে দেখিনি। এই মহান দেশে দাস-বিদ্রোহের আগুন জ্বলতে দেয়নি জন্মান্তরবাদের জলকামান। যে ধর্ম একশ্রেণীর মানুষকে শ্রেষ্ঠ আর একশ্রেণীকে অস্পৃশ্য, অচ্ছুৎ করে রাখে সে ধর্ম, ধর্ম নয় বরং ক্রীতদাস বানিয়ে রাখার ষড়যন্ত্র।

গণদাবী পত্রিকায় (৭০ বর্ষ ৩৬ সংখ্যা ২৭ এপ্রিল, ২০১৮) একটি গুরুত্বপূর্ণ খবর প্রকাশিত হয়েছে। "জোর করে ধর্মান্তরিত করার অভিযোগ বরাবরই বিজেপি করে থাকে। এবার যাতে সেই অভিযোগ তুলতে না পারে সে জন্য উক্ত দলিতরা স্বেচ্ছায় বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণের ফর্ম পূরণ করে জেলাশাসকের দপ্তরে জমা দিয়েছেন। স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন, দলিত অপমানের প্রতিবাদে এই ধর্ম পরিবর্তন। অর্থাৎ দলিতদের কাছে এই ধর্মান্তর আসলে প্রতিবাদ আন্দোলনের একটা রূপ।" এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো, বাবা সাহেব আম্বেদকর, ১৯৫৬ সালের ১৪ অক্টোবর নাগপুরে প্রায় পাঁচ লক্ষ নিম্নবর্গীয় বা দলিত মানুষকে সঙ্গে নিয়ে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে বৌদ্ধধর্মকে গ্রহণ করেছিলেন। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে অক্টোবর ২০২২ সালে উত্তরপ্রদেশের লখনৌতে

যেখানে ১৫ হাজার দলিত, আদিবাসী মানুষেরা, হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে বৌদ্ধ ধর্মকে গ্রহণ করেছে।

পরিশেষে, অখণ্ড হিন্দুরাষ্ট্র বা অখণ্ড ভারত কিংবা অখণ্ড ব্রাহ্মণ রাষ্ট্রের কট্টর সমর্থকদের উদ্দ্যেশ্যে কিছু কথা জানিয়ে লেখার ইতি টানবো।

কট্টর ইসলামিক দেশ হিসেবে চিহ্নিত 'সুদান' তাদের রাষ্ট্রধর্ম 'ইসলাম'কে ত্যাগ করে "ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র"তে পরিণত হচ্ছে। বাস্তব এটাই যে, আধুনিক পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রই কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই পরিণতিতে পৌঁছবে, আজ, কাল কিংবা পরশু। এটাই ভবিতব্য। একটি রাষ্ট্রের সংখ্যাগুরু জনগণের ধর্ম যা-ই হোক না কেন, আধুনিক পৃথিবী যেহেতু গণতন্ত্রের, ধর্মমুক্তির, যুক্তিবাদ, বিজ্ঞান, বিজ্ঞানমনষ্কতার। তাই কেউ যদি গায়ের অথবা গলার জোরে এসব অস্বীকার করে, তাহলে অস্তিত্ব-সংকট তারই। মোটেই গণতন্ত্র, ধর্মমুক্তি, বিজ্ঞানমনষ্কতা অথবা যুক্তিবাদের নয়। আমাদের প্রতিবেশী, ছোট্ট এবং গরিব দেশ নেপাল এই সত্য কথাগুলো অনেক আগেই বুঝেছিল বলেই বেশ কয়েক বছর আগে হিন্দুরাষ্ট্র (হ্যাঁ, পৃথিবীর একমাত্র হিন্দুরাষ্ট্র ছিল নেপাল) থেকে ধর্মনিরপেক্ষতায় আশ্রয় নিয়েছিল। ভারতকেও একদিন এই পথেই আসতে হবে। হবেই।

ধর্মমোহে আক্রান্তরা

লিখেছেন – তারক নাথ সাহা



পৃথিবীর কোনও প্রতিষ্ঠানিক ধর্মের (Religion) কোনও শিশুই ধর্মবিশ্বাস, ধর্মানুভূতি, ভাবাবেগে ইত্যাদি নিয়ে জন্ম নেয় না। এই জাতীয় অন্ধবিশ্বাস গড়ে তোলার জন্য দায়ী শিশুটির পরিবার, পড়িবেশ এবং সমাজের অতিবোদ্ধারা। একটা শিশু জানেই না জাতপাত কী, ধনী-গরিবের ভেদাভেদ কী, হিন্দু-মুসলিমের লড়াই কেন ইত্যাদি অনেক কিছু। ক্রমশ একটি শিশু যত বড় হতে থাকে ততই শিশুর মস্তিষ্কে নানানরকম বিষয় জমা হতে থাকে। এভাবেই জন্ম নেয় তথাকথিত ধর্মবিশ্বাস। যা আজকাল যখন-তখন যার তার আঘাত লাগে এবং তারজন্যে খুন পর্যন্ত করতেও দুবার ভাবে না উগ্রধর্মান্ধ বা ধর্মমোহে আক্রান্তরা।

এই প্রসঙ্গে জেনে রাখা উচিৎ, ১৮৫৬ সালের ২৬ শে জুলাই বিধবা-বিবাহ আইন পাশ হওয়ার অনেক আগে থেকেই বিদ্যাসাগরের ওপর আক্রমণ চালাচ্ছিল সমাজের উচ্চবর্ণের রক্ষণশীলরা। যদিও তারা সহজে নিজেরা কিছু করে না বরং অন্ধভক্তদের মগজধোলাই করে উগ্র-ধর্মান্ধ বানিয়ে তোলে। বিধবা-বিবাহের পক্ষে সই করেছিল ৯৮৭ জন এবং বিপক্ষে সই ছিল ৩৬,৭৬৩ জনের। তারপরেও বিধবা-বিবাহ আইন

প্রণয়ণ হয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠদের মতামত-ই যে শেষ কথা হতে পারে না এই ঘটনাটি একদিকে যেমন তার বড় উদাহরণ। তেমনই উদাহরণ বিশাল সংখ্যক মানুষের তথাকথিত ধর্মবিশ্বাসে আঘাত হেনেই বিদ্যাসাগর সফল হয়েছিলেন। এভাবেই সফল হয়েছিলেন রামমোহন রায়ও সতীদাহপ্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে।

তাই নির্দিধায় বলা চলে মানবসভ্যতার অগ্রগমন যেহেতু অনিবার্য তাই তথাকথিত ধর্মবিশ্বাসে আঘাত না হানলে আমজনতা চিরকালই ভাববাদ ও ভোগবাদে ডুবে থাকবে। আর যারা সারাজীবন ভজন-পূজন নিয়েই থাকে তারা কোনোদিন শোষণমুক্তির কথা কল্পনাতেও আনবে না।

রাজা রামমোহন রায়

লিখেছেন - রাজু দত্ত



ড. বিপান চন্দ্র বলেছেন, “Rammohan Roy was the brightest star in the Indian sky dring the first half of the 19th century.” (মডার্ণ ইন্ডিয়া, পৃষ্ঠা – ১২৮)

সত্যিই তাই, বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী, ভারতের নবজাগরণের অগ্রদূত রাজা রামমোহন রায় ছিলেন উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ভারতের আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। এটা ঠিক যে তিনি ধর্মীয় প্রভাব মুক্ত চেতনার অধিকারী নন, কিন্তু তিনিই প্রথম ভারতীয়, যিনি নির্ভয় ধর্মীয় কুসংস্কার, পৌত্তলিকতা, আচার-অনুষ্ঠান সর্বস্বতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। ভাবজগতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিলেন। তাঁর কাজেও সেই ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে।

কে জানত সম্ভ্রান্ত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ রামকান্ত রায়ের মধ্যম

পত্নী তারিণীর কণিষ্ঠ পুত্রটি ভারতের নবজাগরণের অগ্রদূত হয়ে উঠবেন! পূর্বপুরুষ কৃষ্ণকান্ত ছিলেন রাজকর্মচারী। সেই সূত্রে তাঁদের পদবী রায় হয়। পনেরো-ষোলো বছর বয়সে তিনি গৃহত্যাগ করেন। তাঁর এই গৃহত্যাগের পিছনে ছিল নিষ্ঠাবান পিতার সাথে ধর্মীয় রক্ষণশীলতার দ্বন্দ্ব।

তিনি নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার নামে জনৈক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের কাছে সংস্কৃত শেখেন। এছাড়া তিনি ইংরেজি, গ্রীক, ফরাসি, আরবি, হিব্রু প্রভৃতি ভাষাতেও ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জন ডিগবির সাথে পরিচিতির সুবাদে তিনি দেওয়ান পদে কর্মরত হন। কর্মসূত্রে তিনি বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। সেখান থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। ইংরেজি ভাষায়ও বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলকাতায় চলে আসেন। এইবার শুরু হল তাঁর প্রকৃত লড়াই।

কলকাতার প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর, রাজচন্দ্র দাস, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রমুখের সাথে ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে রামমোহনের। এইসকল ব্যক্তিদের নিয়ে গড়ে তোলেন আত্মীয় সভা (১৮১৫)। একেশ্বরবাদের প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্মসভা গড়ে তুললেন, যা দুবছর পর ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজ নামে পরিচিত হয়। ব্রাহ্ম সমাজ যে ধর্মমতে বিশ্বাস করতে শুরু করে তা হল ব্রাহ্ম ধর্ম। নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করেন ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বীরা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সকল ধর্মাবলম্বী মানুষের জন্য ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণের সুযোগ ছিল। একেশ্বরবাদী ভাবধারা প্রসারে তিনি ফরাসি ভাষায় লেখেন তুয়াফৎ উল মুয়াহিদ্দিন গ্রন্থটি। এছাড়া ঈশ, কঠ,কেন, মন্ডুক,ও মান্ডুক্য নামক উপনিষদের অংশ বঙ্গানুবাদ করেন। প্রতিষ্ঠা করেন বেদান্ত কলেজ।

ছেলেবেলায় দাদার মৃত্যুর পর মাতৃসমা প্রিয় বৌদিদির সহমরণে ব্যথিত রামমোহন প্রতিজ্ঞা করেন যে সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে তিনি লড়বেন। এই প্রথা তিনি বন্ধ করবেনই। তিনি সাধ্যমত বল ও যুক্তিপূর্ণ তর্ক দ্বারা সহমরণে বাধা দিতে থাকেন।

সহমরণের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে তিনি 'প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। রক্ষণশীল সমাজ পাল্টা 'বিধায়ক ও নিষেধকের সম্বাদ' রচনা করলে রামমোহন এই বিষয় আরও দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। এরপর তিনি দ্বারকানাথ-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি স্মারকলিপি বড়োলাটের নিকট পেশ করেন। পাল্টা রক্ষণশীল সমাজ সহস্রাধিক ব্যক্তির স্বাক্ষর সম্বলিত একটি প্রতিবাদ পত্র পেশ করে। অবশেষে তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেটিঙ্ক ১৭ নম্বর রেগুলেশন দ্বারা সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। রামমোহনের জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি লেখা হয় ইতিহাসে। ছেলেবেলার প্রতিজ্ঞা পূরণ করলেন তিনি।

রামমোহন গৌড়ীয় ব্যাকরণ, বেদান্তগ্রন্থের মত বেশকিছু গ্রন্থ রচনা করেন। বাংলায় 'সম্বাদ কৌমুদী' ও ফরাসি ভাষায় ' মীরাৎ-উল-আকবর ' নামে দুটি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার স্বপক্ষে তিনি আন্দোলন গড়ে তোলেন। শুধু তাই নয়, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য, দেশীয় পণ্যের ওপর অধিক পরিমাণে শুল্ক আরওপ, মজুরি আইন, বিচার বিভাগীয় দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। ইংরেজ শাসনের সময়েও তিনি ইংরেজ রাজকর্মচারীদের অসদাচরণের প্রতিবাদ জানাতে কখনও দ্বিধা করেননি।

রাজা রামমোহন রায় ছিলেন পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান ও ইংরেজি

ভাষায় শিক্ষার সমর্থক। ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে লর্ড আর্মহার্স্টকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি এ দেশে গণিত, প্রকৃতিবিজ্ঞান, রসায়ন ও পাশ্চাত্য দর্শন শেখানোর দাবি জানান। জেনারেল অ্যাসেম্বলি ইনস্টিটিউশন (স্কটিশ চার্চ কলেজ) হেয়ার স্কুল-সহ বেশকিছু ইংরেজিমাধ্যম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠায় তাঁর পরোক্ষ সহযোগিতা ছিল। বেদান্ত কলেজের পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত ছিল পদার্থবিদ্যা ও সমাজবিজ্ঞান।

রাজা রামমোহন রায়ের মূল্যায়ন করতে গিয়ে কোনও কোনও ঐতিহাসিক তাঁর সীমাবদ্ধতার উল্লেখ করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে স্ব-বিরোধিতার অভিযোগ এনেছেন। তাদের সেই মূল্যায়ন সম্পূর্ণ অযৌক্তিক নয়, তবে সেসবের খুব সামান্যই গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে।

রাজা রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলেছিল ব্রাহ্মসমাজ। নারীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা রক্ষার আন্দোলন, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ রদ, অসবর্ণ বিবাহ প্রচলনের আন্দোলনের পথ প্রদর্শক ছিলেন তিনি। এদেশে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা ও ইংরেজি শিক্ষার সূচনা তারই ঐকান্তিক উদ্যোগের ফল।

"Rammohan Roy inaugurated the modern age in India" রবীন্দ্রনাথের উক্তিটি যথার্থ।

মুক্তি

লিখেছেন-প্রদীপ চক্রবর্তী



সেদিনটা ছিল ২১ শে ফেব্রুয়ারী ২০২৩। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। হোয়াটস এপ্প – এ বার্তা পাঠালাম আজকের যুক্তিবাদী সমিতির এক অন্যতম কর্মকর্তা সন্তোষ শর্মাকে। "প্রবীরদা কেমন আছেন এখন? ওনার সঙ্গে দেখা করা যেতে পারে?" বিকেল ৩ তে বেজে ৪৫ মিনিটে বার্তাটা দেখেই ফোন করলো সন্তোষ। আমাকে জানালো প্রবীরদার শরীরের অবস্থা ভালো নয়, তবু আমি যদি ওনাকে মতিঝিলের ফ্ল্যাটে দেখতে যাই, কোনও অসুবিধা হবে না। না, আমার আর যাওয়া হয়নি। এই আফসোস আমার সারা জীবন থেকে যাবে। প্রবীরদার ৭২/৮ দেবীনিবাস রোডের ফ্ল্যাটে শেষবারের মতন গেছি; সস্ত্রীক, ২০০৫ সালে। প্রবীরদার সঙ্গে পরিচয় ১৯৮৭ সালে। আমার কলেজের এক দাদা (বিশিষ্ট ম্যাজিসিয়ান তন্ময় অধিকারী) আমাকে প্রথম প্রবীরদার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। প্রথম দর্শনেই ওনার 'দর্শন' আমার ভালো লেগে গিয়েছিল।

যুক্তিবাদী দর্শন, শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার দর্শন। সেই স্বপ্ন বুকে নিয়ে আমিও ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম যুক্তিবাদী আন্দোলনে। দেবীনিবাস রোড, শশিভূষণ দে স্ট্রিট, ক্রিক রো প্রভৃতি স্থানের বিভিন্ন সময়ের আড্ডায় নিয়মিত অংশ নিতাম আমি। যুক্তিবাদীদের আড্ডা,আমার কাছে এক অত্যন্ত আকর্ষণীয় বিষয় ছিল। প্রবীরদার কাছ থেকেই সংবাদপত্রে চিঠিপত্র লেখার হাতেখড়ি আমার। একসময় যুক্তিবাদী আন্দোলন, যুক্তিবাদী সমিতির কর্মপদ্ধতি নিয়ে বহু চিঠি, প্রবন্ধ লিখেছি আমি বাংলা সংবাদপত্রের পাতায়। প্রবীরদা প্রত্যেকটি লেখা মন দিয়ে পড়তেন এবং উৎসাহ যোগাতেন। আশির দশকের শেষাশেষি এবং নব্বইয়ের দশকে যুক্তিবাদী আন্দোলন এক বিশেষ মাত্রা পেয়েছিল। যুক্তির ঢেউ আছড়ে পড়েছিল বাংলার শহর থেকে গ্রামে,ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে।

সেই সময় বাংলার বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের এক বড়ো অংশ যুক্তিবাদী সমিতির ডাকে সাড়া দিয়ে, প্রবীর ঘোষের হাত শক্ত করতে এগিয়ে এসেছিলেন। ড:আবিরলাল মুখোপাধ্যায়, ড: বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়, ড: শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় (অভিনেতা), ড: পবিত্র সরকার, ড: বিরল মল্লিক, বিক্রমণ নায়ার (সাংবাদিক), আজিজুল হক (রাজনীতিক), নারায়ণ সান্যাল (লেখক), পাঁচু রায় (বিজ্ঞানী), কৃষ্ণা বসু (কবি) প্রমুখ। গুণীজনদের এই নামের তালিকা লিখে শেষ করা যাবে না। প্রবীরদা একজন বড়ো নেতা, একজন দক্ষ সংগঠক এবং অসম সাহসী মানুষ। এই তিনটি গুণ-ই ওনাকে সমাজচালকের আসনে বসিয়েছিল। সম্মুখে দাঁড়িয়ে কিভাবে একটি দলকে নেতৃত্ব দিতে হয়, তা তিনি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। সমাজপরিবর্তনের যে কোনও আন্দোলনই অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ, যেকোনও মুহূর্তেই অঘটন ঘটে যেতে পারে। যুক্তিবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রেও হয়েছিল তাই। সমিতির মধ্যে থেকে সমিতিকে পিছন থেকে ছুরি মারার উদ্যোগ চলছিল। যুক্তিবাদী সমিতির জনপ্রিয়তা যতই বাড়ছিল, সেই সঙ্গে গুণোত্তর প্রগতিতে বাড়ছিল শত্রুর সংখ্যা। জ্যোতিষী, ভন্ড গুরুবাবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করাটা যত না শক্ত, তার থেকে বেশি কঠিন মেকি যুক্তিবাদীদের

সঙ্গে লড়াই করা। ষড়যন্ত্র করে যুক্তিবাদী সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সাধারণ সম্পাদককে-ই সমিতি থেকে বহিস্কার করা হয়েছিল। সমিতির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলতাম, কিন্তু ঘুণাক্ষরেও জানতে পারিনি এই বিরাট ষড়যন্ত্রের কথা। পরের দিন সকালের সংবাদপত্র দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে ফোন করেছিলাম প্রবীরদার বাড়ির ল্যান্ড লাইন-এ। ফোন ধরেছিলেন সীমা বৌদি। আজ-ও স্পষ্ট মনে আছে, বৌদি ফোন ধরে হতাশামিশ্রিত ক্ষোভের সঙ্গে বলে উঠেছিলেন, কী হলো কিছুই বুঝতে পারছিনা। বুঝতে আমিও পারিনি তখন, যে, এটা একটা ষড়যন্ত্র। কারণ যাঁরা তখন সমিতির সম্পাদকমণ্ডলী, তথা পরিচালকমণ্ডলীতে ছিলেন, তাঁরা সকলেই আমার খুব ঘনিষ্ঠ। যাইহোক, বিতর্ক থেকে দূরে থাকতে কিছুদিনের জন্য সমিতি থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছিলাম।

জানতাম, প্রবীরদা একদিন সসম্মানে ফিরে আসবেন। প্রবীরদা কিভাবে স্বমহিমায় ফিরে এসেছিলেন, এ'তো সকলেরই জানা। ষড়যন্ত্রকারীদের অপযুক্তি ধোপে টিকলো না, নিজেদের পায়ে কুড়ুল মেরে আজ তাঁরা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন। মনে পড়ে একদিনের কথা, রবিবারের সকাল, প্রবীরদার সঙ্গে গেলাম বিশিষ্ট লেখক ও সাংবাদিক ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সল্টলেকের বাড়িতে। প্রবীরদা ওনার লেখা 'বিশ্ব ক্যুইজ' -এর একটি কপি সম্মানস্বরূপ দিলেন পার্থবাবুকে। প্রবীরদার সঙ্গে অনেক জ্যোতিষীর ভান্ডাফোঁড় করতে অনেক জায়গাতেই গিয়েছি, যে অভিজ্ঞতা জীবনে ভোলার নয়। বালক ব্রহ্মচারীর 'নির্বিকল্প সমাধি' নামক বুজরুকির ভান্ডাফোর করতে, যুক্তিবাদী সমিতির প্রতিনিধি করে সুখচর আশ্রমে আমাকে পাঠিয়েছিলেন প্রবীরদা। এটা সমিতির তৎকালীন নেতৃবৃন্দের কারো কারো পছন্দ হয়নি। কিন্তু আমার উপর উনি ভরসা করেছিলেন।

সুখচর সম্মিলনী ক্লাবের সামনে প্রবীরদার নেতৃত্বে এক

প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেছিল ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি। এই প্রতিবাদসভার তীব্রতা জনমানসে বিশাল প্রভাব ফেলেছিল। কিছুদিনের মধ্যেই তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে বালক কিস্সার পরিসমাপ্তি ঘটে। যুক্তিবাদীদের এক বড়ো জয় হয়েছিল সেদিন। আমার অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশিত হয়েছিল 'যুক্তিবাদী' পত্রিকায়, পরে প্রবীরদার উদ্যোগে আমার লেখাটি একটি প্রবন্ধ সংকলনেও স্থান পায় (দে'জ পাবলিশিং)। আজ এই মুহূর্তে প্রবীরদা সম্পর্কে বহু কথাই মনে পড়ছে। ভাবছি কোনটা ছেড়ে কোনটা বলি। কলকাতা বইমেলায় তাঁর জীবনমুখী ভূমিকা দেখেছি। সাধারণ মানুষকে লিটল ম্যাগাজিনের ছোট্ট একটা স্টলে কিভাবে আকর্ষণ করে নিয়ে আসতে হয়, তা প্রবীরদার থেকে আর কেউ ভালো জানেন বলে মনে হয় না। বইমেলায় যুক্তিবাদী সমিতি ছিল অনেকের কাছেই এক পরম আকর্ষণের বস্তু। আর যুক্তিবাদী সমিতির কাছে প্রবীরদা ছিলেন এক অভিভাবক, যাঁকে কেন্দ্র করে সারা দেশে যুক্তিবাদী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছিল। আমি ব্যাক্তিগতভাবেও ওনার কাছে অনেকভাবে উপকৃত হয়েছি। অনেক ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধান অক্লেশে করে দিয়েছেন উনি। আজ ভারাক্রান্ত মনে সেই দিনগুলোর কথা বার বার মনে পড়ছে। প্রবীর ঘোষরা নেতৃত্ব দিতেই জন্মান, আবার যাবার সময় নেতৃত্ব তৈরী করে দিতেও জানেন। এক প্রবীর চলে গেছেন;আক্ষরিক অর্থেই। কিন্তু অনেক প্রবীর তৈরী করে দিয়ে গেছেন তিনি। তাঁর যুক্তিপূর্ণ চোখ দিয়ে এই সমাজ আলো দেখবে, তাঁর দান করা অমূল্য দেহটা দিয়ে অনেক ভাবি চিকিৎসক গবেষণা করবেন, একজন মানুষের সাফল্যের পরাকাষ্ঠা তো এটাই। প্রবীর ঘোষ নিজেই একটা প্রতিষ্ঠান, সেই প্রতিষ্ঠানের মশাল তিনি সঠিক এবং যোগ্য তরুণ প্রজন্মের হাতে দিয়ে গিয়েছেন, এটাই বড়ো আশার কথা।

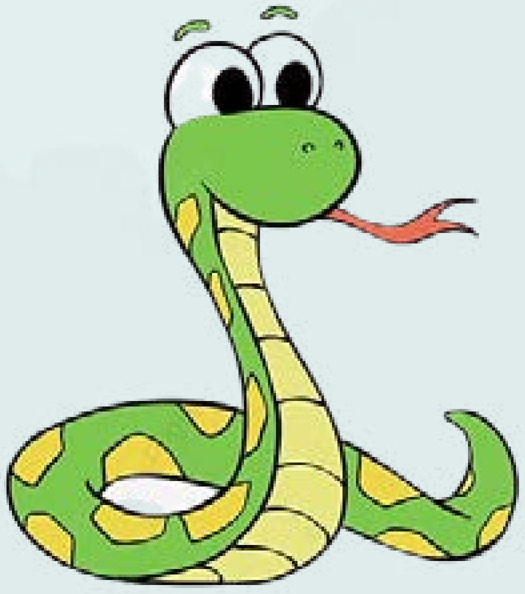
যাবার বেলায়, বিদায় বলতে নেই,
আমি আছি তোমাদের সঙ্গেই ------।

আমার দেহ টা রইলো এই সবুজ গ্রহেই,
আমার চোখ দিয়ে দেখো গোটা দুনিয়াটা--।
প্রানভরে দেখো, আর অনুভব করো,---
ওই উঠেছে স্লোগান,
সমাজের নিচতলা থেকে।
যুক্তির শানিত বাণে খান খান করে দাও
অজ্ঞতার বেড়াজাল ---------।
বেড়াজালের ওপারেই আছে মুক্তি,অজ্ঞানতা
থেকে মুক্তি।
প্রাণহীন অবয়বে কোরোনাকো ভক্তি,
কারণ;
যুক্তিতেই আছে মুক্তি, কুসংস্কার থেকে
মুক্তি।

মনোরা পিক, নৈনিতাল (উত্তরাখন্ড)

বিষধর সাপে কাটা রুগী ওঝার বাড়ি থেকে সুস্থ হয়ে ফেরে কীভাবে?

লিখেছেন – অদিতি প্রকৃতি কন্যা



(প্রথমে বলি আমি ঠিক করে গুছিয়ে লিখতে পারি না তাই সহজ সরল ভাবে বলছি সবার বোঝার সুবিধার্থে! ভুল ত্রুটি হলে একদম ক্ষমা করবেন না! বলবেন আমি ঠিক করে নেবো যদি সঠিক প্রমান ও যুক্তি থাকে।)

আগে আমরা জেনে নিই মারণ মাত্রা বা লিথাল ডোজ কী? বিষের তীব্রতা মাপার মাপকাঠি হল median lethal dose বা LD50। এক্ষেত্রে যে সংখ্যক প্রাণীর উপর বিষ পরীক্ষা করা হচ্ছে, তাদের পপুলেশনের 50% প্রাণী মরতে কতটা বিষ প্রয়োজন তা হলো LD50! এই LD50 যে সাপের যত কম,তার বিষের তীব্রতাও তত বেশি!

প্রত্যেক সাপের লিথাল ডোজ বা বিষের মারণ মাত্রা আলাদা আলাদা হয়!।

এই LD50 মাপা হয় চাররকম প্রদ্ধতিতে:

1. Subcutaneous (SC): বিষ চামড়ার নিচের চর্বি যুক্ত

অংশে প্রবেশ করিয়ে।

2. Intravenous (IV): বিষ সরাসরি শিরায় প্রবেশ করিয়ে।

3. Intramuscular (IM): বিষ কোন মাংস পেশী তে প্রবেশ করিয়ে।

4. Intraperitoneal (IP): বিষ পেটে (abdominal cavity) প্রবেশ করিয়ে।

এর মধ্যে সর্বাধিক পরীক্ষিত প্রদ্ধতি হলো Intravenous ও subcutaneous।

subcuteneous পদ্ধতিটি সব থেকে বেশি নির্ভরযোগ্য এবং এই পদ্ধতিতে মেপেই বিষের তীব্রতা সম্পর্কে সব থেকে বেশি তথ্য পাওয়া গেছে।

আমাদের চেনা 6-টি সাপের (subcuteneous বা SC পদ্ধতিতে) লিথাল ডোজ বা মারণবিষ হলো -

(1) কালাচ (common krait - 0.325mg/kg (SC)

(2) গোখরো (spectacled cobra) - 0.29mg/kg (SC)

(3) কেউটে (monocled cobra) - 0.47mg/kg (SC)

(4) চন্দ্রবোড়া (russell's viper) - 0.75mg/kg (SC)

(5) শঙ্খচূড় (king cobra) - 1.5mg/kg (SC)

(6) শাঁখামুটি (banded krait)-3.6mg/kg (SC)

এবার জেনে নিই এক কামড়ে একটা সাপ গড়ে কতটা বিষ মানুষের শরীরে ঢালতে সক্ষম।

1. শঙ্খচূড় (King Cobra) = 350-500 mg

2. কেউটে(Monocled Cobra) = 263 mg

3. গোখরো (Spectacled cobra) = 170-250 mg

4. চন্দ্রবোড়া(Russell's Viper) = 130-250 mg

5. শাঁখামুটি (Banded krait) =144 mg

6.কালাচ(Common krait) = 8-20 mg

অর্থাৎ এক কামড়েই অনেকটা বিষ শরীরে ঢুকিয়ে দিতে পারে যা একজনের বেশি বা কয়েকজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষকে মারার জন্য যথেষ্ট! তবে বিষধর সাপে কামড়ে ড্রাই বাইটের

সম্ভাবনা প্রায় 50%।

কালাচ সাপের ড্রাই বাইটের সম্ভবনা খুবই কম তবে অধিকাংশ সাপ প্রায়ই dry bite বা শুকনো কামড় দেয়। সাপ অনেক সময়ই মারণ মাত্রার বিষ শরীরে ঢোকাতে ব্যর্থ হয় এবং অনেক সময় শুকনো কামড় দেয়। অর্থাৎ সাপ কামড় দেয় কিন্তু বিষ ঢালে না বা খুবই কম পরিমানে বিষ ঢালতে পারে যাতে অল্প যন্ত্রনা ও অল্প ফোলা ও অস্বস্তি ছাড়া কিছুই হয় না! এখানে একটা প্রশ্ন আপনার মাথায় ঘুরছে যে – সাপেরা ড্রাই বাইট করে কেন?

ওরা এটা করে কারণ ওদের বিষ শিকার করতে কাজে লাগে এবং খুব রেগে না গেলে অযথা বিষ খরচ করতে চায় না। এছাড়াও মানুষের রিফ্লেকশনের জন্য অনেক সময় ঠিক করে কামড়াতেই পারে না। যেমন পায়ে পেরেক বা কাঁটা ফুটে গেলেই সঙ্গে পা মাটি থেকে উঠে যায় ঠিক তেমনি সাপের কামড়ের ক্ষেত্রেও এমন হয়। এই ড্রাই বাইট বা শুকনো কামড় খাওয়া রুগী 24 ঘন্টা থেকে 3দিনের মধ্যেই বিনা চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে যায়! আর এখানেই ওঝা গুনীনরা কেরামতি দেখায়! মারণ মাত্রার বিষ শরীরের ঢুকলে বিনা চিকিৎসায় মানুষ মারা যাবে কিন্তু সাপের মারণমাত্রার বিষ মানুষের শরীরে না ঢুকলে মানুষ সাময়িক অসুস্থ হবে কিন্তু মরবে না।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ওঝা গুনীনরা নির্বিষ ঘরচিতি, দাঁড়াস, হেলে সাপের কামড়ের রোগীকে গোখরো, কেউটে বা কালাচ কামড়েছে বলে দাবি করেন কারণ সাধারণ মানুষ সাপ চেনেই না। এই জন্যই গ্রামের দিকে এই ২০২২ সালে দাঁড়িয়েও ওঝাদের বিনাপুঁজির ব্যবসা রমরমিয়ে বাড়ছেই। নির্বিষ দাঁড়াস সাপের কামড় খাওয়া রোগী ওঝার কাছে গিয়ে জানলো যে তাকে কেউটে কামড়েছে এবং ওঝা তার প্রাণ বাঁচিয়েছে! ব্যাস সুস্থ হয়ে আরও হাজার মানুষের কাছে ওঝার গুণগান করতে থাকে। অথচ নির্বিষ সাপের কামড়ে কিছুই হয় না তা আমরা সবাই জানি।

বিষধর সাপে কামড়ে রোগীকে অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসার মাধ্যমে কষ্ট দেওয়া হয় যতক্ষন না রোগী মারা যাচ্ছেন। আর নির্বিষ সাপে কামড়ের রোগী ও শুকনো কামড় বা ড্রাই বাইট এর রোগীকে বাঁচিয়ে ওঝা নাম কামায়। মানুষ ওঝাকে রক্ষাকর্তা ভাবতে শুরু করে।

ওঝারা সাপের কামড়ের রুগীকে বাঁচাতে বিভিন্ন কার্যকলাপ করে থাকেন সেগুলোর মধ্যে কয়েকটি বলছি।

বিষ পাথর: আক্রান্ত স্থান কিছুটা চিরে বা টিপে কিছুটা রক্ত বের করে সেখানে বিষপাথর দিয়ে চেপে ধরে রাখেন। বিষ শুষে নেওয়া হয়ে গেলে পাথর আপনা আপনি পড়ে যাবে শরীর থেকে। সাধারণ মানুষের ধারণা বিষপাথর হল এমন এক পাথর যা সাপের বিষ শুষে নিতে পারে যা মূলত সাপুড়ে ও ওঝারাই সাধারণ মানুষের মাথায় ঢুকিয়েছে। এটি একটি উৎকৃষ্ট মানের ঢপের চপ। পৃথিবীতে কোনও পাথর নেই যা রক্ত থেকে বিষ শুষে নিতে পারে।

কড়ি চালান: বাংলা নাগনাগিনীর অনেক সিনেমায় দেখেছেন সাপে কাটা নায়ককে বাঁচাতে ওঝা কড়ি চালান দেয়। তারপর সেই চালান দেওয়া কড়ি সাপকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে এসে আক্রান্ত স্থানে মুখ লাগিয়ে চুষে সব বিষ বার করে দেয় ও নায়ক বেঁচে যায়। শুধু সিনেমায় নয় সাপের ওঝারা এটা হামেশায় করে। নিয়মটা হলো- বাজার থেকে তিনটি কড়ি কিনে আনতে হবে তারপর মন্ত্র পাঠ করে ঐ কড়ি তিনটিকে একটি সিঁদুররের কৌটোয় রেখে ঢাকনা বন্ধ করে দিতে হবে। এবার ঐ কড়ি-সহ সিঁদুর কৌটো কোন জলাশয়ে নিক্ষেপ করতে হবে। এই রূপ করলে কিছুক্ষনেরর মধ্যেই সাপ এসে পড়বে এবং সাপের শরীরে তিন জায়গায় কড়ি আটকে থাকবে। সাপ এসে রোগীকে যেখানে দংশন করেছিলো সেখানে পুনরায় দংশন করবে এবং সমস্ত বিষ তুলে নেবে এবং সাপের শরীরে আটকে থাকা কড়ি আপনা

আপনি খুলে যাবে।

আরেকভাবেও এই কড়ি চালান দেয় সেটা হচ্ছে একটি কাঁসার বাটি উল্টে তার তিনদিকে তিনটি কড়ি রেখে দেয়। তারপর ওঝা বিন বাজাতে শুরু করে সেই বিনের শব্দে কড়ি গুলি উড়ে গিয়ে সাপকে টানতে টানতে নিয়ে আসে তারপর ক্ষত স্থানে মুখ লাগিয়ে বিষ তুলে নেবে।

আদতে – দুটো পদ্ধতির কোনওটাতেই সাপ আসে না! জলাশয়ে নিক্ষেপ করা কড়ি কখনও সাপ নিয়ে আসতে পারে না ওঝাসহ আক্রান্ত ব্যক্তির পরিবার অপেক্ষা করতে থাকে এই বুঝি সাপ এসে বিষ তুলে নেবে আর পরিবারের মানুষটা আগের মতো তরতাজা হয়ে উঠবে। কিন্তু হায়! তা কখনওই হয় না অপেক্ষা করতে করতে এক সময় রোগী মারা যায়। তখন ওঝা দুঃখী দুঃখী মুখ নিয়ে বলে সাপটিকে কেউ মেরে দিয়েছে তাই কড়ি সাপটাকে আনতে পারছে না। সাপটি যদি কেউ না মারতো তাহলে নিশ্চয়ই আসতো। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে বিন বাজানো সত্ত্বেও যখন কড়ি বাতাসে উড়তে পারে না বা সাপকে আনতে যেতে পারে না তখনও ওঝা বলে সাপটিকে কেউ নিশ্চয়ই মেরে দিয়েছে।

হাত চালান: হাতে একটি শিকড় নিয়ে রোগীর আক্রান্ত স্থান থেকে মাথা পর্যন্ত বোলাতে থাকে ও মনে মনে মন্ত্র পড়তে থাকে যতক্ষণ না রোগী মারা যাচ্ছে! রোগি মারা গেলে পরিষ্কার বলে দেন একে কাল সাপে সাপে কামড়েছে বা আর 5 মিনিট আগে আনলে বেঁচে যেতো বিষ মাথায় উঠে গেছিল তাই আর পারলাম না।

ঝাড়ফুঁক: নিমপাতা নিশিন্দা পাতা দিয়ে আঁটি করে রোগীকে ঝপাং ঝপাং করে ঝাড়ায় ও মাঝে মাঝে ফুঁ দেয় ও মন্ত্র বলতে থাকে। এই সময় রোগীকে জোর করে দুধ খাওয়ায় ওঝারা কিন্তু এতে রোগীর কষ্ট আরও বেড়ে যায়। রোগী মারা গেলে সেই এক ডায়লগ দেয়, কাল সাপে কেটেছিল, সাপ মেরে দিয়েছে! আরেকটু তাড়াতাড়ি এলে বাঁচাতে পারতাম

আরও বিভিন্ন কথা বলে।

চর থাপ্পড় দিয়ে বিষ নামানো: ওঝারা এটা প্রায়ই করে থাকে। যে ব্যক্তি ওঝাকে প্রথম খবর দেয় যে অমুক লোককে সাপে কামড়েছে বা বিছে কামড়েছে, তখন ওঝা মন্ত্র তিনবার পাঠ করে পাঁচবার ফুঁ দিয়ে রোগী অথবা ওই খবর আনার ব্যক্তির কাঁধে বা গালে দুম দুম, ঠাস ঠাস করে তিন বার মারে তাতে কাজ না হলে আরও অনেক প্রদ্ধতি অবলম্বন করা হয় যতক্ষন না রোগী মারা যাচ্ছেন। রোগী মারা গেলে সেই এক ডায়লগ দিয়ে ল্যাঠা চুকিয়ে দেবে!

এখানে সমস্যা হলো অনেক ওঝা এই ধাপ্পাবাজি বা কেরামতি দেখিয়ে বহু টাকা আয় করে। এবং কিছু ওঝা আছে তারা আসলে এই ধাপ্পাবাজিটা জানে না। মানে হলো তারা এটাই জানে যে মন্ত্রে কাজ হয়। গুরুর কাজ থেকে শিখেছে বিনা পয়সায় রোগী বাঁচাতে চান কিন্তু তিনি অনিচ্ছাকৃত ভাবে মানুষের প্রাণ নিয়ে যেভাবে খেলছেন তিনি বুঝতেই পারেন না! অনেকটা আপনার মতো মানে, কার্বলিক অ্যাসিডে সাপ তাড়ানো যায় না এটা পরীক্ষিত কিন্তু আপনি শুনেছেন বা ছোটো বেলার কোনও বইতে হয়তো পড়েছেন যে কার্বলিক অ্যাসিড বাড়িতে রাখলে সাপ আসে না। এইবার আপনি এখনও বিশ্বাস করেন যে কার্বলিক অ্যাসিডে সাপ তাড়ানো যায় তাই বাড়িতে একটি ছোট শিশিতে কার্বলিক অ্যাসিড রেখে দিয়েছেন। কার্বলিক অ্যাসিডে সাপ তাড়ানো যায় এই বিশ্বাসে সাপের কিছু আসে যায় না। খাবারের খোঁজে আপনার বাড়িতে সাপ ঢুকবেই তাতে আপনি কার্বলিক অ্যাসিড দিন আর না দিন। ঠিক তেমনই কোনও ওঝা যদি বিশ্বাস করেন বা দাবি করেন তার গুরুর দেওয়া শিক্ষা বা মন্ত্র কোনও সাপে কামড়ের রুগীকে বাঁচাতে পারেন তাহলে বিষের কিছু আসে যায় না। মারণবিষ শরীরে ঢুকলেই মানুষ মরবেই আর শুকনো কামড় হলে ওঝার কাছে যান আর না যান রোগী আপনা আপনি ঠিক হয়ে যাবে!

এই বার প্রশ্ন করবেন কী করে বুঝবেন যে ড্রাই বাইট হয়েছে? ড্রাই বাইট হয়েছে কিনা বুঝতে অনেকটা সময় লাগে মানে ড্রাই বাইট হয়েছে শিওর হতে এতো সময় লাগে তাতে ভেনমাস বাইটের চিকিৎসা শুরু করা দেরি হয়ে যাবে সাপের কামড়ে সময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাই ড্রাই বাইট না ভেনোমাস বাইট সেটা বোঝার জন্য সময় নষ্ট করা একদম যাবে না। তাহলেই বিপদ! যতদ্রুত পারেন হাসপাতালে নিয়ে যান। গ্রামের দিকে এম্বুলেন্স পরিষেবা ঠিকঠাক পাওয়া যায় না। তাই বাইকের মাঝখানে রোগীকে বসিয়ে পিছন থেকে একজন রোগীকে ধরে বসবেন ও একজন বাইক চালাবেন। রোগীর সাথে কথা বলে তাকে আস্বস্ত করবেন। যেতে যেতে রোগীকে অবজার্ভ করবেন কী কী বলছে বা কী কষ্ট হচ্ছে সেটা ডাক্তার বাবুকে জানবেন। টাইট করে কিছু দিয়ে বাঁধবেন না। যদি হাতে কামড়ায় তাহলে বালা, আংটি তাগা, চুড়ি খুলে রাখবেন। ঘরোয়া টোটকা করবেন না, মুখ দিয়ে বিষ চুষে বার করতে যাবেন না,আক্রান্ত স্থান হাত দিয়ে ডোলবেন না, আক্রান্ত স্থান কাটবেন না বা আগুনের ছ্যাঁকা দেবেন না। মনে রাখবেন সাপের কামড়ে সময়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ! কাছাকাছি যেকোনও সরকারি হাসপাতালে বা সরকারি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র (যেখানে রাত্রে রোগী থাকে) পৌঁছান। কামড়ানোর 100 মিনিটের মধ্যে চিকিৎসা শুরু হলে রোগীকে সুস্থ হয়ে যায়। সবাইকে জানাতে ছড়িয়ে দিন অন্তত মুখে মুখে মানুষকে কুসংস্কার মুক্ত করুন। সাপের কামড়ে মৃত্যু মিছিল থামান। কোথাও ওঝার কেরামতি দেখলে থানায় খবর দিন। রোগীকে ওঝার থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠান।

পুনশ্চ: পাঠকদের ধন্যবাদ জানাই

তথ্যসূত্র: LD50 - https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_dangerous_snakes
ধন্যবাদ- পিন্টু হালদার
ছবি - ইন্টারনেট
ভিডিও- News18 ও বাংলাদেশ রেসকিউ টিম

মৃত্যু কী এবং কেন?

লিখেছেন – শংকর ব্রহ্ম



"কল্পিত স্বর্গে কল্পিত সুখ আছে কিনা জানা নেই, জানবার উপায়ও নেই। তাই, প্রত্যক্ষ সুখ ছেড়ে, বিকল্প সুখের সন্ধানে দু'হাত তুলে ছোটা-এক রকম অসুখেরই লক্ষণ।" – অতীশ রায়।

মৃত্যুর কোন ব্যাখ্যা হয় বলে আমার ব্যক্তিগত ভাবে মনে হয় না। যে যাই বলুক সবই তাদের অর্জিত ধারণার ফলশ্রুতি মাত্র তার বেশি কিছু নয়। ইনি বলেছেন, তিনি বলেছেন বলে, তার কথাগুলোই চিরসত্য এ'রকম ধরে নেওয়ার কোন কারণ আছে বলে আমার মনে হয় না। আর কিছু দিন অপেক্ষা কর, আমি নিজে তার স্বাদ গ্রহণ করি তারপর আসল সত্যটা

তোমাদের কাছে তুলে ধরব। হা হা হা হা ...

জীবিত কোন লোকই মৃত্যু সম্পর্কে কিছু বলতে পারে না, যা বলে তা তার উর্বর মস্তিস্কের কল্পনা কিংবা জীবনের অর্জিত জ্ঞানের ঝাপসা ধারণা মাত্র। আমরা সকলেই জাতকের কথা শুনি, কিন্তু কোন জাতকের পূর্ণাঙ্গ জীবনের কথা জানি না। সেটুকুই আমাদের নির্বাচিত করে জানানো হয়, যাতে আমাদের বিস্ময় আর কৌতূহল বজায় থাকে। আমার তো মনে হয়.......

" মৃত্যুই শেষ কথা
তারপর কিছু নেই আর
এই কথা বলে এক সেয়ানা পাগল
করে দিয়ে গেল সব হিসাবের গোল
যতদিন বেঁচে আছ পৃথিবী তোমার

তারপরে কিছু স্মৃতি থাকে শুধু
আর কিছু থাকে নাকি তার?
তাই এত জীবনের কথা বলা
কবিতায় গানে বারবার।
বেঁচে থাকে যারা
তারাই তো জীবনের গান গাইতে পারে
শব তা পারে না
অবশ্য সে কারও ধারও ধারে না
জীবনের মতো সে তো বাধ্য নয় কারও
মৃত্যুর পরে শুধু
থেকে যায় কিছু স্মৃতি তারও
সব স্মৃতি
মনে ধরে রাখা যায় নাতো কারও
কিছু স্মৃতি থাকে জাগরুক
মাঝে মাঝে মনে পড়ে
মনে পড়ে বার বারও।"

– কবিতা মিত্র।

পূনর্জন্ম আছে বলে, মানুষ বিশ্বাস করে, মনে মনে শান্তি পায়, তাই সে বিশ্বাস করতে শুরু করে গীতার সেই বহুল প্রচলিত অমোঘ বাণী,

" বাংসাসি জীর্ণানি যথা বিহায়,
নবানি গৃহ্নাতি নরোহপরাণি
তথা শরীরণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি
সংযাতি নবানি দেহী। (গীতা - ২/২২.)

আত্মার মৃতু হয় না, সে শুধু পুরনো খোলস বদলে অন্য খোলোশ ধারণ করে। এটা বিশ্বাস করতে তার ভাল লাগে, তার মন সায় দেয়। তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। পরলোকে কি আছে বা নেই, তা নিয়ে পরমায়ু ক্ষয়ের চেয়ে, ইহলোকে কি করে পরমায়ু অবক্ষয়ের থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, সে ভাবনা অনেক বেশী ফলপ্রসূ।

মানুষের যদি পূনর্জন্ম থাকত, তবে যতগুলো মৃত্যু ততগুলি আত্মারই পূনর্জন্ম প্রাপ্তি ঘটা স্বাভাবিক, তার বেশি সম্ভব নয়,তবে ভারতের তেত্রিশ কোটি জনগণ কিভাবে একশ'তেত্রিশ কোটি হলো?

এই হিসেবটা কেউ আমায় বুঝিয়ে দিলে, আমি স্বস্তি পাব।

অনেকে হয়তো এর উত্তরে অযৌক্তিক যুক্তি দেখাতে চাইবেন, অন্যান্য প্রাণীরা মৃত্যুর পরে, পূণ্যফলে মানব আত্মা ধারণ করেন, সেটা মোটেই বিশ্বাস যোগ্য যুক্তি বলে মনে হয় না আমার।

বিবর্তনের সংসার

লিখেছেন – চন্দন পাত্র



সৃষ্টিকর্তা বিবর্তনবাবুর সাথে, তাঁর কর্ম-সহায়ক বিজ্ঞানবাবুর ঘনিষ্ঠতা ল্যাংটা বয়স থেকেই। দুই বন্ধুর নেশা পেশা নতুন কিছু সৃষ্টি করার। সেই উদ্দেশ্যে তৈরি করেছেন 'রূপান্তর' কর্মশালা।

সৃষ্টির একমাত্র ঠিকানা 'রূপান্তর' কর্মশালায় অভিযোজন, অভিব্যক্তি এবং সংগ্রামবাবুর তত্ত্বাবধানে সৃষ্টির কাজ চলতে থাকলো। বিবর্তনের পথে বিজ্ঞানের পাথেয় খরচ করে রূপান্তর। বারংবার বস্তু এবং পরিস্থিতির চরিত্রের রূপ, স্বভাব এবং সংলাপ বদলিয়ে নতুন নতুন জগতের নাটক মঞ্চস্থ করে চলেছে প্রতিনিয়ত।

বিবর্তনবাবুরা মহাকাশ, সৌরজগত প্রভৃতি সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত থাকলেন না। আরও নতুন নতুন সৃষ্টি সুখের উল্লাসে মেতে উঠলেন। প্রায় পাঁচ'শ কোটি বছর আগে, দু'জনের সৃষ্টির নেশায় শুন্য থেকে শুরু করলেন একটা একটা করে

সংখ্যার পরিস্থিতি। কিন্তু কোন কিছুতেই আত্মতৃপ্তি হচ্ছিল না। একেবারে অন্যরকমের বিশেষ কিছু সৃষ্টির ভাবনায় তন্ময় হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। অবশেষে উপলব্ধি করলেন, একটা বৃহত্তর ক্ষেত্র'র প্রয়োজনীয়তা।

ক্ষেত্র প্রস্তুতের জন্য, তিনি অত্যন্ত গোপনে অসম্পূর্ণ সৌরজগতের গ্রহ-নক্ষত্রদের মধ্যে মান-অভিমানের তুমুল ঝগড়া বাঁধিয়ে দিলেন। শুরু হলো ক্ষমতা জাহিরের আগ্রাসন অভিযান। আত্মঅহংকারের দাপটে একজন আরেকজনের উপর আছড়ে পড়লো। চারদিকে ছড়ানো ছিটানো খণ্ড বিখণ্ড দেহ, আগুনের হল্কা, বিষাক্ত গ্যাস, উল্কা বিস্ফোরণ। তপ্ত লাভার বন্যায় ভাসছে থাকলো মহাকাশের মহা অবকাশ। চলতে থাকলো ধনী গ্রহদের শাসনে, শোষণ পর্ব। গরীব গ্রহ'দের উপর ধর্ষণ, অত্যাচার। মহাকাশের মহাশ্মশানে ঘটতে থাকলো ভয়ঙ্কর ধ্বংসাবশেষের চিত্রনাট্য।

'রূপান্তর' উত্তপ্ত লাভায় মোড়া পৃথিবী নামের গ্রহ'টাকেই নবসৃষ্টির ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত করে। উত্তপ্ত লাভাকে ঠাণ্ডা করতে প্রয়োজন হলো, দীর্ঘ সময় আর প্রেমের স্নেহশীল কোমল পরশ।

বিবর্তনবাবু, 'থিয়া' নামের সুন্দরী মমতাময়ী গ্রহটির প্রেম সুধায় পৃথিবীর তপ্ত হৃদয়ে শীতল আস্তরণ চাপাতে চাইলেন। মহাকাশের প্রভাবশালী গ্রহদেরকে দিয়ে, উস্কানিমূলক প্ররোচনায় থিয়া'র শ্লীলতাহানি ঘটানোর পদক্ষেপ নিলেন। ইজ্জত বাঁচাতে থিয়া উদ্ভ্রান্ত হয়ে উঠলে তৎক্ষণাৎ স্তস্ত্র থিয়াকে তিনিই বাঁচালেন, পৃথিবীর দেহে তাকে বিলীন করে। 'থিয়া'র আলিঙ্গনে পৃথিবীর শ্বাসপ্রশ্বাস খানিকটা স্বাভাবিক হলো, কিন্তু দুশ্চিন্তা বাড়ালো কুলীন গ্রহদের দুশমনিতে। পৃথিবীর সঙ্গে থিয়া'র ঘনিষ্ঠতার সাক্ষী এবং পৃথিবীর নিরাপত্তার রক্ষাকবচ হিসেবে, সুদৃশ্য একটা খণ্ড'কে মেজে ঘষে তিনি পরমাসুন্দরী চাঁদ বানালেন। চাঁদ পৃথিবীর দেহে এঁকে দিল, শিল্প সাহিত্যের আদিম চুম্বন। কিশোরী পৃথিবীকে সাজাতে প্রয়োজন হলো জল, মাটি,

কার্বন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, আমিষ দ্রব্য, ধাতব এবং খনিজ ইত্যাদি উপাদানগুলোর মোলায়েম রূপ-টান।

কিশোরী পৃথিবীর সাজুগুজু সামগ্রী সংগ্রহে, আবার কূটনৈতিক কৌশলে মহাকাশের প্রভাবশালী নেতা-গ্রহগুলোকে চটিয়ে বিবর্তনবাবু, দীর্ঘকাল ধরে উল্কা বৃষ্টি করালেন পৃথিবীর সারা শরীরে। রণ সাজে সজ্জিত উল্কা বাহিনী পর্যায়ক্রমে পৃথিবী আক্রমণ করলো বীরবিক্রমে। পৃথিবীকে ধ্বংস করতে এসে উল্কা বাহিনী নিজেদেরই মৃতদেহ দিয়ে বারবার লিখে গেল পৃথিবীর জীবনচরিত। তাতেই রূপান্তরের উদ্দেশ্য সফল হলো। উল্কাদের শরীরের প্রসাধনী সামগ্রীতে লেগে থাকা বরফের অণু, আমিষের দানা, নাইট্রোজেন এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসের বিপুল যোগান, যাযাবরের নূপুর পায়ে পৃথিবীর অলিতে গলিতে ছড়িয়ে পড়লে পৃথিবী সমৃদ্ধ হলো।

বরফের অণুগুলো গালিয়ে মহাসাগর বানানো হলো। তার তলদেশে আমিষ দ্রব্যের দানা খনিজপদার্থ, নাইট্রোজেন, কার্বন এবং অম্ল পদার্থগুলোকে ধাতব শৃঙ্খলে বেঁধে পাথরের খাঁজে ভরে খুব চাপ আর তাপের আওতায় পরাধীন করে রাখলেন রূপকার বিবর্তনবাবু। কোটি কোটি বছর ধরে তাদেরকে দিয়ে পরস্পরের সাথে নিয়মিতভাবে আড়ি-ভাবের খেলায় মাতিয়ে রাখলেন। কার্যকে খাঁচা বন্দী করতে কারণের জাল বিছিয়ে দিলেন দক্ষ শিকারী। স্বাধীনচেতা বিজ্ঞানবাবুই, বিবর্তনবাবুর এই খেয়ালীপনার নাম রেখেছেন বিবর্তনবাদ।

সুদীর্ঘকাল পরে, বিজ্ঞানবাবুর রাসায়নিক হস্তক্ষেপে, সংগ্রামবাবুর অনুপ্রেরণায় পরাধীন দানাগুলো সম্মিলিতভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং অত্যন্ত ধীর গতিতে জটলা পাকাতে থাকে। হৃদয়ে তাদের অমরত্ব লাভের প্রচ্ছন্ন স্বপ্ন। কয়েক হাজার কোটি বছর ধরে স্বপ্ন জয়ের আশায় স্থবীর। বিবর্তনবাবু বুঝতে পারলেন ওদের প্রচ্ছন্ন স্বপ্নেই, তাঁর আকাঙ্ক্ষিত বাস্তব ঘুমিয়ে রয়েছে। তাকে জাগিয়ে তুলতে চাই বহিঃশক্তির আক্রমণের করাঘাত।

বিবর্তনবাবু স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে আবার মহাকাশে যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে দিলেন। বৃহৎ শক্তির চাপে, ক্ষুদ্র কণাগুলো উত্তপ্ত হয়ে উঠল। তাঁর স্নেহের পরশে, বিজ্ঞানবাবুর রসায়নে আসক্ত হয়ে জটলা বাঁধা স্থবীর অণুগুলো সম্বিত ফিরে পেল। চঞ্চল হয়ে একপ্রকার অস্থির কণায় রূপান্তরিত হতে থাকলো। গ্যাসীয় কণাগুলো,আমিষ দ্রব্যে দ্রবীভূত হয়ে খনিজ দ্রব্যগুলোর সাথে মিশে চারশ কোটি বছর ধরে দন্দ্ব-ঐক্যের ধীরগতিতে পাথরের আদুল গায়ে জমে পাড়া বানিয়ে তোলে। এদিকে সূর্য সহ মহাকাশের কুলীন গ্রহগুলো, পৃথিবীর বুকে আরও অনেককাল ধরে উল্কানিক্ষেপ, ধুমকেতুর ধাক্কা এবং সূর্যরশ্মির জ্বালাময়ী ভাষণের আক্রমণ অব্যাহত রাখলো। সচল জীবাণুগুলো অভিযোজনবাবুর অনুপ্রেরণায়, বিজ্ঞানবাবুর রসায়নের রসে সিক্ত হয়ে পাথরের আড়ালে আত্মগোপন করে সূর্যের ভয়ঙ্কর আক্রমনাত্মক আলোক কণাগুলো'কে শোষণ করে বর্জ্য পদার্থে পরিণত করতে সক্ষম হলো। বর্জ্য পদার্থের সঙ্গে ধারাবাহিক ভাবে পৃথিবীর আনাচে কানাচে জমা হতে থাকলো অক্সিজেনের মতো উদার পরোপকারী প্রাণবায়ু'র বিপুল সম্ভার।

অক্সিজেনের প্রাচুর্য নিয়ে বিবর্তনবাবুর 'রূপান্তর' তৎক্ষণাৎ এই সচল দানা' গুলোকে নিম্নবিত্ত শ্রেণীর এককোষী প্রানে উত্তোরণ ঘটিয়ে ফেললেন। শুরু হয়ে গেল, বহুকোষী প্রাণ সৃষ্টির খসড়া রেখাচিত্র। রেখাচিত্রগুলোকে প্রাণবন্ত করে তুলতে ছিটাতে থাকলেন বসন্তবাহারের রঙ্গিন স্বপ্নের সুর। এই প্রভাতের আবহসংগীতে জেগে উঠল আগামীর আলোক রেণু।

মহাসাগরে, কোষ সৃষ্টির গবেষণাগারে কয়েক কোটি এককোষী জীবাণু নিয়ে পথচলা শুরু। গন্তব্য বহুকোষী'র গুঞ্জন মুখর রাজপথ। প্রতিনিয়ত অণু-পরমাণু আর নতুন নতুন কোষ তৈরীর সরঞ্জাম নিয়ে আজও বিবর্তনবাবু অক্লান্ত পরিশ্রমে নতুন সৃষ্টির চিন্তায় মগ্ন। ধীরে ধীরে এককোষী'র

কোষাগারে বাঁধলেন বহু কোষের আকারমাত্রিক সাজসজ্জা। কোষের সাথে কোষের জমাট আলিঙ্গনে সুদৃঢ় অভিযোজন সাঁটিয়ে রঙবেরঙের হরফ লিখে চলেছেন অভিব্যক্তি নামের হিতৈষী সুধীজন। ঝুলিতে তখন পূর্ণ-অপূর্ণ অবয়বের অনেকগুলি বহুকোষী প্রাণের নিসর্গচিত্র। বিচিত্র কোষগুলো উন্মুক্ত 'কোষাগারের' দেওয়ালে জীবন্ত পাড়া বানিয়ে সংসার পেতে বসলো। তাদের উদ্যেমে সন্তুষ্ট হয়ে বিবর্তনবাবু, তাদেরকে মেরুদণ্ড প্রদান করে মাথা তুলে দাঁড়ানোর জন্যে মাটিতে সাম্রাজ্য বিস্তারের পাট্টা দিলেন। তাদের পরিচয়পত্রে লিখা হলো তফসিলভুক্ত বীজাণু সম্প্রদায়।

সৃষ্টিকর্তা বিবর্তনবাবু মুক্ত মনের উত্তম'পুরুষ। মুস্কিল আসানে ওস্তাদ। ভালো চাষীও। পরিস্থিতির মস্তিষ্কে কারণ বুনে কার্য উৎপাদনে তিনি শুধু পথিক নন, পথিকৃৎ। যুগান্তরের পথে পথে নিঃস্বার্থে সৃষ্টি বিলিয়েছেন ধ্বংস কুড়িয়ে। আজও, স্বপ্নের ফেরিওয়ালা সেজে বুনে চলেছেন সৃষ্টি ধ্বংসের 'পথের পাঁচালী'।

সৃষ্টির মিলনমেলায় একদিন তিনি তাঁর উন্মুক্ত গবেষণাগারে দেখতে পেলেন অস্পষ্ট ক্ষীণাঙ্গী এক স্নেহময়ী অবয়বকে। গায়ে তার মেয়েলি গন্ধ। নগ্ন অসম্পূর্ণ দেহ। গর্ভে সৃষ্টির পরাগ ধারনের অদম্য আগ্রহে আগ্রহান্বিতা।

অকৃতদার বিবর্তনবাবু, সাহায্যকারিনীকে সাদরে আমন্ত্রণ জানিয়ে, পরম সহানুভূতির সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন........ তুমি কে গো?

ক্ষীণ স্বরে উত্তর - আমি প্রকৃতি।

বিবর্তনবাবু মিলনের মোহে জানতে চেয়ে ছিলেন - এমন আলুথালু বিবস্ত্র দেহ, তুমি সাজো না কেন গো?

প্রকৃতিদেবী অভাবের ভাবে উত্তর দেন - আমি, অনাথিনী, কে সাজাবে আমায়?

প্রেমাসক্ত আরক্তে বিবর্তন বলেছিলেন, আমি সাজালে, সাজবে তুমি?

দুজনের সাজগোজের কথার সাজ বাসর সাজালো।

প্রকৃতি, বিবর্তনের প্রেমে আবদ্ধ হলো। বাউলের একতারা, দোতারা হলো। যাযাবরের পায়ে উঠল বন্ধনের ঘুঙুর। বাসরঘরের একমাত্র পুরোহিত বিজ্ঞানবাবু আজও বিবর্তনের সংসারের হিত সাধনে সমান ব্যস্ত। গড়ে উঠল বিশ্বসংসার নামের বসতবাড়ি। 'মালাচন্দনে' ফুটে উঠল, আনন্দ আশ্রমের আশ্রয় স্থল।

"বিবর্তন" ও "রূপান্তর" এর রূপ দিয়ে প্রকৃতিদেবীকে সুন্দর করে সাজাতে মত্ত হয়ে রইল আজীবন। নৈসর্গিক ভোগের ঐকান্তিক ত্যাগ বানাতে থাকলো সৃষ্টি সুখের উল্লাস।

বিশ্ব-সংসারের যাত্রাপথেই বিবর্তনবাবুরা, অহঙ্কারী পাষাণের চূর্ণবিচূর্ণ ধ্বংসাবশেষে মাখালেন রাগ-অনুরাগের আড়ি-ভাব। খুনসুটির কালান্তর চাপে ভুমিষ্ঠ হলো মাটি। মাটির আবহ মায়ায় বাঁধা পড়লো বিশ্বচরাচর। রজস্বলা মাটির ঋতুস্রাবে বাৎসল্য সুধার ডালি নিয়ে জেগে উঠে মধ্যবিত্ত পরিবারের সবুজ কণা। যারা সরাসরি সূর্যের আলো নিংড়ে শর্করা এবং প্রাণবায়ু তৈরিতে দক্ষ কারিগর। শর্করা আর প্রাণবায়ু বক্ষে ধারণ করে পৃথিবী হয়ে উঠল বিশ্বমাতা।

অধ্যায়ে অধ্যায়ে, "রূপান্তরের" আকার রহস্য জমিয়ে রেখেছে বেনামী জীবাশ্মের পাণ্ডুলিপি। পরাধীন এককোষী'র হামাগুড়ি থেকে প্রতিটি হাঁটাচলার দলিল সযত্নে গচ্ছিত রেখেছে যুগান্তরের শিলালিপির কোঁচড়। পাণ্ডুলিপির স্বাক্ষর কিম্বা শিলালিপির অক্ষর এখনও সংশয়ের কুয়াশায় আবৃত হয়ে অপেক্ষমান।

খেয়ালী বিবর্তন কবে চারপায়ে হাঁটা অর্ধোন্নত বনমানুষ গড়েছিলেন মনেও নেই, তাকেই সর্বাঙ্গীন উত্তোরণ ঘটিয়ে দু'পায়ে হাঁটা স্বাধীন চিন্তাবিশিষ্ট দোসর প্রানী বানানোর তাগিদ অনুভব করলেন। প্রতিমুহূর্তের ভাঙ্গাগড়ার সৃষ্টিমূলক খেলায় যুক্ত হতে থাকলো নতুন নতুন খেলোয়াড়। অনেক ভেবেচিন্তে বারবার যোগ-বিয়োগ ঘটিয়ে, খাইয়ে-পরিয়ে স্বাধীন বিচার বিশ্লেষণের সক্ষমতা দিয়ে গড়ে তোলে সর্বউন্নত

জীব মানুষকে। কিছু মানুষের পরিকাঠামোর অপূর্ণতার কারণে সুস্থ চিন্তাভাবনা গঠনের কার্যটি অসম্পূর্ণই থেকে গেল।তারা বনমানুষের প্রবৃত্তি নিয়ে বড় হতে থাকলো স্বার্থপর খলনায়কের চরিত্রে অভিনয় করার জন্য। বিবর্তনবাবু, সেদিন স্বপ্নেও ভাবেনি এই নতুন খেলোয়াড়ই একদিন 'রূপান্তর' এর সৃষ্টির গতিপথকে নরকের ধ্বংসাত্মক মাটিতে নামিয়ে দেবে।

অতীতের নিম্নবিত্তের নগ্ন এককোষী থেকে উচ্চবিত্তের ধুতি -পাঞ্জাবি কিম্বা কোট-প্যান্টের, বহুকোষী'তে উত্তোরণের ইতিহাস ঐতিহাসিক বর্তমান'বাবু এখনও সম্যক লিখে উঠতে পারেননি।

ঐশ্বরিক মতবাদের ধর্ম-ব্যবসায়ীদের হিংস্র আক্রমণ অব্যাহত; কারণ বিবর্তনবাদের ঝড়ে তাদের কাল্পনিক ঈশ্বর ধ্বসে যাবে। সেই ভয়ে তারা গ্যালিলিও- ব্রুনোদের নৃশংসভাবে অত্যাচার ও খুন করতেও দ্বিধা করেনি।

বিশ্ব সংসার বাড়তে থাকলো। বিবর্তনের শয্যায় প্রকৃতির গর্ভে এলো তিন সন্তান। সুজন, দুর্জন আর কন্যা পরিবেশ। প্রকৃতিদেবীর স্তন পান করে বড়ো হতে থাকলো তিন ভবিষ্যৎ।

ধীশক্তির কর্মঠ বুদ্ধিমান সুজনদের দল বিবর্তন আর প্রকৃতির সংসারে অবৈতনিক স্বেচ্ছাশ্রমের শুভ চিন্তক সহকর্মী। বিবর্তনবাদী আদর্শে বিশ্বাসী। যথার্থ দোসর হিসেবে বিশ্ব-সংসারকে পরম যত্নে লালন-পালন করে চলেছেন আজও।সৃষ্টি, তাঁদেরকে সৃষ্টি করে আজ ধন্য। তাদের আচমনে আবাহনে বিবর্তন, প্রকৃতি আর তাঁদের সৃষ্টিতত্ত্ব অমরত্ব লাভ করে আছে।

সুজনদের অসতর্কতায়, বিষবৃক্ষের চারা রূপে দুর্জন'রা ডালপালা মেলে। তাদের ফুল ফলে কুলাঙ্গার, প্রতারক, জালিয়াতির গন্ধ ছড়ায়। সুখের সংসারে অসুখের তাণ্ডব শুরু হয়। তারা শ্রমবিমুখ এবং মুর্খ হওয়ার কারণে এককোষী প্রাণী থেকে বহুকোষী প্রাণের উত্তোরণের ইতিহাস ভ্রান্ত বলেই মনে করে। শয়তানি করেঅলৌকিক ঠগ নায়ক-

নায়িকাদের ভাববাদের ভাবনায় আক্রান্ত হয়ে সততার মুখোশ বেঁধে তারা সদাচারী হিতৈষী সেজে বসে। তাদের দাবি, বিশ্ব-সংসারসহ সমস্ত প্রাণীকুল জগৎগুরু প্রভু শ্রীশ্রী আমাশয়ানন্দজী মহারাজের লীলায় সৃষ্টি। তিনিই সমস্ত প্রাণীর কর্মের নিয়ন্ত্রক। প্রভুর নির্দেশেই তারা এই বিশ্ব-সংসারের দেখভালের দায়িত্ব পেয়েছে। ছলেবলে কৌশলে তারা 'রূপান্তর' এবং 'প্রকৃতি'র সমস্ত সম্পদ জবরদখল করে নেয়। বিজ্ঞানবাবু আজ তাদের হাতে প্রায় বন্দী। বিবর্তনবাবুর পিছু হটার উপক্রম।

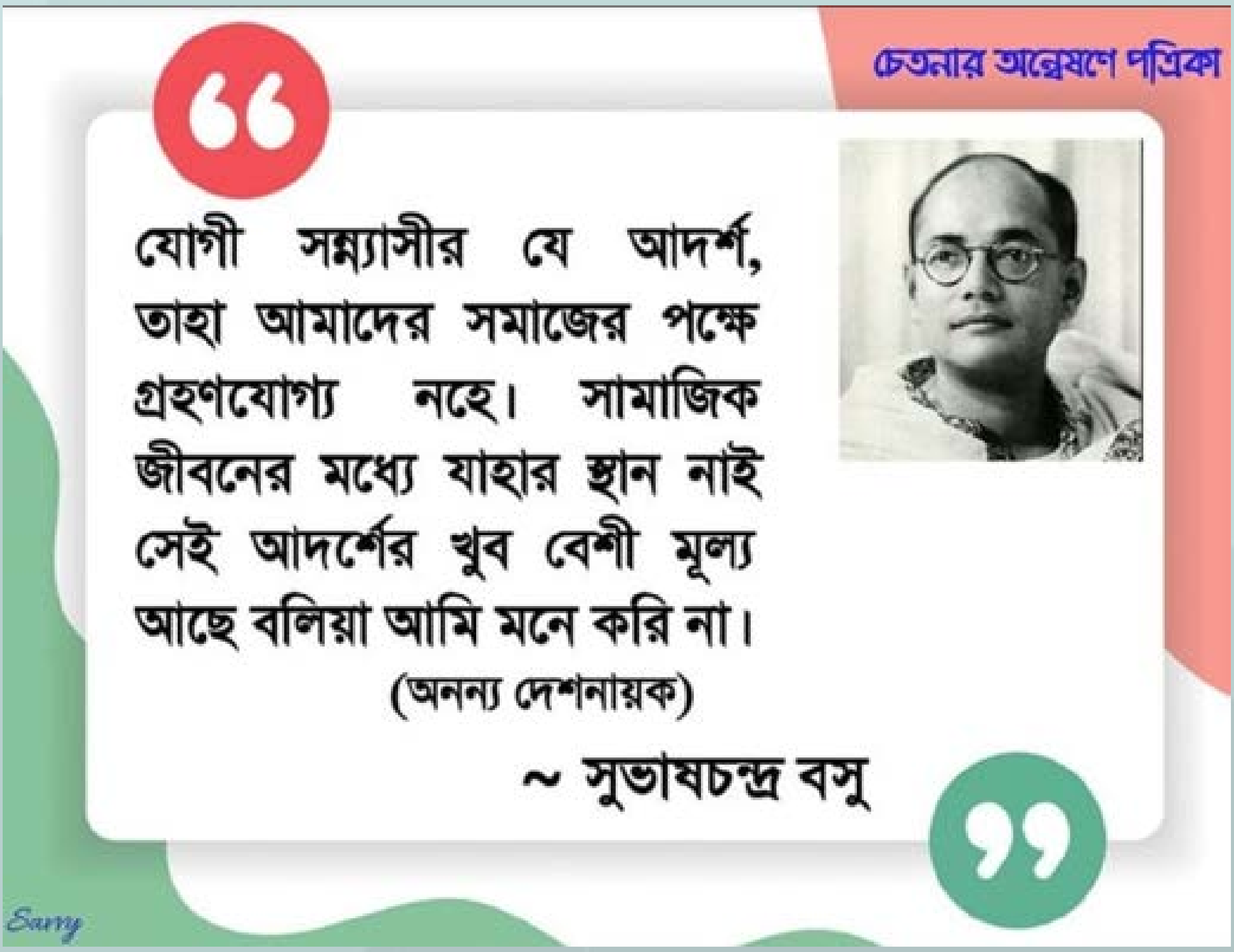
প্রকৃতিদেবীর সৌন্দর্য ধ্বংসোন্মুখ। 'পরিবেশ'এর সংসারে শান্তি বিঘ্নিত, দূষিত। 'অভিযোজন' বীরের নয় তদবিরের। 'অভিব্যক্তি' আজ ব্যাক্তি-কেন্দ্রিক। 'সংগ্রাম' আপোষের বশবর্তী। প্রতিবাদ বাদ পড়ে গেছে কবেই। নীতির-রাজা চরিত্র বদল করে রাজার নীতিতে পরিনত হতে বাধ্য হয়েছে। কিছু কিছু ধর্মান্ধ অনুন্নত প্রবৃত্তির মানুষ, দুর্জন মানুষগুলোর সঙ্গ নিল। ধর্মের কসাইখানায় গরু-ছাগলের মতো মানুষগুলো বিক্রি হতে থাকলো বলি হবে বলে।

মাত্র দশ শতাংশ দুর্জন শয়তান, নব্বই শতাংশ সুজন মানুষদেরকে বশীভূত করে তাদের পরিশ্রমের ফসল কুক্ষিগত করতে বিশেষ ছলনার আশ্রয় নেয়। বিশ্ব সংসারকে টিকিয়ে রাখার অজুহাতে। তাদের সুবিধামতো বেশকিছু নিয়মনীতি প্রবর্তন করে। সেইসব নিয়মনীতির ক্ষমতাবলে শাসন শোষণ অত্যাচার চালাতে থাকে। দুর্জনপন্থী'রা, ছলনায় মা-প্রকৃতি' এবং বোন-'পরিবেশ' এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অলংকার এমনকি ইজ্জৎও বিক্রি করে দিচ্ছে ঘৃণ্য শয়তানদের শয্যায়। সততাকে অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে বিশ্ব-সংসারের ভয়ঙ্কর সঙ্কট এনে দিয়েছে। দুর্জনদের চর্চা চেতনার বিবর্তনের সৃষ্টিতত্ত্ব সত্য নয়, রূপকথা। জীবন্ত নয় মৃত।

প্রকৃতি,পরিবেশ, সংস্কৃতি আজ মৃত্যুশয্যায়। তাঁদের চিকিৎসা না করে লোকদেখানো আরতি বন্দনা করে, দায় এড়িয়ে যাচ্ছে দুর্জনপন্থী শয়তানরা। ভাববাদী নায়ক

নায়িকারা অপকর্মের আপ্ত-সহায়ক। মনু'র সত্বে খুন হতে থাকলো মনুষ্যত্ব। মধ্যযুগের বর্বরতা কুয়াশা আচ্ছন্ন করে রেখেছে আজও। বিশ্ব-সংসার এখন যুক্তিহীন অলৌকিক কুসংস্কারের বৈঠকখানা।

বিবর্তনের সংসারে আজ সঙ্কটের আবর্তন।



ধর্মক্ষেত্র সৃষ্টি

লিখেছেন – নৃপেন্দ্রনাথ মণ্ডল

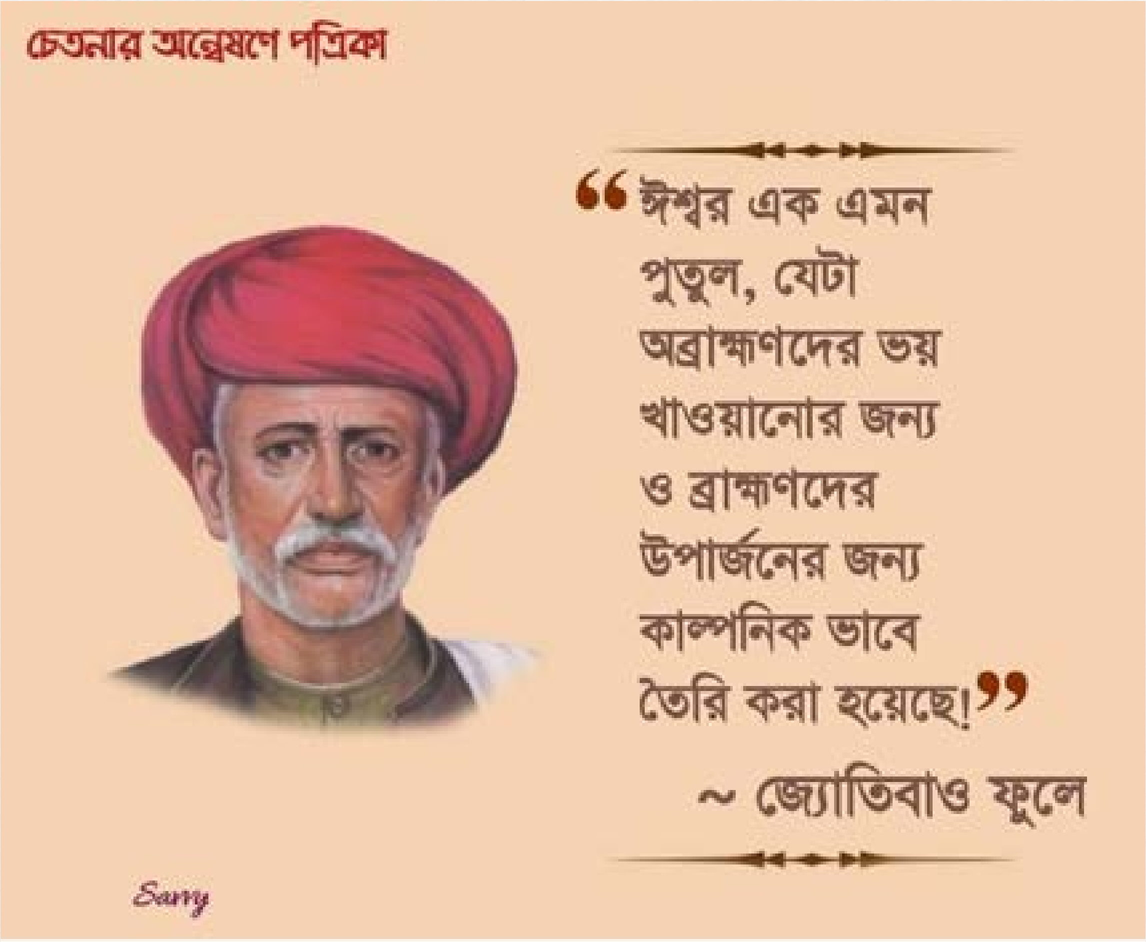


আসাম রাজ্যের এক রাখাল ছেলে গিয়েছিল মাঠে ঘাস কাটতে। দেখল একটি আইলে খুব সুন্দর ভাবে ঘাস বেঁধে আছে। সেই আলের উপরের ঘাস দেখে খুব লোভ হল। রাখাল মাত্রেই ঘাসে লোভ স্বাভাবিক। আর দেরি করে লাভ কি? ঘাস কাটতে লাগল আইলের উপর দিয়ে পাছা ছ্যাচড়াতে ছ্যাচড়াতে। রাখালের পরণে ছিল এক টুকরো সাদা থান কাপড়। লুঙ্গির বিকল্প আর কি। এই মাঠাটি ছাড়া ভিতরে আন্ডার প্যান্ট, শর্ট প্যান্ট, কিছুই ছিল না। স্বভাবতই পেড়ুটা ভালো ভাবেই আইলে ছ্যাচড়া খেতেই ছিল। রাখাল ছেলেটির পেড়ুতে ছিল ঘা। সহে কারনেই শর্ট প্যান্ট বা আন্ডার প্যান্ট পরলে খুব জ্বালা যন্ত্রণা করত এবং বিশেষ অসুবিধা হত। সেই ছ্যাচড়া খেতে থাকা পেড়ুতে কোন এক ধরনের ঘা নিরাময় ঘাস কাটার পর নির্গত রস ঠেকে ছিল। কোন গাছ গাছড়াতে কোন গুনাগুন থাকে বলা যায় না। বেশিরভাগ ঔষধের উৎস লতাপাতা গাছ গাছড়া। রাখাল ছেলেটি বাড়ি এসে দেখে পেড়ুর ঘা গুলি ভালো হয়ে গেছে। আর সহে কথাটা গ্রামের পাঁচটা লোককে বলার জন্য পেট ফুলতে থাকে। ফলত গ্রামের পাঁচটি লোকের নিকট গল্প করে ফেলল। এত্ত বড় একটা

অবাক করা ঘটনা কি করেই বা গল্প না করে থাকা যায়। এতো একেবারেই অবাক করা চাক্ষুস আজব ঘটনা। এই সংবাদ এক দুই পাঁচ কান হয়ে গোটা গ্রামে চাউর হয়ে গেল। গ্রামের যত্ত মানুষের পেড়ুতে ঘা ছিল ঐ আইলে গিয়ে লাগল পেড়ু ছ্যাচড়াতে। প্রথম প্রথম দু এক জনের পেড়ুর ঘা সত্যি সত্যিই ভাল হল যত দিন পর্যন্ত ঐ আইলে ঘা নিরাময় ঘাস ছিল। গ্রামের মানুষ যেনো ঔষধের একটি ক্ষেত্র খুঁজে পেল। যতই এই সংবাদ চাউর হতে লাগল গ্রামের পর গ্রাম ছাড়িয়ে দূর দূর গ্রামে গ্রামান্তরে ততোই পেড়ুতে ঘা ওয়ালা মানুগুলি ঐ আইলে পেড়ু ছ্যাচড়ানোর ধুম লেগে গেল। বিরাম নেই যেনো। এতই ঘা ওয়ালা মানুষ পেড়ু ছ্যাচড়াতে থাকল যে আইলের ঘাস গুলি ছিলে ছিলে ঘাস উঠে আইল একেবারেই পরিস্কার হয়ে চিক্কন টলটলে হয়ে গেল। পেড়ুতে ঘা ওয়ালা মানুষের ভিড় দিনের পর দিন উত্তর উত্তর বাড়তেই থাকল। ঘা আর ভালো না হলেও তাও মানুষ মনের খক্কনে ঘা ভালো হবে হবে করে পেড়ু কিন্তু ছ্যাচড়াতেই থাকল। ভালুই বা আর হবে কি করে যে ঘাসের ঘা ভালো হয়েছিল সেই ঘাসতো আর নেই। দিনের পর দিন পেড়ু ছ্যাচড়ানোর ঠেলায় এক সময় ঐ আইলের জায়গাটার নাম হয়ে গেলো পেড়ু ছ্যাচড়ার মাঠ। এই পেড়ু ছ্যাচড়ার মাঠ এখানে থেমে থাকল না। এখানে কিছু কিছু পয়সা কড়ি পড়তে দেখে এই আইলের দুই মালিক এই মাঠের একটি ধর্মীয় নাম দিয়ে দিল। নাম দিল পেড়ু ছ্যাচড়া ধর্মীয় মাঠ। এবার শুরু হলো ধর্মীয় হুযুগ। এই আইলে মানুষ কিছু পয়সা কড়িও আরও বেশি করে ফেলতে থাকল। দুই জমির আইল বালা পয়সা কড়ির গন্ধ ভালো ভাবেই পেয়ে গেল। আইলের দুই মালিক যুক্তি পরামর্শ করে রোগীর সমাগম বাড়ানোর জন্য আবারও নতুন নাম করণ করল পেড়ু ছ্যাচড়া রোগী তীর্থ। এই স্থানের আরও গুরুত্ব বাড়ানোর জন্য এখানে একটা শিবলিঙ্গও স্থাপন করল। আবারও নাম পরিবর্তন। এবারে একেবারে চমক দেওয়া নাম দিল "পেড়ু ছ্যাচড়া লিঙ্গ ধাম" । প্রণামী দিনের পর দিন আরও বাড়তে লাগল। তীর্থ যাত্রী আরও বাড়নোর জন্য প্রণামীর পয়সা দিয়ে এবং কিছু

পুঁজি লাগিয়ে বড় আকাশ চুম্বি শিবলিঙ্গ মন্দির তৈরি করে ফেলল। এবার ধর্মক্ষেত্র, ধামে পরিনত হল। আসেপাশে দোকান পাসার গড়ে উঠার হিড়িক লেগে গেল এবং অনেক দোকান পাট গড়ে উঠল। আর ঘুরে তাকানোর সময় নেই। পেড়ুতে ঘা ওয়ালা রোগীগুলি এক দিকে ডাক্তারও দেখাত আর এক দিকে এখানে পেড়ুও ছ্যাচড়তো। ডাক্তার করতো ভালো আর নাম হত এই ধামের। মানুষের ধারনা হল যে এখানে পেড়ু ছ্যাচড়িয়েছে বলেই ডাক্তার ঘা ভালো করতে পারছেন। এ আর কাকে বলে ধর্মীয় হুযুগ? এই ধামের কার্যকলাপ এখানেও থেমে থাকলনা। এই আইলের দেবতার আরও বেশি গুরুত্ব বাড়ানোর জন্য চৌদ্দ হাতের কালী মূর্তি স্থাপন করা হল। এই কালীর আকাশ ছোঁয়া মন্দিরও স্থাপন হয়ে গেল। এই কালীর থানে ধর্মান্ধ মানুষ একটা বা জোড়া পাঁঠা মানত করতে লাগল। কোনও এক কৌশলী পুরোহিত একটা নিয়ম চালু করল যে, এই মানতের পাঁঠাকে বলি দিয়ে, বলি পাঁঠার রক্ত পেড়ু ছ্যাচড়ানোর পর পেড়ুতে ঠেকাতে হবে। তাহলে ফল আরও ভালো হবে। এবার পুরহীতের বানী বেদ বাক্য বলে কথা। ধর্মান্ধরা পেড়ু ছ্যাচড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বলি পাঁঠার রক্ত পেড়ুতে ঠেকাতে লাগল। এই ধামের মহত্ব পুরোহিতদের উপদেশ বাণী মন্ত্রবলের কথার প্রচার এখানেও থেমে থাকল না। পাঁচ সাত দশ জন ধর্মভীরু শিক্ষিত স্বার্থ চরিতার্থ পূরণকারী মানুষ এই ধামের নামের পরিবর্তন করে একটা সুমধুর নতুন নামকরণ করল। এই নামে আরও চমক দেখা দিল। ধামের নতুন নাম করণ হল "পেড়ুঠেকা কামলিঙ্গ ধাম"। এ ধামের নাম চারিদিকে যতই ছড়াতে থাকল ততোই এক দিকে তীর্থ যাত্রী আর এক দিকে দেশ বিদেশের সুকৌশলী লোভী কাম চরিতার্থ পূরণ কারি ব্রাহ্মণ পুরোহিতের সমাগম ঘটতে থাকল। এই ধামের মন্দিরের মানতের বিষয় সর্বমনস্কামনা পূরণকারীতে পূর্ণ হল। ফলত বান্ধা, থুবড়া পড়া, বিভিন্ন ধরনের রমনীর সমাগম দিনের পর দিন বাড়তে থাকল। সেবাদাসীও জুটল প্রচুর। ফলত, এ ধাম কামুক কৌশলী পুরহীতদের স্বর্গ রাজ্যে পরিনত হল। এক প্রান্তে যমেন "কামাক্ষা ধাম"

আর এক প্রান্তে রমরমীয় তড়তড়িয়ে “পেড়ু ঠেকা কামলিঙ্গ ধাম” ধর্মান্ধদের ধর্মান্ধতায় এবং বিশেষ কৌশলী পুরহীতদের মহিমাতে আজও বিরাজমান।



সূচিপত্র »

নমঃশূদ্র জাতিগোষ্ঠীর উৎপত্তি ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, মতুয়া সংগঠনের উৎপত্তি

লিখেছেন – মানব মন্ডল



নমঃশূদ্র বা নমঃস্বেজ হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি বড় জনগোষ্ঠী। এই গোষ্ঠীর বিস্তার মূলত বাংলাদেশ এবং ভারত। এছাড়াও অন্যান্য বিভিন্ন দেশে তারা অল্প সংখ্যায় ছড়িয়ে আছে। ঐতিহ্যগতভাবে এরা পেশায় কৃষিজীবী। সামাজিকভাবে তারা হিন্দু সম্প্রদায়ের চারটি বর্ণের বাইরে অবস্থান করে অর্থাৎ তারা একটি অবর্ণ বা মুক্তবর্ণ হিন্দু জনগোষ্ঠী। ভারতীয় উপমহাদেশে বহুকাল ধরে তারা শোষিত এবং নির্যাতিত জনগোষ্ঠী এবং এক ধরনের বর্ণ বিদ্বেষের তথা রূপকার্থে তারা ইহুদী-ভাগ্যের শিকার। ১৮৯১ সালে ব্রিটিশদের একটি পরিসংখ্যানে তাদের পূর্বপুরুষের শ্রুতি অনুযায়ী, অধিকাংশ নমঃশূদ্রই কাশ্যপ গোত্রের অন্তর্গত।

১৮৯১ সালে ব্রিটিশদের একটি পরিসংখ্যানে তাদের

পূর্বপুরুষের শ্রুতি অনুযায়ী, অধিকাংশ নমঃশূদ্র বা নমঃস্বেজ'ই কাশ্যপ গোত্রের অন্তর্গত। এছাড়াও কয়েকটি গোত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। জ্ঞানীঋষি বুদ্ধ কাশ্যপ এর পরবর্তী নমস্ মুনির বংশধর হেতু তারা নিজেদের সম্প্রতি নমঃস্বেজ বলে অভিহিত করে।

নমঃশূদ্র শব্দটি একেবারেই অর্বাচীন বৃটিশ আমলের আরোপিত হীনাত্মক শব্দ। প্রাচীন কোন শাস্ত্রেই এই জাতির কোন উল্লেখ নেই। ১৯১১ সালের সেন্সাসে বাঙলার জাতিগুলির মধ্যে নাম পরিবর্তনের একটা হিড়িক তৈরি করা হয়েছিল। ছোটজাতগুলোকে হিন্দুভুক্ত করার জন্য বাংলার তৎকালীন দিগ্গজ পণ্ডিতদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মত। "জাতির উন্নয়ন" নামক গাল ভরা নামকরণের আড়ালে তারা বিজ্ঞাপন জারি করেছিলেন। প্রায় চল্লিশ জন নামকরা মহা পণ্ডিত এই বিজ্ঞাপণে সই করে লিখে ছিলেন, "The caste called Namasudra is Brahmin by origin beging descended from the great Beahmin, Kashypa and not "Chandal'। আসামের চিফ কমিশনার ১৮৮৫ সালের ৮ আগস্ট কাছাড় জেলার ডেপুটি কমিশনারকে চিঠি দিয়ে জানালেন যে, চন্ডালদের নমশূদ্র হিসেবে স্বীকৃতি দিতে আর কোন আপত্তি নেই। তারপর ওই চল্লিশজন ভূ-দেবতা জানান যে নমঃশূদ্ররা চন্ডাল নয়, তারা ব্রাহ্মন দেবতার সন্তান। পূজনীয় এবং নমস্য। ১৮৮৭ তে খুলনার কমিশনার সাহেবের সভায় সচিয়াদহ নিবাসী উমাচরন বিশ্বাস 'শক্তিসঙ্গম তন্ত্র' নামে একখানি শাস্ত্রের প্রাণতোষী নামক অধ্যায়ে "হর-পার্বতী সংবাদে" নম জাতির উল্লেখ আছে বলে লিখিত অংশ পড়ে শোনান এবং দাবী করেন যে তারা নমস্ মুনির সন্তান। নমস্ শুদ্র কন্যা বিবাহ করেন। তাই এই জাতি নমঃশূদ্র নামে পরিচিত। পিতৃ সূত্রে তাঁরা ব্রাহ্মণ।

নমঃশূদ্র আর্যায়ন প্রক্রিয়া থেকে উদ্ভুত একটি বর্ণাশ্রয়ী সম্প্রদায়। প্রাচীন কালে সমাজে চতুবর্ণ প্রথাকে বংশানুক্রমিক বর্ণপ্রথায় রূপান্তরের যে প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় তারই

ধারাবাহিকতায় এর উদ্ভব। তাত্ত্বিকভাবে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়ায় সমাজে কোন গোষ্ঠীর প্রাধান্য নির্ধারণ করা হত এবং এ প্রক্রিয়ায় ব্রাহ্মণদের অবস্থান ছিল শীর্ষে ও সর্বনিম্ন স্তরে ছিল শুদ্র। ধর্ম-সামাজিক স্তর বিন্যাশে সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থানরত শুদ্রদের ক্ষেত্রে বিশ্বাস করা হতো যে, সত্য উপলব্ধি ও পালন করার মতো কোনো গুণাবলী তাদের নেই। উপমহাদেশে আর্যাকরণের ফলে ধীরে ধীরে চতুবর্ণ প্রথার মধ্যে অনার্যদের আত্মীকরণ ঘটতে থাকে। বর্ণপ্রথার বৈশিষ্ট্যসমূহ পরবর্তীকালে জাতি ব্যবস্থার মধ্যে বিশদভাবে বর্ণিত হয়। পরবর্তী সময়ে বর্ণ শ্রেণির বৈশিষ্ট্যসূচক শ্রমভিত্তিক এ ব্যাপক বিভাজনের স্পষ্ট প্রতিফলন দেখা যায় জাতি প্রথার মধ্যে। ফলে বিভিন্ন বর্ণের মানুষের মধ্যে পেশাগত স্বাতন্ত্র্য ও পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

বাংলায় আর্য সংস্কৃতির ক্রমবিস্তারের ফলে বিভিন্ন শ্রেণির জনগনকে নির্দিষ্ট পেশা সহকারে স্বতন্ত্র ও সুনির্দিষ্ট জাতি হিসেবে শ্রেণি বিভাজনের দিকে চালিত করে। বর্ণের পরিভাষায় চাষী, ব্যবসায়ী, কারিগর ও সেবাপ্রদানকারী জাতসমূহ শুদ্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। জাতি ব্যবস্থার অধীনে পেশাজীবী শ্রেণির বিশাল জনগোষ্ঠী সমাজের প্রয়োজন মিটানোর কাজে আত্মনিয়োগ করেছিল। পরিণতিস্বরূপ, বাংলায় হিন্দু সমাজের গঠন বর্ণের পরিবর্তে জাতির পরিভাষা অনুসারে উপলব্ধ হয়ে আসে। কিন্তু এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো, জাতি ও পেশার মধ্যে সম্বন্ধের প্রতি জোর দেওয়ার ফলে জাত ব্যবস্থার সমর্থনকারীগণ উৎপাদন ও বণ্টনের একটি অ-প্রতিযোগিতামূলক বন্দোবস্তের ভিত্তি স্থাপনের চেষ্টা করছিল, যা প্রত্যেক ব্যক্তির জীবিকানির্বাহের উপায় ও ন্যূনতম সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। সাধারণভাবে সমাজিক ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থা খ্রিষ্টীয় সাত শতক থেকে ভারতীয় স্থানীয় আর্থিক ব্যবস্থায় বিরাজমান সীমিত সম্পদ এবং ঘাটতি ও স্থবিরতার চাপের মধ্যেও সহজভাবে উৎপাদন ও তা বণ্টনের নিশ্চয়তা প্রদান করে থাকে।

বল্লালচরিতে বাংলায় শুদ্রদের উত্থান ও তাদের

ক্রমবিকাশের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে তাদের দুটি বৃহৎ শ্রেণিতে বিভক্ত করে দেখানো হয়েছে। তারা ছিল; সৎ শুদ্র (যাদের নিকট থেকে উচ্চ বর্ণের মানুষ খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করতে পারত) এবং অসৎ শুদ্র (যাদের ছোঁয়াকেও অপবিত্র বা অচ্ছুৎ বলে গণ্য করা হতো।) শুদ্রদের মধ্যে যারা কৃষি কাজের সঙ্গে জড়িত ছিল তাদের বৃহত্তর অংশ 'নমঃশূদ্র' হিসেবে পরিচিতি পায় এবং অবশিষ্টাংশ দাস হিসেবে পরিগণিত হয়। সুলতানী আমলে অনেক পেশাজীবী শ্রেণিকে সামাজিকভাবে স্বীকৃতি দেয়ার প্রবণতা দেখা যায়। যেমন, সুবর্ণ বণিকদের সৎ শুদ্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। বিদেশি শাসন এই প্রবণতাকে ধরে রাখার ব্যাপারে সাহায্য করেছিল। কারণ তখন সামাজিকভাবে বহিষ্কৃত ও বঞ্চিত শ্রেণি ব্যাপকহারে সামাজিক স্বীকৃতি প্রাপ্তির আশায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমানে রূপান্তরিত হচ্ছিল। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে সুলতানী ও মুগল আমলে নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠী বাংলার বৃহৎ ও অর্থনৈতিকভাবে সর্বাধিক প্রভাবশালী সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। ঔপনিবেশিক আমলে নমঃশূদ্র সম্প্রদায় প্রজনন বা জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও পুনস্বীকৃতি প্রাপ্তি, উভয় প্রক্রিয়ায় সংখ্যার দিক দিয়ে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর রূপ ধারণ করে এবং তাদের এ বিষয়টি বিশ শতকের গোড়া থেকেই ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্ব পেতে শুরু করে। কারণ সে সময়ে নির্বাচন নির্ভর রাজনীতির ধারায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও সামগ্রিক জাতির স্বার্থ রক্ষার প্রতি দৃষ্টি আরওপ করার বিষয়টি গুরুত্ব পেতে শুরু করে।

পূর্ব বাংলার নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে গতিশীলতা আসে উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে বিশ শতক পর্যন্ত, যখন পশ্চিম বঙ্গের ভূমিহীন ও প্রাপ্তিক নমঃশূদ্রগণ পূর্ব বাংলার সুন্দরবন, চট্টগ্রাম, মেঘনার অববাহিকা, সিলেট ও ময়মনসিংহের হাওড় অঞ্চল, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি অঞ্চলে পুনর্বাসিত হওয়ার ব্যাপারে উৎসাহী হয় ও তারা এ পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী হয়। উক্ত অঞ্চলের জোতদার ও অন্যান্য বড় ভূ-স্বামীগণ পরিত্যক্ত নিষ্কর জমিতে পুনর্বাসিত নমঃশূদ্র সম্প্রদায়কে বর্গাচাষী হিসেবে অংশগ্রহণের জন্য আহবান

জানায়। এ প্রক্রিয়ায় প্রধানত নমঃশূদ্রদের দ্বারা ইজারা চুক্তির মাধ্যমে বাংলায় একটি বৃহৎ বর্গাচাষী শ্রেণি সৃষ্টির পথ তৈরি হয়। নমঃশূদ্রগণ নিম্ন শ্রেণির সাধারণ রায়তে পরিণত হয় এবং সাধারভাবে এ শ্রেণিই উচ্চ শ্রেণির অধিকাংশ হিন্দু ভূমি মালিকদের মধ্যস্বত্বভোগীতে পরিণত হয়।

শ্রেণি হিসেবে নমঃশূদ্রগণ ছিল ঋণগ্রস্ত ও অনুন্নত। বাংলার এই অনুন্নত সম্প্রদায় ২০ শতকের গোড়া থেকেই বিভিন্ন সমিতি ও বর্ণাশ্রয়ী বিভিন্ন সংঘের মাধ্যমে রাজনৈতিকভাবে সংঘবদ্ধ হচ্ছিল। তাদের দাবিসমূহ সরকারের নিকট সমবেদনার উদ্রেক করছিল। ফলে সাইমন কমিশন রিপোর্ট (১৯২৮-২৯) এবং গোল টেবিল কনফারেন্সে এই অনুন্নত সম্প্রদায়কে রাজনৈতিক স্বীকৃতি প্রদানের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে সুপারিশ করা হয়। অবশেষে কংগ্রেস পুনা প্যাক্টএ (১৯৩২) তাদের দাবিসমূহ মেনে নেয়। অনুন্নত শ্রেণি কথাটির মধ্যে যে মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা জড়িয়ে আছে তা পরিহার করতে বাংলা সরকার ১৯৩২ সালে ৭৬টি নিম্নবর্ণের হিন্দু শ্রেণিকে তফসিলী সম্প্রদায় অভিধায় আখ্যায়িত করে এবং ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনএর প্রথম তফসিলে তাদের নামের উল্লেখ করা হয়েছে। অ্যাক্টের আওতায় বঙ্গীয় আইনসভায় তফসিলী সম্প্রদায়ের জন্য বিশ শতাংশ (২০%) আসন সংরক্ষিত করা হয়। নমঃশূদ্র শ্রেণির মতো অনুন্নত না হলেও এ আইনে মুসলমান জনগোষ্ঠীও তাদের জন্য সংরক্ষিত সাধারণ আসনে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকার লাভ করে। এভাবে বাংলার রাজনীতিতে তফসিলী সম্প্রদায় একটি শক্তিশালী ভারসাম্য রক্ষাকারী শক্তিতে পরিণত হয় এবং বাংলার রাজনীতিতে উভয় সম্প্রদায় উভয়ের ঘনিষ্ট সংস্পর্শে এসে স্ব-স্ব শ্রেণির অবস্থার উন্নয়নে এক সঙ্গে পরিকল্পনা গ্রহণ করার সুযোগ লাভ করে। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৬ এবং ১৯৫৪ (পূর্ব বাংলা) সালের নির্বাচনে সর্ব-বঙ্গীয় তফসিলী সম্প্রদায় মুসলিম লীগের সঙ্গে মন্ত্রিসভা গঠনে নিজেদের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করে।

দুই মহান ধর্মগুরু হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ এবং মতুয়া ধর্মান্দোলন: "জীবে দয়া নামে রুচি মানুষেতে নিষ্ঠা।/ ইহা ছাড়া আর যত সব ক্রিয়া ভ্রষ্টা।।"—কথাটি হরিচাঁদ ঠাকুরের। শুনে যে কারোরই মনে হবে এতো বিবেকানন্দের সেই বিখ্যাত 'জীবে প্রেম করে যেই জন...' কথাটির প্রতিধ্বনি। বিবেকানন্দের কথাগুলো যখন ছেপে বেরুচ্ছে এই কথাগুলোও একই সময়ে ছেপে বেরিয়েছে। আছে তারকচন্দ্র সরকারের লেখা 'শ্রী শ্রী হরিলীলামৃত' বইতে। যে গুরু হরিচাঁদের জীবনী বইটি, তিনি নিজে কথাটি বলুন বা নাই বলুন, কথাটি তাঁর নামেই চলে। বইটি ছেপে বেরিয়েছে ১৯১৬তে। 'মতুয়া ধর্মাবলম্বী'দের বাইরে বাকি ভারতীয় তো দূরই, সাধারণ বাঙালি যে হরিচাঁদের এই কথাগুলো জানেন না বিশেষ, তাতে একটা কথাতো স্পষ্ট হয়েই যায় বিবেকানন্দ যতই ভারতবাসীকে ধমকে দিয়ে বলুন, "হে ভারত, ... এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা-এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে?" যতই আহ্বান জানান , "বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই,..." আমরা এর জন্যে বিবেকান্দকে মহীয়ান করে মধ্যবিত্তের নায়ক বানিয়ে দিলাম, 'ভারতবর্ষ'কে নিয়ে গৌরব করতেও শিখলাম, যাদের তিনি ভাই বলে কাছে টেনে নিতে বললেন, তাদের আদৌ কাছে টেনে নিলাম না। হ্যাঁ, কেউ হয়তো ছায়া মাড়ালাম, ছোঁয়াটা খেলাম, বিপদে আপদে সহায় সম্বল নিয়ে পাশেও দাঁড়ালাম আর গর্ব করে 'জাত মানি না' বলে প্রচারও করে গেলাম। কিন্তু হরিচাঁদ, গুরুচাঁদের মতো কেউ যখন সত্যি কেউ সমস্ত কাপুরুষতা দূর করে মনুষ্যত্ব অর্জনের জন্যে মাথাতুলে দাঁড়াতে চাইলেন বাকিদের থেকে পেলেন শুধু প্রবল উপেক্ষা । ভারতীয় জাতীয়তার আদর্শে তাঁদের নায়কের সম্মান জুটল না। স্কুল কলেজের মহাপুরুষের জীবনীতেও তাঁরা রইলেন ব্রাত্য। অথচ উনিশ শতকে কলকাতা শহরের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুবিধেভোগীরা যখন বিচিত্র ধর্মসংস্কার আন্দোলন গড়ে

তুলছিলেন, বাকি বাংলাদেশে সুবিধে বঞ্চিত হিন্দু দলিত এবং মুসলমান প্রজারাও ওয়াহাবী, তারিখ এ মুহম্মদীয়া, ফারায়েজি, বলাহাড়ি, কর্তাভজা, মতুয়া ইত্যাদি নানা নামে বিচিত্র সব ধর্মসংস্কার আন্দোলন গড়ে তুলছিলেন যেগুলো অচিরেই এক একটি রাজনৈতিক আন্দোলনেরও চেহারা নিচ্ছিল। এগুলোর মধ্যে মতুয়া একটি অত্যন্ত শক্তিশালী ধর্মসংস্কার আন্দোলন যা এখনো ভারতবর্ষে এবং বাংলাদেশে সজীব এবং সক্রিয়।

অবিভক্ত বাংলাদেশের পূববাংলা অংশে সবচেয়ে বড় জনগোষ্ঠীটির নাম নমঃশূদ্র। অনেকে বলেন, পূর্ব বাংলার ধর্মান্তরিত মুসলমানদেরও অধিকাংশ আদতে এই নমশূদ্র জনগোষ্ঠীরই ছিলেন। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে গোটা বাংলাতে এরা দ্বিতীয় বৃহৎ জনগোষ্ঠী ছিলেন। বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মন সিংহ, যশোর, আর খুলনা এই ক'টি জেলাতেই ৭৫ শতাংশ নমশূদ্র মানুষ বাস করতেন। এছাড়াও অন্যান্য জেলাতে , মায়, সিলেটেও নমশূদ্র বসতি নিতান্ত ফেলনা ছিল না। ১৯১১-র আদমসুমারিতেই প্রথম বহু সংগ্রামের পর এদের প্রচলিত জাতিনাম 'চণ্ডাল' মুছে যায়। এর আগে অব্দি এরা এই নামেই পরিচিত ছিলেন। এবং বাকি বাঙালি হিন্দুরা এদের অস্পৃশ্য বলে মনে করতেন, বা এখনো মনে করে থাকেন। স্মার্তকার রঘুনন্দনের নির্দেশে এদের সঙ্গে বিবাহ সম্পর্ক তো দূর, পংক্তিভোজনও এড়িয়ে চলত উঁচু বর্ণের বাঙালি। ১৯১১র আদমসুমারি অব্দি দেখা গেছে নমঃশূদ্রদের ৭৮ শতাংশ মানুষের প্রধান জীবিকা কৃষি। এবং এই কৃষিজীবিদের মাত্র ১.১৫ শতাংশ মানুষ নিজেরা খাজনা পেতেন। তার মানে মোটের উপরে এরা শ্রেণি এবং বর্ণ দু'দিক থেকেই ছিলেন দলিত। যে জমিদারদের অধীনে প্রজা হয়ে থাকতেন তাদের অধিকাংশই বর্ণহিন্দু, সামান্য কিছু সৈয়দ মুসলমান । শেখর বন্দ্যোপাধায় লিখেছেন, " বাংলার কৃষিসমাজে বড় যে বিভেদ তা হলো 'খাজনাভোগী' এবং 'খাজনা প্রদানকারী'দের মধ্যে, এই এই ক্ষেত্রে তা নিখুঁতভাবে মিলে গিয়েছিল জাতিভেদের সঙ্গে। এই বিভেদ ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলত নানাধরণের অত্যাচারের ফলে। তার মধ্যে ছিল

মধ্যস্বত্বভোগীদের শোষণ, বেআইনী কর আদায়, খাজনার বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি সহজ নগদ খাজনার বদলে উঁচুহারে খাজনা আদায় করা।" এর মধ্যেও একটি ছোট গোষ্ঠী নিশ্চয়ই নানা ছোটখাটো ব্যবসা এবং মহাজনী কারবার ইত্যাদি করে সামাজিক মর্যাদার উপরের স্তরে উঠেছিলেন। "তবে ১৯১১ সালে এই বর্ধিষ্ণু গোষ্ঠী গোটা নমঃশূদ্র জাতির জনসংখ্যার ২ শতাংশেরও কম ছিলেন"। এই শ্রেণিটি সংখ্যার দিক থেকেও কম ছিলেন, বাকি মহাজন শ্রেণি বন্ধুদের থেকেও অতি দুর্বল ছিলেন। সবচে' বড় কথা "...সামাজিক মর্যাদার দিক দিয়ে ছিলেন এতো নিচের দিকে, যে তাঁরাও উঁচুজাতের ভদ্রলোকের সঙ্গে নিজেদের একাত্ম ভাবতে পারতেন না।" তখনকার নানা ধরণের কৃষক বিদ্রোহ এবং ধর্মসংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে এদের পরিচয় ঘটছিল। কিন্তু বিশ শতকের গোড়াতে যাদের নেতৃত্বে বাংলাভাগের বিরুদ্ধে লড়াই গড়ে উঠছিল এবং সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদ রূপ পাচ্ছিল, শ্রেণি এবং বর্ণ দু'দিককার স্বার্থেই এরা তার সঙ্গে কোন ধরণের আত্মীয়তার খোঁজে পাননি। ফলে কলকাতা কেন্দ্রিক যেসব ধর্মসংস্কার আন্দোলন সেগুলোর প্রতিও কোনদিনই এরা আকর্ষণ বোধ করেননি। বিবেকানন্দ , অরবিন্দ এদের নেতা হয়ে উঠতে পারেননি কিছুতেই, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশব সেনদের তো প্রশ্নই উঠে না।

চাইলেই যে অন্ত্যজ জাতবর্ণের শ্রেণিগতভাবে উপরের লোকেরা বর্ণগতভাবে উপরের লোকজনের কাছাকাছি আসতে পারেন না, এর নজির দিতে গিয়ে শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, ১৮৭২-৭৩, এই সময়ে এক বিশিষ্ট নমঃশূদ্র গ্রামীণ নেতার মায়ের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে উঁচুজাতের লোকেরা আসতে অস্বীকার করেন। তার প্রতিবাদে ফরিদপুর –বাখরগঞ্জ এলাকার সমস্ত নমঃশূদ্ররা এই উঁচুজাতের সঙ্গে সমস্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছেদ করেন। এই লড়াই প্রায় ছ'মাস চলে। এই লড়াইএর সফলতা কিম্বা বিফলতাই তাঁদের উদ্বুদ্ধ করে নতুন ধর্মসম্প্রদায়ে নিজেদের সংগঠিত করতে। যার নাম 'মতুয়া।' এই ধর্মীয় লড়াই এক সময়ে এর প্রবর্তকের

পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুরের নেতৃত্বে আরও এগিয়ে যায় এবং ক্রমেই এক স্পষ্ট রাজনৈতিক রূপ পেতে থাকে। সেই রূপ পূর্ণতা পায় ১৯১২ তে Bengal Namasudra Association গঠনের মধ্যে দিয়ে। যা ক্রমে গিয়ে নানা বাঁকে এবং ফাঁকে আম্বেদকারের নেতৃত্বাধীন সর্বভারতীয় দলিত আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়েছিল। এবং এখনো জড়িয়ে আছে। সেই ইতিবৃত্ত অন্য। আপাতত শুধু একটি তথ্যের উল্লেখ করব যে ১৯১১-র আদমসুমারির পরে ১৯৩৬ অব্দি এই 'শূদ্র' শব্দটি বাদ দেবার জন্যেও অনেকে লড়েছিলেন। সফল হয়েছিলেন বলে কোন তথ্য আমাদের হাতে নেই। শেখর অবশ্যি ফরিদপুর জেলার গ্রামীণ নেতার নাম করেননি। নাম করেননি গুরুচাঁদের বাবা হরিচাঁদের। মতুয়া ধর্মের প্রবর্তক তিনিই । এবং সে আরও আগের ঘটনা। সুতরাং শেখর ঠিক কার মায়ের শ্রাদ্ধের ঘটনা লিখেছেন আমরা নিশ্চিত হতে পারিনি। ১৮১২ সনের ১১ মার্চ এখনকার বাংলাদেশের গোপালগঞ্জ জেলার ওড়াকান্দির পাশে সাফলিডাঙ্গা গ্রামে জন্ম নেন হরিচাঁদ ঠাকুর। তাঁর বাবার নাম ছিল যশোবন্ত ঠাকুর, মা অন্নপূর্ণা। পাঁচ সন্তানের তিনি দ্বিতীয়। তিনি 'হরিনামে মুক্তি' কথাটা বাকি বৈষ্ণবদের মতো প্রচার করলেন বটে কিন্তু সেই মুক্তিতত্ত্ব বাকি সহজিয়া বৈষ্ণবদের থেকেও সহজ। 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব'দের থেকে একেবারেই ভিন্ন। তাই এর নামও ভিন্ন। হরিনামে মাতোয়ারা—এমন এক ধারণার থেকে ধর্মসম্প্রদায়টির নাম হলো 'মতুয়া'। বর্ণগত ভাবে এঁরা মূলত বাঙালি দলিত নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের লোক, যদিও মতুয়া ধর্মে অন্যান্য বর্ণের লোকেরাও অনেকে দীক্ষা নিয়েছিলেন । মতুয়া ধর্মের মূল কথাগুলো বোঝা খুব কঠিন নয়। বৌদ্ধধর্মের অষ্টাঙ্গিক মার্গের আদলে হরিচাঁদেরও ছিল দ্বাদশ আজ্ঞাঃ

১) সদা সত্য কথা বলা।
২) পরস্ত্রীকে মাতৃজ্ঞান করা।
৩) পিতা মাতাকে ভক্তি করা।
৪) জগতকে প্রেমদান করা।
৫) পবিত্র চরিত্র ব্যক্তির প্রতি জাতিভেদ না করা

৬) কারো ধর্ম নিন্দা না করা।
৭) বাহ্য অঙ্গে সাধু সাজ ত্যাগ করা।
৮) শ্রীহরি মন্দির প্রতিষ্ঠা করা।
৯) ষড় রিপুর থেকে সাবধান থাকা।
১০) হাতে কাজ মুখে নাম করা।
১১) দৈনিক প্রার্থনা করা।
১২) ঈশ্বরে আত্ম দান করা।

সম্প্রতি এই ধর্ম নিয়ে প্রচুর লেখালেখি হচ্ছে, তর্ক বিতর্কও হচ্ছে 'মতুয়া' সমাজের বাইরেও, ভেতরে তো বটেই। কিন্তু হরিচাঁদের জীবৎকালে লিখিতভাবে কোন ধর্মাদেশ দাঁড় করাবার চেষ্টা ছিল না। তারক সরকারের 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' বইটি লেখা হলেও প্রকাশের অনুমতি দেননি হরিচাঁদ। বস্তুত পছন্দও করেননি। সুতরাং তাঁর ধর্মমত ছড়িয়েছিল লোকের মুখেমুখে, স্মৃতিতে, গানে, কীর্তন আসরে। বৈদিক অবতারতত্ত্ব, পাপ পুণ্য, স্বর্গ নরক, আচার বিচার কিছুতেই আস্থা রাখতেন না তারা। এমনকি যে 'হরি' নামের কথা বলা হচ্ছে তিনিও বৈষ্ণব হরির থেকে ভিন্ন। অনেকের মতে মতুয়া ধর্ম আসলে বাংলাদেশের প্রাক-বৈদিক বৌদ্ধধর্মের পুনরুত্থিত, পুণর্নির্মিত রূপ। একত্রে অনেকে মিলে নাম করলে প্রেমবোধ জাগে তাই এই নাম নেয়া। 'শ্রীশ্রী হরিলীলামৃতে' ও আছে, "বুদ্ধের কামনা তাহা পরিপূর্ণ জন্য/ যশোবন্ত গৃহে হরি হৈল অবতীর্ণ।"

১৮৩৩ নাগাদ প্রায় একুশ বছর বয়সে হরিচাঁদ স্থানীয় জমিদার এবং ব্রাহ্মণ্যশাসকদের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়ে জন্মগ্রাম ছেড়ে ওড়াকান্দি চলে আসেন। জমিদারদের দরিদ্র কৃষক লুণ্ঠনের ব্যাপারটিতো তিনি জানতেনই। কিন্তু এখানে এসেই তিনি উপলব্ধি করেন কলকাতার জমিদারদের বিলাসবৈভবের রহস্য। মাত্র তিনমাসের খোরাকি দিয়ে এরা গোটা বছর কৃষকের ঘাম ঝরিয়ে নিত। বেগার খাটাতো। এমনকি দাসের বাজারে কেনাবেচাও করে দিত গরীব চাষাদের। ১৮৪৬ নাগাদ এই দাসব্যবসা বন্ধ করে ফেলা ছিল মতুয়াদের প্রথম বড় সাফল্য। 'শাস্তিবিক্রি' নামে একটি অদ্ভুত প্রথা চালু ছিল বাংলাদেশে। বাবু জমিদারেররা খুন-রাহাজানির

মামলাতে জড়ালে দলিত অন্ত্যজ লোকেদের লোভ কিম্বা ভয় দেখিয়ে নিজের কাঁধে দায় নিয়ে বাবুদের বাঁচিয়ে দিতে বাধ্য করা হতো। হরিচাঁদের নেতৃত্বে এই কুপ্রথা এবং সেই সঙ্গে নরবলির বিরুদ্ধে প্রচার আন্দোলন শুরু হয়। লেখাই বাহুল্য যে নরবলির শিকার হতেন এই নমশূদ্রদের মতো দলিতেরাই। ফলে আশপাশের বিভিন্ন জেলাতে মতুয়াদের কথা ছড়িয়ে পড়ে। ধর্ম থেকে রাজনীতিকে আলাদা করবার ব্যাপারটি একটি ভবিষ্যতের স্বপ্ন এবং তা এর জন্যেই যে সামন্তসমাজে দু'টিকে আলাদা করে দেখাই কঠিন। যে মধ্যবিত্তরা শরৎচন্দের 'মহেশ' গল্পটি পড়েছেন তারা দেখেছেন কীভাবে জমিদারের জমির লোভের প্রকাশ ব্রাহ্মণের শাস্ত্রের দোহাই হয়ে প্রকাশ পায়। তাই একুশ শতকের কিছু শহুরে মধ্যবিত্ত যখন নির্বিচারের এই সব দলিতদের রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে ধর্মের বিচ্ছেদ আশা করেন, তখন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আসলেই তারা সামন্তপ্রভুদের স্বার্থকে সুরক্ষা দেন। তখনকার তো বটেই এখনো, বহু দলিত-আদিবাসী আন্দোলন থেকে তাই রাজনৈতিক কর্মসূচী এবং ধর্মের বিকাশকে স্বতন্ত্র করে দেখা এক কঠিন কাজ। লালন ফকিরকেও জমিদার শাসনের বিরুদ্ধে লাঠি নিতে হয়ে ছিল, তাও আবার যে সে নয়-- একেবারে বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারের বিরুদ্ধে। লালন ফকিরের গানগুলোতে সহজিয়া দেহতত্ত্ব আবিষ্কার করে আজকের বহু মধ্যবিত্ত মুগ্ধতার মধ্যে কিছু সত্য নিশ্চয় আছে, 'সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে' —র মতো গানের মধ্যে জাতবর্ণ বিরোধিতার তত্ত্বকে সম্প্রসারিত করে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ সন্ধানের মধ্যেও মিথ্যা কিছু নেই। কিন্তু এর মধ্যে আটকে থাকাটি হচ্ছে এক চূড়ান্ত মধ্যবিত্ত ভণ্ডামী। কেউ ব্যক্তিগতভাবে জাত না মানাবার দাবি করলেই জাত সংসার থেকে বিদেয় নেয় না। কথা হলো তার বিরুদ্ধে কোন সংগঠিত প্রতিরোধ গড়ে তোলা হচ্ছে কিনা। চাইলেই সেই প্রতিরোধের বাস্তবতা সর্বত্র নাও থাকতে পারে, তখন গ্রামীণ কৃষক সমাজে দেখা দেন লালনের মতো ব্যক্তিত্ব। তিনি প্রতিবাদী, কিন্তু নিষ্ক্রিয় প্রতিবাদী। উল্টোদিক থেকে এমন

প্রতিরোধ গড়ে উঠার সম্ভাবনা মাত্রকে নিরাকরণ করবার প্রয়াস চিরদিনই ছিল উচ্চবর্ণের দিক থেকে। দলিতদের উত্থান বিবেকানন্দকেও বিচলিত করছিল, কিন্তু তাঁর সমস্যা ছিল অন্যদিক থেকে। এগুলোকে তিনি সর্বভারতীয় জাতীয়তা নির্মাণের বাধা হিসেবে দেখছিলেন। তাই একদিকে যেমন উঁচু বর্ণের লোকদের ডেকে বলছেন, বলো চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই! অন্যদিক থেকে এই প্রশ্নও করছেন ব্রাহ্মণদের প্রতিষ্ঠা দেখে এতো ঈর্ষান্বিত হবার কি আছে? সংস্কৃত গ্রন্থাদি পড়ে তাদের টেক্কা দিলেই হলো। তিনি আশা করছেন, মৎসজীবির কাছে গিয়ে কেউ বেদান্ত ব্যাখ্যা করলেই সবার ভেতরে একই ঈশ্বর দেখে মৎসজীবি মুগ্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু এই কথাটি যে মৎসজীবির থেকে বেদান্তবাদী পণ্ডিত এবং তাঁদের অনুগামী শাসকশ্রেণির লোকেদের বেশি করে বোঝা দরকার, এবং না বুঝলে তার বিরুদ্ধে রীতিমত সংগঠিত প্রতিবাদটি দরকার এই সত্য বিবেকানন্দ বুঝতে চেয়েছেন বলে মনে হয় না। বরং এমন প্রতিবাদে কোন লাভ হবার নয় বলেই তিনি মত ব্যক্ত করেছেন, বৃটিশভারত বর্ণব্যবস্থাটিকে অপ্রাসঙ্গিক করে ফেলেছে বলে প্রশংসাও করছেন। যখন কিনা, বিনয় ঘোষের মতো মার্ক্সবাদী সমাজবিজ্ঞানীরা ১৯৭৮এ এসেও বৃটিশ ভারতে জাতবর্ণব্যবস্থা বিলীন হয়ে যাবে বলে স্বয়ং কার্ল মার্ক্সের অনুমানকেও নাকচ করে এক নতুন অধ্যায় জুড়ছেন তাঁর তিন দশক আগের লেখা 'বাংলার নবজাগৃতি' গ্রন্থে । হরিচাঁদ এবং তাঁর পরে গুরুচাঁদ সেই সংগঠিত প্রতিবাদের পথ ধরেছিলেন বলেই তাদের ধর্ম রাজনীতির চেহারা নিচ্ছিল, রাজনীতি ধর্মের। সেই প্রতিবাদের পথ ধরেছিলেন বলেই, বাকি বাঙালি সমাজ তাদের সম্পর্কে লালন করেছে এক আশ্চর্য নীরবতার নীতি।

সংগঠিত প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন বলেই, হরিচাঁদ কাউকে সন্ন্যাস নিতে বা তীর্থে যেতে মানা করেন। 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃতে' লেখা হচ্ছে, "সংসারে থেকে যার হয় ভাবোদয়। সেই সে পরম সাধু জানিবে নিশ্চয়।" সংসার এবং মানুষের বাইরে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করে বলা হচ্ছে, "যে যাহারে ভক্তি করে

সে তার ঈশ্বর/ভক্তিযোগে সেই তার স্বয়ং অবতার” কিম্বা, “বিশ্বভরে এই নীতি দেখি পরস্পর।/ যে যাহারে উদ্ধার করে সে তাহার ঈশ্বর।” সুতরাং কোন দীক্ষাও নেই, নেই গুরু গোঁসাই, “দীক্ষা নাই করিবে না তীর্থ পর্যটন।/ মুক্তি স্পৃহাশূণ্য নাই সাধন ভজন।।” গুরু গোঁসাই সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে হরিচাঁদের উক্তি, “কোথায় ব্রাহ্মণ দেখো কোথায় বৈষ্ণব।/ স্বার্থবশে অর্থলোভী যত ভণ্ড সব।।” গুরু গোঁসাইদের শাস্ত্রানুশাসনকে অমান্য করে তাঁর চরম অবস্থান, “কুক্কুরের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ পেলে খাই।/ বেদাবিধি শৌচাচার নাহি মানি তাই।।” এগুলো শুধু ব্রাহ্মণেরাই সহ্য করবেন না এমনতো নয়, গোটা সামন্তসমাজের শাসন মানিয়ে নেবার প্রাথমিক সর্ত এগুলো। স্বাভাবিক ভাবেই নিন্দা, অপপ্রচার, লাঠিয়াল দিয়ে পেটানো, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া, পুকুরে বিষ দেয়া, জোরে মাঠের ধান কেটে নিয়ে চলে যাওয়া এবং সর্বোপরি সামাজিক বয়কট হলো মতুয়াদের শায়েস্তা করবার জন্যে সামন্তশ্রেণির হাতিয়ার। বিপরীতে বাধ্য হয়ে লাঠিয়াল বাহিনী গড়ে তুলতে হয়েছিল মতুয়াদের। এর সঙ্গে ছিল নীলকর সাহেব এবং নায়েব গোমস্তাদের অত্যাচার। একবারতো এমন কিছু নায়েব এবং সাহেবদের নীলের কড়াইতে ফেলে সেদ্ধ করে ফেলেন এই লাঠিয়ালরা। সংকটে দীর্ণ মতুয়াদের বিয়ে শ্রাদ্ধে ব্যয় কমাতে নির্দেশ দিলেন হরিচাঁদ, “বিবাহ শ্রাদ্ধেতে সবে কর ব্যয় হ্রাস।/ শক্তির চালনা, সবে রাখো বারমাস।।” উৎপাদন ব্যবস্থার উপর চাষীদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা নিয়েও ভেবেছিলেন তিনি, “মন দিয়ে কৃষি কর, পূজ মাটি মায়।/ মনে রেখো বেঁচে আছ মাটির কৃপায়।।” চাষাদের আত্মমর্যাদাবোধ এবং আত্মনির্ভরশীলতা বাড়াতে বছরে তিনবার ফসল ফলাতে উদ্বুদ্ধ করলেন, “সর্বকার্য হতে শ্রেষ্ঠ কৃষি কার্য হয়।/ ত্রিফলা না করা আমাদের ভাল নয়।।” উদবৃত্ত অর্থকে ব্যবসায়ে খাটিয়ে ধনলাভে উৎসাহিত করতে নিজে শিখে অন্যকে শেখাতে শুরু করলেন, দরকারে অনেককে টাকা ধার দিতেও শুরু করলেন, “নিজহাতে ব্যবসা করেন হরিচাঁদ/বাণিজ্য প্রণালী শিক্ষা সবে কৈল দান।।”

পুত্র গুরুচাঁদকে উত্তর দায়িত্ব সমঝে দিয়ে ১৮৭৮এ হরিচাঁদ মারা যান। গুরুচাঁদের জন্ম ওড়াকান্দিতে ১৮৪৪এ। তিনি মারা যান ১৯৩৭এ। বাবা-ছেলের জীবৎ কাল ১২৫ বছর থেকে হরিচাঁদের ছেলেবেলার প্রথম একুশ বছর বাদ দিলেও বলা চলে উনিশ-বিশ শতকের একশত বছর জুড়ে মতুয়া ধর্মান্দোলন ছিল বাংলার অন্যতম প্রধান ধর্ম সংস্কার আন্দোলন। যদি ব্রাহ্ম ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের কথা মনে রাখি, তবে এতো দীর্ঘ নির্বিরোধ জীবন সেই ধর্মের ছিল না। এতো বিশাল সামাজিক সমর্থনও ছিল না ব্রাহ্মধর্মের। তারপরেও ব্রাহ্মদের চিনি, মতুয়াদের না । দায়িত্ব নিয়েই গুরুচাঁদ শিক্ষা বিস্তারে মন দিলেন। নিজের বাড়িতে পাঠশালা খুলে শুরু করলেন। তাঁর সম্পর্কে জানবার নির্ভরযোগ্য প্রথমবইটি লেখেন মহানন্দ হালদার, নাম 'শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ চরিত'। এটি প্রকাশিত হয় ১৯৪৩এ। গুরুচাঁদ সবাইকে নির্দেশ দিলেন, "সবাকারে বলি আমি যদি মানো মোরে।/ অবিদ্বান পুত্র যেন নাহি থাকে ঘরে।।" এই শিক্ষান্দোলনের পাশে তিনি বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে মানুষকে কাছে টেনে নেন। "নম সাহা তেলি মালি আর কুম্ভকার।/ কাপালি মাহিষ্য দাস চামার কামার। পোদ আসে তাঁতি আসে আসে মালাকার।/ কতই মুসলমান আসে ঠিক নাহি তার।।" মেয়েদের জন্যেও সমানে আলাদা উদ্যোগ নেন, " নারী শিক্ষার তরে প্রভু আপন আলয় শান্তি সত্যভামা নামে স্কুল গড়ি দেয়।।" রবীন্দ্রনাথ যেমন শ্রীনিকেতনের প্রথম দিককার দিন গুলোতে বৃটিশ কৃষিবিজ্ঞানী এবং সমাজসেবি লিওনার্ড এলমহার্ষ্টকে নিয়ে এসছিলেন, গুরুচাঁদ তেমনি এক অস্ট্রেলিয় মিশনারি ডাঃ সি.এস.মিডকে সঙ্গে পেয়ে যান। দরিদ্র অন্ত্যজদের মধ্যে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ছড়াবার ব্যাপারে এই ভদ্রলোক ছিলেন আন্তরিক। তাঁর বিরুদ্ধে খৃষ্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত করবার অপপ্রচার ছিল, কিন্তু স্বপক্ষে সাক্ষী বেশি নেই। বরং ১৯০৬ থেকে গুরুচাঁদের সঙ্গে আলাপ এবং বন্ধুত্বের পরে থেকে সেই সম্পর্ক ছিল অটুট। শুধু তাই নয়, ১৯০৮এ ওড়াকান্দিতে এই দু'জনের প্রচেষ্টাতে যে উচ্চ ইংরাজি স্কুল

যাত্রা শুরু করে শতাব্দ প্রাচীন সেই স্কুলের নাম ‘ওড়াকান্দি মিড হাইস্কুল’ রেখে মতুয়ারা তাঁকে স্মৃতিতে ধরে রেখেছেন। শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের ব্যাপারে মিড অভিজ্ঞ মানুষ, তার উপর সরকারি মহলে তাঁর খাতির ছিল। গুরুচাঁদ বুঝেছিলেন তিনি যে কাজ করতে যাচ্ছেন তাতে দু’টোরই সমান দরকার। তাঁর সেই বোধে ত্রুটি ছিল না, ঘটনাক্রম তা প্রমাণ করেছে। নারী-পুরুষদের জন্যে আলাদা স্বাস্থ্যকেন্দ্রও গড়ে উঠতে শুরু করল ওড়াকান্দি এবং আশপাশের এলাকাতে। একই সঙ্গে তাঁর নেতৃত্বে চলে বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ বিরোধী প্রচার আন্দোলন। তখন থেকেই নমঃশূদ্র শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের জন্যে সরাকারি চাকরিতে ভাগীদারির দাবি উঠতে থাকলে অনেকেই মনুর বিধান শুনিয়ে আটকে দিচ্ছিলেন। ১৯০৭এ সরকার প্রথম আইন করে অন্ত্যজ এবং মুসলমানদের জন্যে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করলে গুরুচাঁদ ঠাকুরের ছেলে শশীভূষণ ঠাকুর সাবরেজিস্টার পদে যোগ দিতে পারেন।এর আগে নানা ভাবে চেষ্টা করেও তিনি কোন চাকরি পেতে ব্যর্থ হচ্ছিলেন। ১৯০৮এ কুমুদ বিহারি মল্লিক ডেপুটি রেজিস্টার পরে এবং তারিনী বল সরকারি ডাক্তার হিসেবে চাকরিতে যোগ দেন।

‘চণ্ডাল’রা সরকারি চাকরিতে আসছেন, পঞ্চায়েত পুরসভাতে যোগ দেবার সম্ভাবনা বাড়ছে এই ব্যাপারটি উঁচু বর্ণের লোকেরা ভালোভাবে নিচ্ছিলেন না। স্বাভাবিক ভাবেই মনুর বিধান ডিঙিয়ে সাহেবদের প্রশ্রয়ে অন্ত্যজ বর্ণের মানুষের ব্রাহ্মণ , ক্ষত্রিয় মর্যাদাতে উন্নীত হবার আকাঙ্খা দাবিও বাড়তে থাকে। জয়া চ্যাটার্জী লিখেছেন, ১৯১১তে আদমশুমারি কর্তৃপক্ষের কাছে এমন দাবি জানিয়ে এতো সব জনগোষ্ঠী স্মারকপত্র জমা দেন যে সব মিলিয়ে এগুলো ওজনে দাঁড়িয়েছিল এক মণের বেশি। নমঃশূদ্ররা তখন নিজেদের কায়স্থ বলে দাবি করলে কায়স্থরা সেটির বিরোধিতা করেন। তাতে কায়স্থদের সামাজিক ভাবে বয়কট করেন নমঃশূদ্ররা। গোয়ালারা নিজেদের বৈশ্য বলে দাবি করলে সম্ভ্রান্ত হিন্দুরা অনেকে গোয়ালাদের ছেড়ে মুসলমানদের থেকে দুধ কিনে খেতে শুরু করেন। ডাঃ মিডকে পাশে নিয়ে

তখন অন্তত 'চণ্ডাল'দের জন্যে 'নমঃশূদ্র' নামটি আদায় করে নিতে সমর্থ হন গুরুচাঁদ। যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল একেবারেই ধর্মসংস্কার এবং কৃষকবিদ্রোহের রূপে সেটি তখন রীতিমত আইনী রাজনৈতিক সংগ্রামের দিকে এগুতে শুরু করে। গুরুচাঁদ অনুভব করেন, " যে জাতির দল নেই/ সেই জাতির বল নেই/ যে জাতির রাজা নেই/ সে জাতি তাজা নেই।" তাঁর আহ্বান, "বিদ্যা যদি পাও কাহারে ডরাও/ কার দ্বারে চাও ভিক্ষা।/ রাজশক্তি পাবে বেদনা ঘুচিবে/ কালে হবে সে পরীক্ষা।" সে রাজনীতি গুরুচাঁদের মৃত্যু অব্দি পরিচালিত হয়েছিল একেবারেই কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন জাতীয় আন্দোলনের বিরুদ্ধে। বরং ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টির সঙ্গে শুরু থেকেই তাদের ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল। এরই ধারাবাহিকতাতে কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন তেভাগা আন্দোলনেরও বড় সমর্থন ভিত্তিটিই ছিলেন এই নমশূদ্ররা । বাকি বড় অংশটি রাজবংশী কৃষক। ১৯৩৭ গুরুচাঁদের মৃত্যুর আগে পরে মতুয়া ধর্মান্দোলনের যেমন নানা মতভেদ দেখা দিতে শুরু করে তেমনি রাজনৈতিক মত এবং পথও নানা শাখাতে বিভাজিত হয়ে যায়। যে বিভাজন এখনো সমানে সক্রিয়। কিন্তু তারপরেও এটা ঠিক যে গুরুচাঁদের এই উদ্যোগের ফলেই ১৯৩৭এর নির্বাচনে বাংলা থেকে ৩২ জন প্রতিনিধি নানা পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর থেকে নির্বাচিত হলে তাঁর মধ্যে ১২ জনই ছিলেন নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের। তাঁদের মধ্যে কয়েকটি নাম ইতিহাস প্রসিদ্ধ—যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, বিরাট চন্দ্র মণ্ডল, প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর প্রমুখ। আম্বেদকারের নেতৃত্বাধীন সর্বভারতীয় দলিত আন্দোলনের সঙ্গেও জড়িয়েছিলেন অনেকে। তাদেরই সমর্থনে আম্বেদকর গণপরিষদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। স্বাধীনতার আগের শেষ দশকে যে বিচিত্র রাজনৈতিক ডামাডোলে বাংলাদেশ প্রবেশ করে, তাতে নমঃশূদ্র সমাজের আগেকার ঐক্য রাখাটাও কঠিন ছিল। তার উপরে শিক্ষিত শ্রেণিটির সংখ্যা বাড়তে থাকাতে তাঁদের অনেকে সাংবিধানিক রাজনীতিতে বেশি করে জড়াতে গিয়ে বাকি কৃষকজনতার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে

পড়েন। সেই নেতৃত্বের কেউ মুসলিম লীগ, কেউ জাতীয় কংগ্রেস এবং অনেকে হিন্দু মহাসভারও ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েন। বিশেষ করে গুরুচাঁদের পৌত্র প্রমথ ঠাকুরর ভূমিকা তখন থেকেই প্রশ্নবিদ্ধ হতে শুরু করে। সেটি হতে পারে অধ্যয়নের এক স্বতন্ত্র অধ্যায়। কিন্তু যে দুর্বিপাকের কথাটি না বললেই নয়, তা এই যে হিন্দু মহাসভা এবং কংগ্রেসের সঙ্গে যাওয়া বড় অংশটি আশা করেছিলেন বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর, খুলনা ইত্যাদি পূব বাংলার নমঃশূদ্র অধ্যুষিত জেলাগুলো পশ্চিম বাংলাতে চলে যাবে। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল প্রথমে শরৎ বসু, ফজলুল হকের প্রস্তাবিত 'অখণ্ড বাংলা'র প্রস্তাবের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। পরে মুসলিম লীগ এবং পাকিস্তানের প্রস্তাবের সঙ্গে দাঁড়িয়েছিলেন। দু'পক্ষই প্রবঞ্চিত হয়েছিলেন। পাকিস্তানে প্রবঞ্চিত হয়ে পঞ্চাশের গণহত্যার পরে লিয়াকৎ আলি খানের মন্ত্রীসভার থেকে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের পদত্যাগ এবং ভারতে চলে আসা মাঝেমধ্যে বেশ চর্চিত হয়। বস্তুত দু'দেশের শাসক শ্রেণিই বাধ্য করে নমঃশূদ্রদের বড় অংশকে উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে চলে আসতে। এবং বাকি বর্ণহিন্দুরা যখন ভারতে নিজের ব্যবস্থা যা হোক একটা করে নিতে সমর্থ হয়েছেন নমশূদ্রদের কিন্তু বাসাবাটির সন্ধানে ছড়িয়ে পড়তে হয়েছে সাগরে আন্দামান থেকে পাহাড়ে উত্তরাখণ্ড অব্দি গোটা ভারতে। অসমেও এসছেন বিশাল সংখ্যক নমঃশূদ্র মানুষ। সিলেট ভাগের সময়েই এই নমঃশূদ্রদের অবস্থান ছিল দ্বিধাজড়িত। অনেকেই সিলেট ভাগের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। এক দশক আগেও ১৯৩৭-৩৮এ সিলেটের হবিগঞ্জ মহকুমাতে শিমুলঘর গ্রামে বর্ণহিন্দুদের উপস্থিতিতে শুধুমাত্র জুতো পরবার অধিকার আদায়ের জন্যে এক বড়সড় লড়াইতে নামতে হয়েছিল নমঃশূদ্রদের। যা পরে হিংসাত্মক রূপ নিয়েছিল। সিলেট গণভোটের সময়ে তাৎক্ষণিক ভাবে পংক্তিভোজনে বসে সেই দলিতদের মন জয় করতে নেমেছিলেন বর্ণহিন্দু নেতৃত্ব। সিলেট ভাগের দায় যারা এক তরফা অসমিয়া উগ্রজাতীয়তাবাদীদের উপরে চাপান তাঁরা নিজেদের এই দায়কে নিয়ে খুব বেশি মাতামাতি করেন না।

এখনো জল জমির অধিকারের সঙ্গে নাগরিক অধিকার, সংরক্ষণ এবং ভাষা সংস্কৃতির জন্যে নমঃশূদ্রদের লড়ে যেতে হচ্ছে শুধু অসমেই নয়, গোটা ভারতেই। অসমে ডি-ভোটার তাদেরকেই বেশি হতে হয়। মরিচঝাঁপির কুখ্যাত হত্যাকাণ্ডের শিকার হতে হয়েছে নমঃশূদ্রদেরই। দেশভাগ এবং বাংলার সবচে' বড় দলিত জনগোষ্ঠী এই নমশূদ্রদের দেশময় ছড়িয়ে পড়া একটি অন্যতম কারণ যে দেশভাগের আগে বাঙালি সমাজে গড়ে উঠা দলিত আন্দোলন পরবর্তী দশকগুলোতে বেশ চাপা পড়ে গেছিল।

মতুয়া ধর্মান্দোলনে এখন অনেক বিভাজন। অনেকেই হতাশ হয়ে সরাসরি আম্বেদকরের শুরু করা নববৌদ্ধ ধর্মান্দোলনের দিকে ঝুঁকছেন। মতুয়াদের বড় দুই ভাগের একটি 'শ্রীশ্রী হরি-গুরুচাঁদ মতুয়া মিশনে' অধীনে পরিচালিত হয়। এর প্রধান কেন্দ্রটি এখনো বাংলাদেশের ওড়াকান্দিতেই রয়েছে। গুরুচাঁদের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৌত্র শ্রীপতিপ্রসন্ন ঠাকুর পরম্পরা হয়ে মিশনের নেতৃত্ব এখন রয়েছে পদ্মনাভ ঠাকুরের হাতে। শ্রীপতি প্রসন্নের সঙ্গে বিবাদ বাঁধে অপর পৌত্র প্রমথ রঞ্জন ঠাকুরের। তিনি গুরুচাঁদের মৃত্যুর পরে প্রথমে রামদিয়াতে চলে এসে ১৯৪০এ মতুয়া মহাসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। এর প্রধান কেন্দ্র এখন রয়েছে পশ্চিম বাংলার উত্তর চব্বিশ পরগণার ঠাকুরনগরে। নেতৃত্বে রয়েছেন প্রমথ রঞ্জনের স্ত্রী বীনাপাণি দেবী, যাকে মতুয়ারা 'বড়মা' বলে সম্মান করে থাকেন। দু'টো সংগঠনেরই এখন দেশে বিদেশে প্রচুর শাখা রয়েছে। ওড়াকান্দির মিশন গুরুচাঁদের জীবিতাবস্থাতেই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। কিন্তু সেটি কতটা তাঁর ইচ্ছেতে এবং কতটা তাঁর পুত্র-পৌত্রেরা চাপ দিয়ে করিয়ে নিয়েছিলেন সেই নিয়ে সন্দেহ আছে। মিশনের সাইটেই অসীম কুমার রায়ের একটি দলিলে লেখা আছে, "শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুর প্রস্তাবটি শুনে বলেন এটি করার সময় এখনও হয়নি।" ভারতের মতুয়া সঙ্ঘের কাজকর্ম বড়মার অনুগামীদের রাজনৈতিক সারশূন্য 'উৎসবপ্রীতি' নিয়ে মতুয়ারাই নানাভাবে প্রশ্ন তুলে থাকেন। বাংলাদেশের মিশনের কাজকর্ম দেখলেও মনে হয় না

তাঁরা হরিচাঁদ গুরুচাঁদের আদর্শে আর ততটা টিকে আছেন। মতুয়াদের ব্রাহ্মণ্য 'সনাতন' ধর্মের একটি অংশে পরিণত করবার প্রক্রিয়া প্রায় সম্পূর্ণ করেছেন। হরিচাঁদ-গুরুচাঁদকে 'ভগবান' তুল্য মনে করছেন, ছেলের দেহে বাবার অলৌকিক নিবাসের তত্ত্বে বিশ্বাস ছড়াচ্ছেন, গুরুচাঁদকে 'শিব' বলে প্রচার করছেন —এইসবের পরে আর আমরা উপরে মতুয়া হরিচাঁদের যে দ্বাদশ আজ্ঞার কথা জেনে এলাম সেগুলোর কোন মানে থাকে না। মিশন নিয়ে গুরুচাঁদের উপরে পারিবারিক চাপ সৃষ্টির কথা আমরা অহেতুক বলিনি। দেখা যাচ্ছে, সমস্ত ব্রাহ্মণ্য পরম্পরার বিরোধী ব্যক্তিত্ব গুরুচাঁদের বাড়িতে দুর্গাপুজোর প্রচলন করছেন তাঁর পুত্র পৌত্রেরা এবং সঙ্গে জুটছেন সমাজের প্রভাবশালী ভক্তেরা। অর্থাৎ নিজের পরিবার এবং সমাজের ভেতরেও ব্রাহ্মণ্য অভ্যাসের বিরুদ্ধে তাঁকে লড়তে হচ্ছে নিজের আদর্শকে দাঁড় করাতে গিয়ে। যে দুর্গাপূজা হতো মূলত উঁচু বর্ণের জমিদার জোতদার সরকারি আমলাদের বাড়িতে, সেই পুজো নিজের বাড়িতে করে সামাজিক মর্যাদা বাড়াবার কথা ভাবছেন নতুন আমলাতন্ত্রের শরিক হতে উন্মুখ ছেলেরা। উঁচু বর্ণের বাড়ির পুজোতে অন্ত্যজদের প্রবেশ জুটত না, সুতরাং নিজেরা পুজো করে জবাব দেবেন এই ছিল ইচ্ছে। তার উপর শশীভূষণের চার মেয়ের পরে এক ছেলে প্রমথ রঞ্জন জন্মান। সেই আনন্দে তিনি বাড়িতে দুর্গাপুজোর অনুমতি চাইলে প্রথমে গুরুচাঁদ তা দেননি। ছেলে অনশন শুরু করলে এবং আরও নানাজনকে দিয়ে চাপে ফেললে বাবা অনুমতি দেন এবং ১৯০২তে প্রথম ওড়াকান্দির বাড়িতে দুর্গা পুজো হয়। কল্পতরু ভট্টাচার্য বলে এক ব্রাহ্মণ এসে সেই পুজোর দায়িত্বও নিয়ে নেন। তিনি বুঝি চণ্ডীর আদেশ পেয়েছেন স্বপ্নে। এই কথা আবার সগৌরবে লেখেন 'শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত' প্রণেতা তারকচন্দ্র সরকার। এই ঘটনা দেখায় কোন পথে ব্রাহ্মণ্যবাদ আপসে নামে প্রতিবাদী একটি পন্থার সঙ্গে। ডাঃ মিডের সঙ্গে আলাপের পরে ক'বছর আবার বন্ধ থাকে এই পুজো। কিন্তু আবার পারিবারিক চাপ বাড়ে , "দশভূজা পূজা মোরা করি পুনরায়। , দেবী পূজা হলে

তাতে সর্বশক্তি হয়।” গুরুচাঁদ, “ প্রভু বলে এই কার্য আমি না করিব।/ মরণের ভয়ে শেষে দেবতা ডাকিব।।” কিন্তু চাপের কাছে তাঁকে নতি স্বীকার করতে হয়। ১৯১৪ থেকে আবার পুজো চালু হয়। পুজোর তিনদিন তিনি বাড়িতে থাকতেন না, পুজোর কোন অনুষ্ঠানে অংশ নিতেন না।

বস্তুর সরলরৈখিক কোন আন্দোলন হতেও পারে না। সেই বৌদ্ধ ধর্মের দিন থেকে ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী সমস্ত ধর্মান্দোলন প্রয়াসেই ভারতে দেখা গেছে তাকে ভেতর থেকেও ব্রাহ্মণ্য ধারার সঙ্গে লড়তে হয়েছে। এবং শেষ অব্দি ব্রাহ্মণ্যধারা তাকে গ্রাস করেছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনেও দেখা গেছে নিত্যানন্দ পত্নী জাহ্নবা দেবী রাধা-কৃষ্ণের যুগলমূর্তির প্রতিষ্ঠা করে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের ‘স্বকীয়া-বৈধী’ অভিমতের কাছে আত্মসমর্পণ করলে পরে তাঁর আত্মজ রামচন্দ্র সরে দাঁড়ান মায়ের থেকে। মায়ের গুরু পরম্পরার উত্তরাধিকার বহন করেন সৎ-পুত্র বীরভদ্র। মতুয়া ধর্মে এই প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছিল হরিচাঁদের জীবিতাবস্থাতেই। যে ‘শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত’ গ্রন্থটিকে এখন বহু মতুয়া তাঁদের আদি ধর্মগ্রন্থ বলে শ্রদ্ধার সঙ্গে পাঠ এবং অনুসরণ করে থাকেন, সেটি লিখতে মানা করেছিলেন স্বয়ং হরিচাঁদই। কথাটি এই গ্রন্থেই আছে। তারক চন্দ্র সরকারকে কবি নিযুক্ত করে এই গ্রন্থটির পরিকল্পনা আসলে করেছিলেন অন্য দুই ধর্মগুরু মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস এবং দশরথ বিশ্বাস। তাঁরা যখন নিজেরাই খানিক লিখে হরিচাঁদকে পড়িয়ে অনুমোদন আনতে যান, তিনি মানা করে বলেন, “… লীলাগীতি লেখা এবে উচিৎ না হয়।।/ ক্ষান্ত কর লেখালেখি বাহ্য সমাচার।/ অন্তরের মাঝে রাখো আসন আমার।” একজন যথার্থ বৌদ্ধ-বাউল সহজীয়া পরম্পরার গুরুর মতো নির্দেশ ছিল। জেদ ধরেলে হরিচাঁদ উষ্মা প্রকাশ করেন এই ভাষাতে, “ মহাপ্রভু বলে জান এ কর্ম্মে পুরস্কার।/ কুষ্ঠ ব্যাধি হবে চেষ্টা করিলে আবার।” এই ঘটনাতে মৃত্যুঞ্জয়-দশরথ জুটি ভয় পাননি, বইটির অষ্টম সংস্করণের ভূমিকাতে আছে মৃত্যুঞ্জয় বুঝি এই অভিশাপকে সাদরে গ্রহণ করেন, “সে তো আমার জীবনের লীলাগীতি লেখার পরম পুরস্কার।” কিন্তু

কবি তারক চন্দ্র সরকার ভয় পেয়ে গেছিলেন। তিনি আধখানা লেখা পাণ্ডুলিপি লুকিয়ে রাখেন। পরে যখন শেষ করেন তখন এক ব্রাহ্মণ্য গল্প জুড়ে দেন, সেই পাণ্ডুলিপি বুঝি সরিয়ে ফেলেছিলেন দেবী সরস্বতী। হরিচাঁদের মৃত্যুর পরে আবার সেই সরস্বতী স্বপ্নে এসে তাঁকে পাণ্ডুলিপি ফেরত দিয়ে যান, সেই সঙ্গে গ্রন্থ শেষ করবার জন্যে হরিচাঁদের ইচ্ছে জানিয়ে যান। তাতেও 'মূঢ়মতি' তারক খুব উৎসাহ দেখান না লেখা শেষ করতে। শেষে মৃত্যুঞ্জয়-দশরথদের সহযোগী গোলক গোঁসাই এসে জানান, "স্বপনেতে কেহ যদি পুঁথি করে দান/ সেজন পণ্ডিত হয় পুরাণে প্রমাণ।" আরও জানান, তারকনাথের প্রতি ব্রাহ্মণদের সমর্থন আছে, " ইতিনায় ভট্টাচার্য পাড়া হয় গান।/ সুকবি বলে তোরে দিয়াছে আখ্যান।" এতো সবেও যখন তারকনাথ সাহসী হন না, তখন গোলক গোঁসাই এক ভোর রাতে রীতিমত নৃসিংহ রূপে এসে তারকনাথের বুকে নখ ঢুকিয়ে শাসিয়ে দিলেন, " ...বলে তোরে নখে চিরি করি খান খান।/ নৈলে 'শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত' পুঁথি আন।।" বোঝা যায়, ইতিমধ্যে মতুয়া ধর্মের জনপ্রিয়তাকে মূলধন করে যারা আখের গোছাতে চাইছিলেন তাঁরা এর রাজনৈতিক সারবস্তুকে বিসর্জন দিয়ে একেবারেই ব্রাহ্মণ্যধারার গুরু হয়ে বসতে উদ্গ্রীব ছিলেন। তাঁরাই প্রবল চাপে এই গ্রন্থ লেখান। আজ অনেক মতুয়া ধর্মাবলম্বী বুদ্ধিজীবিরা একে 'স্বগোষ্ঠীর প্রতি অমার্জনীয় অপরাধ বলে' মনে করছেন। এবং নতুন করে ভাবছেন। এতো গেল ভেতর থেকে 'ব্রাহ্মণ্যবাদী' চাপের কথা।

কিন্তু বাইরে থেকে যে চাপ ছিল, সেটি আরও ভীষণ এবং আরও লজ্জার। হরিচাঁদের জীবিতাবস্থাতে বইটি ছাপার মুখ দেখেনি। তিনি মারা যান ১৯১৪তে। ১৯১৬তে বইটি ছাপান তাঁর কবিয়াল শিষ্য হরিবর সরকার। সম্প্রতি ২০১০এ ডা: মণীন্দ্রনাথ বিশ্বাস 'হরি-গুরুচাঁদ চেতনামঞ্চের উদ্যোগে' 'হরিচাঁদ তত্ত্বামৃত' নামে একটি বই লিখে বের করেছেন। সেখানে জানা যাচ্ছে, 'শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত'প্রকাশে গুরুচাঁদেরও আপত্তি ছিল, ছেলে শশীভূষণ ঠাকুরের চাপে

সম্মতি দেন। “গুরুচাঁদ সম্মুখেতে আনা হলপুঁথি ।/শশীবাবু প্রতি পাতা দেখে পাতি পাতি ।।/গুরুচাঁদে পড়ে পড়ে শুনাল এ গ্রন্থ ।/গ্রন্থের বন্দনা থেকে একেবারে অন্ত ।।/পড়া শুনে গুরুচাঁদ ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস ।/কিছু কিছু ভাব তত্ত্বে হইল হতাশ ।।... লেখা যায় যাহা ইচ্ছা সাদা কাগজেতে ।/কালি লেখা কাগজেতে লেখে কিবা মতে ।।/সেই মত ভুল তত্ত্ব শেখে যদি জাতি ।/কোনদিনও কাটিবে না এ আঁধার রাতি ।।/ঠিক তত্ত্ব বুঝানো তো হবে বড় দায় ।/আমি সারা হই ভেবে সেই আশঙ্কায়।।” বইটিতে হরিচাঁদ-গুরুচাঁদের ‘মতুয়া’ তত্ত্ব ছিল না তা নয়, কিন্তু আদিঅন্ত ‘বৈদিক অলীক গল্পে’র মিশেল রয়েছে। তার উপর সমস্যা হলো তখন অব্দি যদিও ‘নমশূদ্র সুরিৎ’ এর মতো বহু সাময়িক কাগজ বেরুচ্ছে নানা কেন্দ্র থেকে, তারকচন্দ্রের মতো সম্মানিত কবি ছিলেন না সমাজে । সুতরাং ভবিষ্যত লেখকেরা এর থেকে সত্যিকার কাঠামো একটা দাঁড় করিয়ে দেবেন এই আশাতে গুরুচাঁদ সম্মতি দিয়ে দেন। বাপ-ছেলেতে কথা হয় এরকমঃ “শশী বলে গ্রন্থে বাবা ধোঁয়া যদি রয় ।/গুরুচাঁদ বলে অগ্নি খুঁজিবে নিশ্চয় ।।/শশী বলে থাকে থাক কিছু জল অংশ ।/গুরুচাঁদ বলে ছেঁকে খাবে রাজহংস।।” বইটির প্রকাশিকা অনিতা বিশ্বাস তারক চন্দ্রের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা নিয়েই লিখছেন, প্রবল দারিদ্র্যে তাঁর শৈশব কেটেছে। কবিয়াল পরিবারে জন্মেছেন। বৈদিক কথিকা পাঠ আর গান করেই তিনি বেড়ে উঠেছিলেন। তার উপর নবদ্বীপের বৈষ্ণবদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা জন্মেছিল। হরিচাঁদের সঙ্গে পরিচয়ের পরেই তাঁর মধ্যে যে বিশ্বাসের দ্বন্দ্ব শুরু হয় তার ছাপ রয়েছে বইটির পাতায় পাতায়। এই দ্বন্দ্বের জন্যেই বইটি লিখতে তাঁর এতো দ্বিধা ছিল। কিন্তু মূল পাণ্ডুলিপির উপরে কলম চালাতে হয়েছিল সম্পাদক হরিবর সরকারকেও। শ্রীগোপাল বলে এক ভক্ত টাকার যোগান ধরলে হরিবর সরকার কলকাতার প্রেসে প্রেসে ঘোরেন বইটি ছাপাবার জন্যে। কিন্তু কেউই রাজি হয় না। অনেকে এর ‘বেদ-ব্রাহ্মণ সম্মত’ সংস্কার করে আনতে পরামর্শ দেন। “কোলকাতা প্রতি প্রেসে করে অনুরোধ ।/সর্বস্থানে পান

তিনি সম প্রতিরোধ ।।/প্রচারে বৈদিক শাস্ত্র ছিল যে সমিতি ।/ বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা সপ্তসতী স্মৃতি ।।/ইহাদের ছাড়পত্র আগে প্রয়োজন ।/তবেই করিবে প্রেস এ গ্রন্থ মুদ্রণ ।।" সমিতিটির নাম লেখেননি ডাঃ মনীন্দ্রনাথ বিশ্বাস । কিন্তু তাঁরা অনুমতি দেননি, "...নিষেধাজ্ঞা জারি করে গ্রন্থ ছাপিবারে ।।/চিহ্নিত করিল গ্রন্থে বহু জায়গার ।/বলে আগে এই সকলি কর সংস্কার ।।/বৌদ্ধতত্ত্ব বুদ্ধকথা না থাকে পুঁথিতে ।/অবৈদিক ভাবধারা হইবে মুছিতে ।।" বিবেকানন্দ বলছিলেন, শূদ্রদের সংস্কৃত অধ্যয়নে মানা করেছে কে! তাঁর মৃত্যুর পরেও 'নবজাগৃত' মহানগর কলকাতার ছাপাখানাগুলোর বাস্তবে ছিল এমনি অবস্থান। বিপাকে পড়ে হরিবর গেলেন শ্রীগোপালের সঙ্গে শলা করতে। আম ছাড়া আমসত্ব কী করে তৈরি করবেন তিনি? শ্রীগোপাল টাকা দিতে পারেন, কিন্তু তাঁরও অবদমিত সামাজিক অবস্থান বোঝা যায়, এই উক্তিতে, "পড়িয়াছি হেন ফাঁদে উপায় তো নাই ।।/কিছু কিছু জায়গায় কর সংস্কার।/ দৃষ্টিমাত্রে দৃষ্ট হয় হেন দরকার।।/স্থূলের ভাবভঙ্গি রাখিও বৈদিক।/সূক্ষ্মভাবে ঠিক রেখো অবৈদিক দিক ।।/ভাবীকালে সত্য ঠিক খুঁজিবে পাঠক।/জাতি মাঝে জন্ম লবে তাত্ত্বিক রচক।।" সুতরাং যা দাঁড়ালো, "...লীলামৃতে বহুস্থান সংস্কার করে।।/অলীকের গল্প যাহা গ্রন্থে দেখা দিল।/পরিস্থিতি চাপে সব প্রক্ষিপ্ত হইল।।" এতো সব করবার পরেও যে প্রেস এক বইটি ছেপেছিল তার ম্যানেজার তাঁদের থেকে কুড়ি টাকা ঘুষ নিয়েছিল। সত্যি সত্যি শ্রীগোপাল এই সূক্ষ্মভাবে 'অবৈদিক দিক' ঠিক রাখার কথাগুলোই বলেছিলেন কিনা, আজ আর আমাদের জানবার উপায় নেই। কিন্তু একুশ শতকে এসেও যখন একজন নবীন 'তাত্ত্বিক রচকে'র কলমে এই কথাগুলো পড়ি, তখন মনেতো হয়ই আমাদের 'অন্ধকার মধ্যযুগে'র বিরুদ্ধে যত ধিক্কার , 'আলোকিত আধুনিকতা' নিয়ে যত বড়াই কিম্বা তাত্ত্বিক কচকচানি সবই আসলে পশ্চিমা আদলে নিজেদের স্বার্থে নির্মিত এক কৃত্রিম আখ্যান। যে সামাজিক-রাজনৈতিক প্রয়োজন হাজার বছর আগেকার বৌদ্ধ কবিদের চর্যাপদের ভাষাকে 'সান্ধ্যভাষা' করে ফেলতে বাধ্য করেছিল,

তার থেকে স্থানে এবং কালে খুব বেশি একটা এগোইনি আমরা। বাংলার তথা ভারতের 'নবজাগরণে'র দর্প আমাদের মানায় না।

হিন্দু মহাসভা এবং কংগ্রেসের সঙ্গে যাওয়া বড় অংশটি আশা করেছিলেন বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর, খুলনা ইত্যাদি পূব বাংলার নমঃশূদ্র অধ্যুষিত জেলাগুলো পশ্চিম বাংলাতে চলে যাবে। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল প্রথমে শরৎ বসু, ফজলুল হকের প্রস্তাবিত 'অখণ্ড বাংলা'র প্রস্তাবের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। পরে মুসলিম লীগ এবং পাকিস্তানের প্রস্তাবের সঙ্গে দাঁড়িয়েছিলেন। দু'পক্ষই প্রবঞ্চিত হয়েছিলেন। পাকিস্তানে প্রবঞ্চিত হয়ে পঞ্চাশের গণহত্যার পরে লিয়াকৎ আলি খানের মন্ত্রীসভার থেকে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের পদত্যাগ এবং ভারতে চলে আসা মাঝেমধ্যে বেশ চর্চিত হয়। বস্তুত দু'দেশের শাসক শ্রেণিই বাধ্য করে নমশূদ্রদের বড় অংশকে উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে চলে আসতে। এবং বাকি বর্ণহিন্দুরা যখন ভারতে নিজের ব্যবস্থা যা হোক একটা করে নিতে সমর্থ হয়েছেন নমশূদ্রদের কিন্তু বাসাবাটির সন্ধানে ছড়িয়ে পড়তে হয়েছে সাগরে আন্দামান থেকে পাহাড়ে উত্তরাখণ্ড অব্দি গোটা ভারতে। অসমেও এসছেন বিশাল সংখ্যক নমঃশূদ্র মানুষ। সিলেট ভাগের সময়েই এই নমঃশূদ্রদের অবস্থান ছিল দ্বিধাজড়িত। অনেকেই সিলেট ভাগের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। এক দশক আগেও ১৯৩৭-৩৮এ সিলেটের হবিগঞ্জ মহকুমাতে শিমুলঘর গ্রামে বর্ণহিন্দুদের উপস্থিতিতে শুধুমাত্র জুতো পরবার অধিকার আদায়ের জন্যে এক বড়সড় লড়াইতে নামতে হয়েছিল নমঃশূদ্রদের। যা পরে হিংসাত্মক রূপ নিয়েছিল। সিলেট গণভোটের সময়ে তাৎক্ষণিক ভাবে পংক্তিভোজনে বসে সেই দলিতদের মন জয় করতে নেমেছিলেন বর্ণহিন্দু নেতৃত্ব। সিলেট ভাগের দায় যারা এক তরফা অসমিয়া উগ্রজাতীয়তাবাদীদের উপরে চাপান তাঁরা নিজেদের এই দায়কে নিয়ে খুব বেশি মাতামাতি করেন না। এখনো জল জমির অধিকারের সঙ্গে নাগরিক অধিকার, সংরক্ষণ এবং ভাষা সংস্কৃতির জন্যে নমঃশূদ্রদের লড়ে যেতে হচ্ছে শুধু অসমেই নয়, গোটা ভারতেই। অসমে

ডি-ভোটার তাদেরকেই বেশি হতে হয়। মরিচঝাঁপির কুখ্যাত হত্যাকাণ্ডের শিকার হতে হয়েছে নমঃশূদ্রদেরই। দেশভাগ এবং বাংলার সবচে' বড় দলিত জনগোষ্ঠী এই নমশূদ্রদের দেশময় ছড়িয়ে পড়া একটি অন্যতম কারণ যে দেশভাগের আগে বাঙালি সমাজে গড়ে উঠা দলিত আন্দোলন পরবর্তী দশকগুলোতে বেশ চাপা পড়ে গেছিল।

তথ্যসূত্র:

১) শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়; উন্নয়ন, বিভাজন ও জাতিঃ বাংলায় নমশূদ্র আন্দোলন, ১৮৭২-১৯৪৭; জাতি,বর্ণ ও বাঙালি সমাজ; সম্পাদনাঃ শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিজিত দাশগুপ্ত; পৃঃ১২৭, ১২৯।

২) অনিতা বিশ্বাস, প্রকাশিকার কথা;"হরিচাঁদতত্ত্বামৃত";ডা: মণীন্দ্রনাথবিশ্বাস; পৃঃXIII;

৩) সমুদ্র বিশ্বাস; গ্রামবাংলার জাগরণে মতুয়া আন্দোলন; চেতনা লহর; এপ্রিল-ডিসেম্বর, ২০১৩ যুগ্মসংখ্যা, সম্পাদক, অনন্ত আচার্য, কলকাতা, পৃঃ ১৩৭।

৪) The Future Of India; ; Lectures from Colombo to Almora; Complete-Works ; Volume 3.

৫) Vedanta In Its Application ToIndian Life.

৬) সমুদ্র বিশ্বাস; গ্রামবাংলার জাগরণে মতুয়া আন্দোলন; চেতনা লহর;ঐ; পৃঃ ১৩৯।

৭) জয়া চ্যাটার্জী;হিন্দু ঐক্য এবং মুসলমান স্বেচ্ছাচার, বাংলা ভাগ হলো; দ্য ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড; ঢাকা; পৃঃ ২২৬

৮) শ্রীশ্রী হরি-গুরুচাঁদ মতুয়া মিশন;

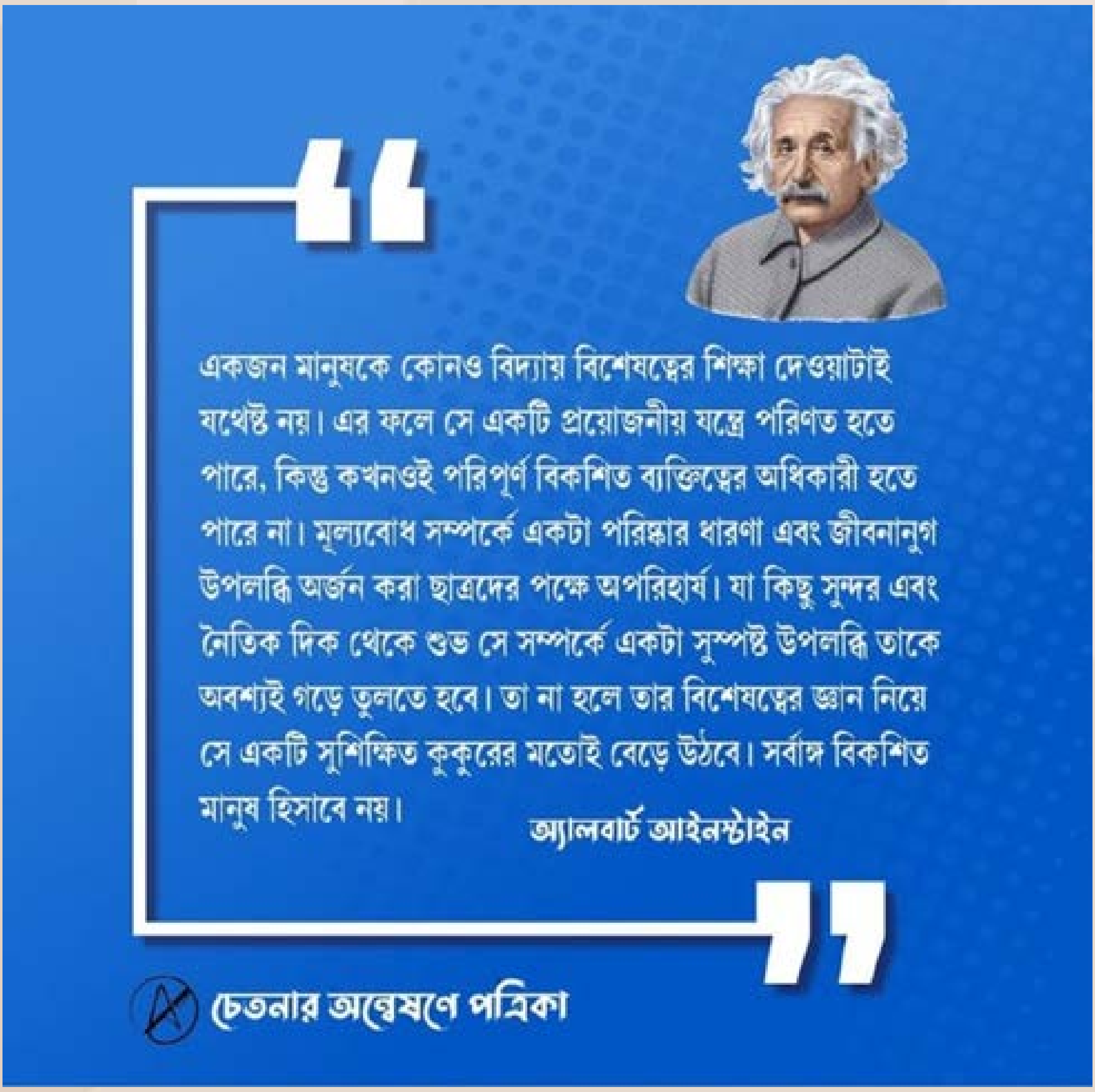
৯) শ্রীশ্রী হরি-গুরুচাঁদ মতুয়া মিশনের সঠিক ইতিহাস।

১০) দুলাল কৃষ্ণ বিশ্বাস; 'শ্রী শ্রী হরিলীলামৃত' এক ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক প্রয়াসঃ প্রসঙ্গ হরিচাঁদ ঠাকুরের নিষেধাজ্ঞা।;চেতনা লহর, এপ্রিল-ডিসেম্বর, ২০১৩; সম্পাদকঃঅনন্ত আচার্য; কলকাতা; পৃঃ ৮৯।

১১) Sharecropping and Sharecroppers' Struggles

in Bengal 1930 – 1950, Adrienne Cooper.

১২) বাঙালির ইতিহাস, আদিপর্ব, প্রথম খন্ড, নিহার রঞ্জন রায়।



লঙ্কাকান্ড

রচনা - অশোক দাস চার্বাক



[নাটকটি বর্তমানের বঙ্গসমাজের বাস্তবচিত্র ভিত্তিক একটি কল্পচিত্র। বাস্তব ঘটনা বা বাস্তব চরিত্রের প্রতিফলন যে এ নাটকে থাকবে এটা অস্বীকার করা যায় না। তবে এ নাটকে কোন নির্দিষ্ট ঘটনা বা নির্দিষ্ট চরিত্রের ইঙ্গিত করে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সম্মানে আঘাত দেওয়া লেখকের উদ্দেশ্য নয়।]

চরিত্র:

মৃত্যুঞ্জয় – পুলিশ অফিসার
সুরজ – চাওয়ালা
সর্বপ্রিয়া – অফিসারের স্ত্রী
কালীপদ – মন্দিরের পূজারী
শান্তিলতা – অফিসারের শাশুড়ী
নান্টু – বিরোধী গোষ্ঠীর নেতা
হারাধন – অফিসারের শশুর
দুর্যোধন – অঞ্চলপ্রধান
আশারাম – গুরুবাবা
পরানবাবু – উকিল
ডঃ বোস – নার্সিংহোমের মালিক
রিকশাওয়ালা
শঙ্করবাবু – বৃদ্ধ প্রাক্তন শিক্ষক
টিভি সংবাদ পাঠিকা

(পর্দা ওঠার আগে)

মাইক: ....নাট্যসংস্থার পরিচালনায় অশোকদাস চার্বাক বিরচিত ও............ দ্বারা পরিমার্জিত যে অনুনাটকটির অভিনয় আপনারা সকৌতুকে উপভোগ করতে চলেছেন, তার হালকা রঙ্গব্যাঙ্গের আড়ালে প্রচ্ছন্নভাবে লুকিয়ে রয়েছে মানব প্রজাতির অবলুপ্তির দিকে অগ্রগতির এক ভয়াবহ ভবিষ্যতচিত্র। হোমিনিড বংশোদ্ভূত হোমো স্যাপিয়েন অর্থাৎ ওয়াইজম্যান প্রজাতির পশুরা তাদের প্রকৃতিলব্ধ পশুপ্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে ক্রমশঃ বিবর্তিত হতে হতে কিছুটা মানুষে রূপান্তরিত হয়ে পূর্ণসভ্য মানুষ হবার পথে বেশ ধাপে ধাপে অগ্রসর হচ্ছিল। কিন্তু পশুসুলভ সংগ্রহকারী প্রবৃত্তি, অতিলোভ ও মাত্রাহীন ভোগবিলাসের লাগামছাড়া হাতছানি সদ্যবিবর্তিত অপরিণত মানুষকে পুনরায় পশুস্তরে পিছিয়ে নিয়ে চলেছে। মানুষ, অর্থাৎ যে প্রাণীদের আমাদের চলতি ভাষায় 'মানুষ' বলে থাকি - তারা ক্রমশ আগের মত মননহীন জন্তুত্ব অর্জন করতে চলেছে। মানুষ ও অন্যান্য পশুর চারিত্রিক পার্থক্য ক্রমশ কমে যাচ্ছে। তারা অন্যান্য পশুদের মত প্রতিযোগী পশুর সংগৃহীত করা খাদ্য বা প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ যেনতেনভাবে ছিনিয়ে নিচ্ছে। অপরের পুরুষ বা নারীসাথীকে নানান প্রলোভন দেখিয়ে বা গায়ের জোরে ছিনিয়ে নিচ্ছে। তারা উন্মত্ত অসভ্য আদিম অর্ধমানবদের মত হাটে বাজারে, রিসর্ট মধুচক্রে নাচছে উদ্দাম উলঙ্গ হয়ে। আর আমরা টিভি সিনেমা থিয়েটার পথেঘাটে বিজ্ঞাপনের হোর্ডিংয়ে সে সব পশুনৃত্য লজ্জাহীনভাবে উপভোগ করছি আমাদের সন্তানদের সাথে। সেসব মজার দৃশ্য, সেসব রঙ্গব্যাঙ্গের দৃশ্য, সেসব কান্নার দৃশ্য, বিপথগামীদের অসহায় কালমৃত্যুর দৃশ্য দেখতে দেখতে আমার আপনার প্রিয়জন ও সন্তানসন্ততির দুর্ভাগ্যের ভবিষ্যৎ দৃশ্য অনুমান করুন। তারপর নাট্যমঞ্চের শেষ পর্দা নেবে গেলে প্রাণভয়ে কাঁপতে কাঁপতে এ সমাজের জতুগৃহ থেকে মুক্ত হবার পথ খুঁজতে থাকুন। অথবা, মানে 'অথবা' এ নাটকে দেখা পুলিশ, ডাক্তার, উকিল, পুরুত,

গুরুবাবা, জ্যোতিষ বাবা, নেতাগুন্ডাদের ওপর আপনার একান্ত প্রিয় সন্তানসন্ততিদের রক্ষা করবার ভার অর্পণ করে আরও আরও সম্পদ বাড়াতে থাকুন, আর নিজ নিজ ভোগবিলাস চেটেপুটে উপভোগ করুন হলের বাইরে গিয়ে। আজকের নাটকে এতক্ষণ যা দেখবেন তা ভুলে যান।

প্রথম দৃশ্য

(নামাবলী গায়ে এক পাঠক রামায়ণ পড়ার সুরে পাঁচালী পাঠ করছে দুলে দুলে)

এ নাটকে দেখা যাবে প্রতি ঘরে ঘরে,
স্ত্রী পুত্র পরিবার একে একে মরে।
অসুরের স্বর্নপুরী পোড়ে সারে সার,
রাবনের দর্প ভেঙে হলো একাকার।
অসুর পুড়িছে তার কালো টাকা সনে,
লোভী মানি যোগী ধনী মরে জনে জনে।
ভোগের লালসা ধায় বিলাসীর গৃহদ্বার,
সে আগুন গ্রাস করে সুখী যত সংসার।
নেতা মন্ত্রী অফিসার সে আগুনে ঝাঁপ দেয়,
বৃদ্ধ যুবা শিশু পোড়ে পতঙ্গের মত হায়।
রচয়ে চার্বাক ঋষি কলির এ রামায়ণ,
স্বর্ণলঙ্কা দহনের নব এক রূপায়ণ।
ভাবিতে থাকহ এবে শ্রোতা সুধীজন,
বাঁচাইবে কি উপায়ে পুত্র প্রিয়জন।
অথবা চক্ষু মুদি মজা কর ঘরে,
না চিন্তি আগামী দিন পশু যাহা করে।
পুড়ুক এভাবে তব আপনার জন,
আগামী প্রজন্ম তরে করোনা মনন।
চক্ষু মুদি কর্ণ ঢাকি তিন হনু সম,
মুখ বুজি মন্ত্র জপ অসুরায় নমঃ।
শুষে নাও এ ধরায় আছে যত মধু,
লালসা মেটাতে তুমি ছুটে চল শুধু।
চার্বাক কথা শোন গরল সমান,

পোড়াইচ্ছে সারা ধরা যত হনুমান।
হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল,
হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, হরি-ই-বোল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[গ্রাম্য রাস্তার চৌমাথায় এক পথশনির ঠেকের পাশে চায়ের গুমটি। দূর থেকে ভেসে আসছে মোটরবাইকের আওয়াজ। চাওয়ালা চা চাপিয়ে দিল স্টোভে। বাইক থামিয়ে পুলিশ অফিসার মৃত্যুঞ্জয়ের প্রবেশ]

সুরজ - সেলাম সাহাব।

মৃত্যুঞ্জয় - চা চাপা শিগগির। আটটা বেজে গেল, এখনও উনুনের কয়লা কালো কেনরে শালা।

সুরজ - মনটা বহুত উদাস হো গিয়া সাহাব। ঘরকা বহু প্রোমোটার কলিমুদ্দিনকা সাথ তিন দিন বেপাত্তা। বহুত সরম কি বাত। শুনা কি বকখালিমে ফুর্তিকে লিয়ে গিয়া হোগা।

মৃ - এতে শরমের কি আছেরে পাগলা? এতো তোদের জাতের ছোটলোকদের বাড়ীর আখচার কারবার। ঘর ঘর কা কাহানি। মন খারাপ করিস না, আর একটাকে ধরে নিয়ে আয়। নে, চা চাপা।

সু - চাপিয়েছি সরকার, দূর থেকে আপনার ইনফিল্ডের ডিগ ডিগ শুনে স্টোভেই চাপিয়ে দিয়েছে আপনার ইস্পেশাল চা।

মৃ - বহুত আচ্ছা, কদিনেই বেশ ভালো বাংলা শিখছিস তো! বুদ্ধিটাও বেশ পেকেছে দেখছি বাংলার জল খেয়ে।

সু - সব অপকাহি মেহেরবানী সাহাব।

মৃ - ডাবল হাফ চা দিবি, আর ডাবল ডিম টোস্ট।

সু - সব রেডি হো গিয়া সাহাব, আপকা মর্জি হামারা ধ্যানমে হ্যায়।

মৃ - এইতো চাই। এই ভক্তি-বুদ্ধির জন্য তোরাই ব্যবসা জমাচ্ছিস সারা বাংলা জুড়ে। আর বোকচন্দর আঁতেল বাঙালীর বাচ্চারা শুধু দুর্নীতিবিরোধী মিটিং মিছিল প্রতিবাদ

হরতাল করে করেই মরছে। বলে সমাজতন্ত্র আনবে, ন্যায়বিচার আনবে। শালা ওসব তন্ত্রমন্ত্র কি ধুয়ে খাবি ? নিজের নিজের সংসার ছেলেমেয়েদের কথা ভাব। ওরা যে দিন দিন রসাতলে যাচ্ছে সেটা আগে বোঝ। ইন্টেলেকচুয়াল হয়েছে সব – বুদ্ধিজীবী!

সু – (চায়ের কাপ আর টোস্টের প্লেট টেবিলে রেখে) আউর কুছ সেবা সাহাব ?

মৃ – এক প্যাকেট উইলস ছাড়। ক্লাসিক ফ্ল্যাসিকতো এ গাঁয়ে মিলবেনা।

সু – নেহি সাহাব, স্রিফ আপকা লিয়ে চুপকে চুপকে লে আয়া শাহরসে।

(এদিক ওদিক তাকিয়ে প্যাকেটের সাথে পঞ্চাশ টাকার নোট রাখলো টেবিলে)

মৃ – এ কিরে শালা, পঞ্চাশেই সারবি নাকি ? গত মাসেও তো চা বিস্কুটেই কর্তব্য সেরেছিলি। সেদিন দোকানে লাল পার্টির আগুনখেকো বদ ছোকরাগুলো ছিল বলে কিছু বলিনি। এমন করলে গভর্নমেন্ট চলবে, না দেশের মা মাটি মানুষ বাঁচবে! অন্ততঃ পুরো এক ছাড়।

সু – বেচাকেনা একদম নেহি স্যার।

মৃ – বললে হবে, ছোটঠা কাঁহাকা। একটা বেঞ্চতো বাড়িয়েছিস দেখি। তিন তিনটে বেঞ্চ ভরিয়ে কাদের বসাস। এটা পুলিশের চোখ, বুঝলি। বেশতো জাঁকিয়ে বসেছিস এ রাজ্যে এসে। সরকারি রাস্তা, সরকারী টিউকলের জল – সব তো ফুকোটসে। সরকারী রাস্তার জায়গাটাও তো জবরদখল। আর সেই সরকারের জন্য পঞ্চাশ! যারা তোদের অন্ন যোগাচ্ছে তাদের কথা একটু ভেবে দেখ। তোদের লালু ছাড়তো পঞ্চাশে ? সামনের মাস থেকে দুই করে ছাড়বি।

সু – মোর জায়গা সাহাব।

মৃ – তা না হলে ইনকাম ট্যাক্স, সেলটাক্স, উনুনে কয়লা পোড়ানোর জন্য পরিবেশ দূষণ ট্যাক্স, – সব কেস একসাথে। – ধর ধর রিক্সাটাকে। সালা বড্ডো ফাঁকিবাজ। আমার বাইক দেখলেই স্পিড বাড়িয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে ছুট মারে

চোট্টাটা। জোচ্চোর একেবারে, অসৎ।

[রুখ রুখ বলে চেঁচাতে চেঁচাতে রাস্তার ওধারে গিয়ে রিক্সাটার হ্যান্ডেল চিপে ধরলো সুরজ]

সু – বহুত মেহবান হো গিয়া শালা। সরকারকা বাইক দেখতা নেহি? সাহাবকো সেলাম দেগা কৌন? চল শালা বুড্ঢা।

[কাঁধের গামছাটা কোমরে জড়িয়ে খোঁড়া রিক্সাওয়ালাটাকে টানতে টানতে পুলিশের সামনে নিয়ে এলো সুরজ। দাদুর বয়সী বুড়ো রিকশাওয়ালা পুলিশের পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকালো।]

রিকশাওয়ালা – বলুন বাবু।

মৃ – বাবু! শালা, আমিকি তোর ইয়ারদোস্ত নাকি? স্যার বল, স্যার। বুড়ো হয়ে মরতে বসেছিস, ম্যানার্স জানিসনা?

রিকশা – ভুল হয়ে গেছে বা– মানে স্যার (একটু জোরে) স্যার, স্যার।

মৃ – বল শালা, রিকশায় প্যাঁপো বেল কিছু নেই কেন?

রিকসা – প্যাঁপো একটা ছিল বা–স্যার, কদিন হলো চুরি হয়ে গেছে।

মৃ – দিনের বেলাতেও ঘুমোস নাকি? লক্ষ্য রাখতে পারিসনা?

রিকষা – আপনারা কিছু একটা ব্যবস্থা করুন সা–স্যার। বড্ড চুরি বেড়ে গেছে এদিকটায়। গত রাতে পঞ্চায়েত মিয়াঁর বিবিটাও বেপাত্তা হয়েছে। নাড়াপুর কালীমন্দিরের পুরুত ঠাকুরের তিন তিনটে শুয়োর, আর চারটে মুরগি চুরি হয়ে গেছে। জাগ্রতা মায়ের পেতলের জিভটাও কেটে নিয়ে গেছে চোরে।

মৃ – তা, আমরা কি করবো? আমরা কি সাইকেলচোর, বৌচোর, মুরগিচোর, চাকরীচোর ধরতে বসে আছি নাকি? তাহলে সরকারী কাজটা করবে কে? যে নিজের মাল নিজে নিজে সামলাগে যা। জাগ্রতা মাকালীকেও বলে দিস নিজের জিভ নিজে সামলাতে।

রিকশা – যা বলবেন স্যার। চলি এখন?

মৃ – চলি কি রে? তিন মাসতো কিছুই দিসনি। এতো ধারবাকিতে চলে? একশো ছাড়। রিকশা – মরে যাবো স্যার, ট্যাকে মোটে পনেরো টাকা আছে। বৌ বাচ্চার জন্য চাল কিনতে হবে।

মৃ – বাকি টাকা গেল কোথায়?

রিকশা – ভোর থেকে মাত্র দুটো খদ্দের পেয়েছি। তাও একজন আমার চেয়েও খোঁড়া – থুড়থুড়ে বুড়ি – বিধবা। যখন ওনার বাড়িটা ছিল, তখন উনি দু'দুটো বড় বড় অফিসারের মা ছিলেন। ছেলেদের নামে বাড়িটা লিখে দেবার পর ঘরছাড়া হয়ে রাস্তায় থাকেন, ভিক্ষা করে খান। বড্ডো জ্বর তাঁর। ওনার কাছে পয়সা নিতে পারলাম না স্যার। মানুষের মন, আমার আপনার বাড়িতেও তো বুড়ো বাপ মা আছেন। বুড়িকে হেলথ সেন্টারে পৌঁছে দিয়ে এলাম এমনি এমনি।

মৃ – কিন্তু সরকারতো ছাড়তে পারে না এমনি এমনি। তাকে নিয়ম আইন মেনে চলতে হয়। তা না হলে দেশে অরাজক হয়। প্যাঁপো না থাকায় সাংঘাতিক একটা কেস খেয়েছিস তুই। তোকে এমনি এমনি ছেড়ে দিলে সরকারকে কি কৈফিয়ৎ দেব? সরকারতো এজন্যই আমাদের মাসে মাসে মাইনে দিয়ে রেখেছে। এয়াই সুরজ দেখতো সার্চ করে, ওর ট্যাকে কত আছে।

[সুরজ রিক্সাওয়ালার ট্যাঁক সার্চ করলো]

সুরজ – পঁয়ত্রিশ রুপিয়া স্যার। সালা ছোটঠা আদমি। সরকারকো ভি ফাঁকি দেতাহা! ইতনা বাদমে তো নবান্ন রাজভবন ভি লুট লেগা শালা।

মৃ – দশ টাকা ওকে দিয়ে বাকিটা নিয়ে আয়। ৭৫ টাকা মাফ করে দিলাম এক কথায়। ১০০ টাকার কেস ২৫ টাকায় নিস্পত্তি। তবু অনেকে পুলিশকে ঘুষখোর বলে। [তাড়াহুড়ো করে রিক্সাওয়ালার ছুটতে ছুটতে প্রস্থান] সুরোজ, এই টাকা থেকে তুই দু'টাকা বকশিস রাখ। তোর ইন্টারভিউ হয়ে গেলো। দারুন কাজ করলি। এবার একটা ভালো সরকারী চাকরী কিনে নে। বড় নেতাকে বলে অল্প দামে সিভিক ভলেন্টিয়ারের চাকুরী করে দেব তোর। এভাবেই আমাকে

সাহায্য করবি। সবার সামনে সরকারি কাজ করতে পারি না। চারিদিকে মিডিয়ারা ক্যামেরা নিয়ে ঘুরছে। আমার হয়ে ট্রাক লরি থেকে জরিমানা আদায় করবি তুই। সরকারী মাইনে ছাড়া আমার কাছ থেকে কমিশনও পাবি।

[বৃদ্ধ শঙ্করবাবুর প্রবেশ। হাতের প্লাস্টিকের ব্যাগ থেকে সবজি দেখা যাচ্ছে। মাথায় তালি দেওয়া ভাঙা ছাতা। চায়ের কাপটা তাড়াতাড়ি শেষ করে মৃত্যুঞ্জয় ছুটে এগিয়ে গেলো ওনার দিকে।]

মৃ – ভালো আছেন স্যার? (প্রণাম)

শঙ্করবাবু – তোমায় তো ঠিক চিনতে পারলামনা বাবা। চোখেও ভালো দেখিনা ...

মৃ – আমি মৃত্যুঞ্জয়, মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল। আপনার ছাত্র ছিলাম। বারে বারে ফেল করতাম বলে ফেলুরাম বোকারাম বলে ডাকতেন আদর করে। আমাকে পাস করানোর জন্য আলাদা করে বিনা পয়সায় পড়াতেন আপনার বাড়িতে।

শঙ্কর – মৃত্যুঞ্জয়, হাঁ হাঁ মনে পড়েছে বটে। আশুর ছেলেতো। বড্ড ভালো মানুষ ছিল তোমার বাবা। খড় দিয়ে ঘর ছাইতো নিখুঁত। নিজে লেখাপড়া করতে পারেনি বলে তোমাকে পড়িয়ে পড়াশুনার স্বাদ মেটাতো। জনমজুর খেটে আধপেটা খেয়ে তোমাকে পড়াতো। স্বার্থক হয়েছে তার পরিশ্রম। পুলিশ অফিসার হয়েছো বুঝি।

মৃ – হাঁ স্যার, ঝাড়বুনি থানার সেকেন্ড অফিসার। চা খান মাস্টারমশাই।

শ – তা, আশুর মত সোজা সরল সৎ মানুষের ছেলে হয়ে পুলিশ লাইনে এলে কেন? অবশ্য পুলিশের মধ্যে অনেক সৎ মানুষও আছেন। তবে নেতা মন্ত্রী পুলিশের নামে লোকে আজেবাজে কথা বলে, মানসম্মান রাখে না শুনি।

মৃ – মানসম্মান নিয়ে কি ধুয়ে খাব নাকি? ওসব সেকেলে সেন্টিমেন্টকে পাত্তা দিলে আর করে খেতে হবে না।

শ – তাবলে এ লাইনে? অন্য চাকরী ধর।

মৃ – সব লাইন একই মাস্টারমশাই, সব শালা – সরি, মানে সব

ভদ্রলোকই চোর। আপনাদের শিক্ষকরাইতো কোচিং সেন্টার ফেন্টার খুলে কোশ্চেন বিক্রি করে লক্ষ লক্ষ টাকা কামাচ্ছে। নেতা মন্ত্রীদের ঘুষ দিয়ে নিরক্ষররা সরকারী অফিসার, বোর্ডের চেয়ারম্যান, এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যও হয়ে যাচ্ছে। এখনকার দিনকাল পাল্টিয়ে গেছে মাস্টারমশাই। এখন মা-মাটি-মানুষের সরকার। সব সময় পাশে থাকে। ডাকলেই দুয়ারে হাজির।

শ - ক্লাস সিক্সে তিন বার আটকিয়ে থেকে স্কুল ছেড়ে বাবার সাথে চাষবাস দিনমজুরি করা শুরু করেছিলে শুনেছিলাম। অফিসারের চাকরি পেলে কি করে? পরে প্রাইভেটে পাস্ করেছিলে বুঝি?

মৃ - সে এক মজার ইতিহাস মাস্টারমশাই। ভোট করাতে গিয়ে রাজনীতি লাইনে একটু নামডাক-চেনাশোনা হয়েছিল। কাউকে ঘেঁষতে দিতাম না বুথে। নয়খুনি নান্টু, মেছো অনুকেষ্টরা এখন বড় বড় নেতা হয়েছেন। টুঁকুলি মন্টুকে মনে আছে স্যার? স্কুল থেকে বহিস্কৃত হয়ে সে ছাত্রনেতা হয়ে গেছিল। সে এখন এম এ পাস করে ডক্টরেট পেয়ে গেল বিহার বিশ্ববিদ্যলয় থেকে। ওখানে বেশ সস্তায় ডিগ্রি পাওয়া যায়। পরীক্ষা টোরিক্ষা কিচ্ছু দিতে হয়না। সে, মানে তিনি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী হয়ে শিক্ষকদেরই সহবত শেখাচ্ছেন। বড় শহরে পোস্টিং পাবার জন্যে কত আচ্ছা আচ্চা শিক্ষক অধ্যাপক, এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পর্যন্ত ব্যাগে প্যাকেট খাম লুকিয়ে ওঁর চেম্বারে ধর্ণা দিচ্ছে।

শ - বল কি বাবা, এত উন্নতি করেছে মন্টু!

মৃ - ওনারাই বললেন, বাপের অবস্থাতো দেখলি। চাষবাস বা খড়ের ঘর ছেয়ে আর কয় পয়সা কামাবি, এখনকার বৌ বাচ্চাদের খাঁই মেটাতে পারবিনা। দিনকাল পাল্টেছে। চাহিদামত ফুর্তির রসদ না পেলে ছেলেমেয়েরা ঘেন্না করবে, বৌ হেটেল রিসোর্টে ছুটবে রাতের মজা লুটতে। তুইতো বেশ হাতফাৎ চালাতে, খিস্তি খেউর করতে পারিস মাননীয় নেতামন্ত্রীদের মত। সেকারনে গাঁয়ের লোকেরা ভয়ে ভয়ে তোকে সমীহও করে। সামনের ভোটের আগে কদিন স্বেচ্ছায়

মানুষের সেবা কর। ভোটের পরে নেতাদের বলে কয়ে সামান্য খরচে পুলিশে ঢুকিয়ে দেব তোকে। তুই আমাদের দেখবি, আমরাও তোরটা। দু বছরে গাড়ি বাড়ি সম্মান – সব হয়ে যাবে। তাই স্যার, বাবার ভিটেটা বেচে লাখ তিনেকে চাকরিটা পেয়ে গেলাম। মাধ্যমিক সার্টিফিকেটটাও ফ্রি পেয়ে গেলাম এক্সট্রা।

শ – এসবতো অশ্লীল অসভ্য লেখকদের গল্প নাটকের মত মনে হচ্ছে। তুমি কি সত্যি বলছ?

মৃ – একদম সত্যি। এসব হচ্ছে উন্নততর প্রশাসনের আধুনিক টেকনোলজি। নিন আর এক কাপ চা খান। বলেনতো তিন চার লাখে আপনার বেকার ছেলেরও এমনি একটা হিল্লে করে দিতে পারি। বড় বড় জায়গায় আমার কন্টাক্ট আছে। আপনারও ভালো, আবার দু পয়সা আমার পকেটেও ঢোকে।

শ – ছি ছি বাবা। ওসব খারাপ কথা থাক। সৎভাবে দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন কর। পাপকে কখনও মনে ঠাঁই দেবেনা। পাপের পয়সা কখনও ঘরে ঢোকাবেনা। রাতে ঘুম হবেনা। ছেলেমেয়েরা উচ্ছন্নে যাবে, সংসার জীবন সুখের হবেনা। তোমার বাবামায়েরা ভাল আছেনতো?

মৃ – অনেকদিন হল ওদের খবর পাইনি।

শ – সে কি! কোথায় থাকেন ওঁরা? বহু কষ্টে মাটির বাড়িটা বানাতে দেখেছিলাম।

মৃ – প্রথমের দিকে আমার সাথে ঐ বাড়িতেই থাকত। আমার বিয়ের এক বছরের মধ্যেই বিধবা দিদির বাড়ী চলে গেলেন আপনার বৌমার সাথে ঝগড়া করে। নিঃসন্তান দিদি মারা গেলে পার্টি সিন্ডিকেটের এক প্রোমোটার দিদির বাড়িটার দখল নিলো আমায় দুই আর পার্টিকে দুই দিয়ে। তারপর দিদির বাড়ি থেকে উচ্ছেদ হয়ে ওরা কোথায় গেছিল জানা নেই। লোক পরম্পরায় শুনি ওরা নাকি গত বছর একই দিনে মারা গেছেন মাদারের আশ্রমে। ওরাও নিশ্চিন্ত, আমরাও।

শ – সে কি কথা! তুমি ওদের একমাত্র উপযুক্ত ছেলে, গায়ের রক্ত জল করে তোমায় মানুষ করেছেন, মরণকালে শেষ জলটুকু পেলেননা তোমার হাতে!

মৃ – কি করব বলুন, বুড়ো বয়সে বড্ড বেগড়বাই করছিল।

সারা বছর বুড়োবুড়ির দাঁত ব্যাথা, হাঁপানি, বাতবেদনা, ছানি – মানে নানা অপব্যয় আর অশান্তি। তারওপর আবার নানা বায়নাক্কা – মাঝ রাত বিরেতে কোথায় যায় বৌমা, চুল ছোট করে কাটে কেন, ফেরার সময় মুখে বাজে গন্ধ কেন, মানে আপনার বৌমা ওদের গোয়েন্দাগিরির ঠেলায় একেবারে অতিষ্ঠ। সংসার ছারখার।

শ – থাক বাবা থাক, আর বলতে হবেনা। ঠাকুর তোমার সুমতি দিন, তোমাদের চৈতন্য হোক। ছেলেমেয়েরা যেন তোমাদের দেখে বুড়ো বয়সে।

মৃ – আমিও আপনার মত বেলুড় মঠের শিষ্য। আমার ঔরসে, আমার রক্তমাংসে তৈরী আমার ছেলেমেয়েরা কোনোদিন কুসন্তান হবেনা, এ আমি নিশ্চিত।

শ – তুমিও কি তোমার বাপ মায়ের রক্তমাংসে সৃষ্ট হওনি নাকি। তুমি ওঁদের তাড়ালে কি করে? ওঁরাওতো ধার্মিক ছিলেন তোমার মত। মন্দিরে মন্দিরে পুজো দিতেন, দেব দ্বিজে ভক্তি ছিল, অনুকূলবাবুর সৎসঙ্গে দীক্ষা নিয়ে নিরামিষ খেতেন ....

মৃ – বুড়ো বয়সে ভীমরতি ধরে বহুত তর্ক শিখে গেছেন দেখছি। পুলিশের সাথেও তক্ক! এত সাহস! পন্ডিত হয়ে গেলেন, না বামবাদী? বাঁকা কথায় গালাগাল দিচ্ছেন! ভালো প্রস্তাব দিলাম, মনে ধরলোনা। বাজে কথা ছেড়ে এবার সরকারী কথায় আসুন। বাজারে গিয়েছিলেন বুঝি?

শ – আমাদের আবার বাজার। ওই কুমড়ো, কুদরী, কলমি, কচু – এইসব আর কি। সবই তো দুনম্বরী প্রোমোটার, পার্টিফড়ে হঠাৎ-বাদশারা কিনে নিয়ে যাচ্ছে।

মৃ –সবইতো বুঝলাম, কিন্তু প্লাস্টিক ব্যাগে আনাজ আনতে গেলেন কেন? ফালতু একটা কেস খেয়ে গেলেন সক্কালবেলা।

শ – এইটুকুতো সবজি, ব্যাগটা কদিন আগে ছিঁড়ে গেছে বাবা।

মৃ – পাতলা প্লাস্টিকে বাজার আনা বেআইনী সেটাকি জানেননা?

শ – জানি বৈকি বাবা। কিন্তু সবার হাতেই তো দেখি।

তোমাদের পুলিশরাও তো দেখি ঐ ব্যাগে বাজার করে।

মৃ – আপনিকি আজকাল পুলিসের ওপরেও পুলিশগিরি করছেন নাকি? জেল হয়ে যাবে যে। নেতা পুলিশের নামে এমন কুৎসা ছড়ানো ব্ল্যাসফেমির মত কগনিজেবল অফেন্স এটা কি জানেননা? ফের আবার প্রশাসনের নামে এমন কুৎসা করলে সোজা হাজতে পুরে এক্কেবারে অম্বিকেশ করে ছেড়ে দেব।

শ-ছিঃ ছিঃ, পুলিশ হয়েছো বলে কি শিক্ষকদের সাথেও ঠাট্টা মস্করা করবে নাকি? চলি এখন।

মৃ – চলি মানে? কোথায় পালাবেন আমার হাত থেকে। রাস্তায় বিড়ি খাবার কেসটা না হয় ছেড়ে দিয়ে গুরু ঋণ শোধ করলাম। আপনিও আমার বাল্যকালে আমায় বিড়ি খেতে দেখে শুধু আলতো করে কান মলে ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু প্লাস্টিক কেসটা চোখ বুজে ছেড়ে দিলে সরকার থাকবে, না আমার চাকরী।

শ – তুমিও আমার কান মোলে ছেড়ে দাও বাবা।

মৃ – একি বলছেন মাস্টারমশায়। আপনি আমার গুরু। শাস্ত্রে বলে আচার্য দেব ভব। আপনার কানে হাত দিয়ে আমি কি মহাপাতকী হবো নাকি। পাবলিকই বা কি বলবে, আবার ভগবানই বা কি বলবে।

শ – তাহলে কি করে তোমার হাত থেকে রেহাই পাবো বাবা?

মৃ – ওটা আমার হাত নয় মাস্টারমশাই। ওটা সরকারের হাত, মানে আইনের হাত। আর ও হাতটা জনগণই বানিয়েছে। আপনিও বানিয়েছেন ভোট দিয়ে। শুনুন মাস্টারমশাই, আমি হিসাব করে দেখলাম পুলিশ কেস হয়ে গেলে আপনার পরিশ্রম, হয়রানি, ছুটাছুটি, দুশ্চিন্তা, তার উপর থানা খরচা, পার্টি খরচতো আছেই। উপরন্তু আদালতে কতবার যে ডেট পড়বে তার ঠিক নেই। তার জন্য প্রতিবারে উকিলের ফি, কেরানির 'আমরা পেয়ে থাকি', পিওনের বকশিস, সাক্ষীর জলপানি – রাহা খরচ....

শ – সাক্ষী? সাক্ষী কোথায় এ জনহীন মাঠে?

মৃ – সব আছে মাস্টার, সব আছে। সব কি খালি চোখে দেখা যায়, না সবাই সব কিছু দেখতে পায়। সাক্ষীরা সব দেব দেবীদের মত অলক্ষে অন্তরীক্ষে থাকে। সাধুসন্ত মুনিঋষিরা যেমন গাঞ্জা সেবন করে অদৃশ্য ভগবান দেবদেবীদের দেখতে পায়, তেমনি একমাত্র উকিল আর পুলিশরাও সাক্ষীদের দেখতে পায়, সাক্ষীরা তাদের ডাকে সাড়া দেয়। একবার হাঁকিয়ে দেব, আর জনা বিশেক মান্নিগন্নি বাবুলোকেরা আদালতে গীতা ছুঁয়ে বলবে যে আপনি কর্তব্যরত পুলিশকে জুতোপেটাও করেছেন। তখন ঘটিবাটি বেচেও জেলযাত্রা ঠেকাতে পারবেননা। আজীবন আপনার কেসটা চলতেই থাকবে, চলতেই থাকবে। আর আপনার মরার পর উত্তরাধিকার সূত্রে আপনার বেকার পুত্রের ঘাড়ে চেপে বসবে তার দায়। নিন, দশ হাজার ছাড়ুন।

শ – এতো টাকা আমি কোথায় পাবো বাবা। তার চেয়ে আমায় বেঁধে তাঁদের নিয়ে যাও।

মৃ – এত ঘাবড়াচ্ছেন কেন মাস্টারমশায়? পুলিশ বলে আমরা কি মানুষ নই নাকি। আমরাকি একেবারে চশমখোর শুওরের বাচ্চা যে পরম পূজনীয় বৃদ্ধ মাস্টারমশাইয়ের হাতে হাতকড়া পরিয়ে জেল খাটাবো। আমরা নিরপেক্ষ সরকারী কর্মী হলেও আমাদের পাঁজরের নিচে একটা দুর্বল নরম মন রয়েছে। সে মনে লাজ লজ্জা,ন্যায়বোধ মনুষ্যত্ববোধ যে একেবারেই শূন্য তা নয়। আপনার জন্য সামান্য কিছু করতে পারলে শিক্ষাগুরুর ঋণের বোঝাটার কিছুটা লাঘব হয়। আমাদের মহামান্য মন্ত্রী বলেছেন নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের কথা ভুলে মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে। তাঁদের সে বাণীতে আনুপ্রানিত হয়ে মাত্র ছয় হাজারে কেসটার ফয়সালা করে দেব। দশ থেকে একেবারে ছয়। সক্কালবেলা স্রেফ ফোঁকেটসে আপনার চার হাজার টাকা ইনকাম। এবার হাসুন। না না, এখুনি দিতে হবেনা। বাজার হয়ে গেছে।এবার বাড়ি যান, ভালোমন্দ খান, আনন্দফুর্তি করুন, সন্ধ্যে হলে দিয়ে সরকারি জরিমানার টাকাটা আমার সিভিক সেচ্ছাসেবক গিন্নীর কাছে জমা করে আসবেন। সরকারী জরিমানা কমিয়ে দিয়েছি বলে

আবার পাঁচকান করবেন না যেন। আপনাদের ঐ মিডিয়া, আর অর্ধশিক্ষিত জনগণ তা বুঝবে না। ঘুষ খেয়ে চার হাজার টাকা পাইয়ে দিয়েছি বলে কুৎসা রটাবে। অসভ্য নাট্যকারেরা নাটক লিখবে, অশিক্ষিত লেখকেরা গল্প লিখবে, টিভিতে তর্ক বিতর্ক করে গলা ফাটাবে – মনে হয় সবকটাকে ধরে ধরে অথবা – যান এখন নয়টার বাসটা পৌঁছুবার আগে কেটে পড়ুন।

(শঙ্করবাবুর দ্রুত প্রস্থান) শালা শ্বশুরমশাইয়ের মোপেড মনে হচ্ছে। শালার ব্যাটা হাড়কেপ্পন। বছরের পর বছর জামাইষষ্ঠী, পুজোর কাপড় সব ফাঁকি দিয়েছে সুদখোর হারামির বাচ্চা। পুলিশের শ্বশুর পরিচয় ভাঙিয়ে এর কলা, ওর মুলো, ডিম, মুরগী বিনে পয়সায় বাগিয়ে বৌয়ের কাছে ফাঁট মারে। গ্রেপ্তারের ভয় দেখিয়ে আধা দামে চাল ডাল কেনে, রেশন দোকান আর স্কুলের মিডডে মিলের ডিমের বখরা নেয় রাঁধুনি মাস্টারদের কাছ থেকে। আর জামাইয়ের বেলায় লবডঙ্কা। শুওরের ইয়েটাকে আজ একটা কেস না দিলে সরকারের মান ইজ্জত থাকবেনা। (হারাধনবাবু মোপেডটা রাস্তায় স্ট্যান্ড করিয়ে চায়ের দোকানে ঢুকলেন। গলায় তুলসীর মালা, কপালে গলায় হাতে চন্দনের ছাপ। মুখে গ্রামীণ সুদখোর সুদখোর ভক্ত ভক্ত ভাব।) ভালো আছেন বাবা?

হারাধন – ও তুমি! চিনতেই পারিনি। টুপিটা বেশ মানিয়েছে কিন্তু। সাহেব সাহেব লাগছে দেখতে। মনে হয় সেই ছোট বেলায় দেখা গোরা পুলিশ। তবে ওদের সোলার হ্যাটটা থাকলে আরও মানাতো। অবশ্য আর সব একই। সেই এক ব্যাটন, সেই লাল লাল চোখ, তেজিতেজি মুখ খিস্তি। তোমার শাসনের প্রশংসা শুনি গ্রামে গ্রামে। মেনিমুখো মিষ্টি মিষ্টি ভদ্র ভদ্র পুলিশ আমার ভালো লাগেনা। সাহেবরা আমাদের দেশটাকে দেশি নেতাদের দান করে গেছে বটে, কিন্তু ওদের বাজখাঁই মেজাজটা শুধু পুলিশকেই দিয়ে গেছে। না হলে এই অশিক্ষিত ছোটলোকদের সামলানো মুশকিল হোত, দেশের আইন কানুন কেউ মানতোনা, অসৎ ছোটলোকগুলো মাথায়

চড়ে বসত। বেশির ভাগ না হলেও তোমার মত দু-চারজন কড়া পুলিশ, কড়া নেতামন্ত্রী আছে বলেই দেশে চন্দ্র সূর্য উঠছে এখনও।

মৃ – ঠিক বলেছেন বাবা। কিন্তু ঐ ভুঁইফোঁড় গণতন্ত্রপন্থী মানবাধিকারবাদীরা এই সোজা কথাটা বোঝেনা। (সুরজ চা বিস্কুট টেবিলে রেখে গেল) একটা ডিমটোস্ট দিয়ে যা শ্বশুরমশাইকে। চিনিসনা ওনাকে ?

সু – কসুর হো গিয়া সাহেব।

হারা – আশীর্বাদ করি আরও বড় অফিসার হও। ভাটিখানায় চললে বুঝি ? শালা লোকনাথটা বড্ড বাড় বেড়েছে। একটু ধমকে দিয়ে এসোতো বাবা। শালা শুদ্দু জল মেশাচ্ছে। দুটো গিলেও নেশা হয়না। যাও ওখানে একটু ফুর্তি করে এস।

মৃ – আমাদের কি ফুর্তি করার সময় আছে বাবা। এ গ্র্রামে সরকারী ডিউটিতে বেরিয়েছি। ডিউটির সময় ওসব চলেনা। কর্তব্য আগে।

হারা – বেশ বেশ, এই তো কর্তব্যপরায়ণ পুলিশের মত কথা। সময় পেলে তোমার শাশুড়ি ঠাকরুনের সাথে একটু দেখা করে যেও সবাই মিলে। দাদুভাই দিদিভাইদের দেখিনি অনেকদিন। চলি তাহলে।

মৃ – চলি মানে ? হেলমেট পারেননি কেন ?

হারা – এইতো হেলমেট।

মৃ – হ্যান্ডেলে ঝুলিয়ে রাখলেই কি আইন বাঁচানো হয়ে গেল, ওটা মাথায় পরতে হয়।

হারা – এই, গাঁয়ে গঞ্জে কে আর দেখছে। শহরের দিকে গেলে পুলিশ শালাদের তোলা জুলুমের ভয়ে মাথায় গলিয়ে নেই হ্যান্ডেল থেকে বার করে।

মৃ – খুব বেআইনী করেন। মিছিমিছি একটা কেস খেয়ে গেলেন।

হারা – সেকি, কবে, কখন, কোথায়, কে কেস দিলো ?

মৃ – এইতো এখুনি, আমিই তো দেখলাম আপনার হেলমেটের জায়গায় শুধু তেল চকচকে টাকটা ঝিলিক মারছে সকালের রোদ্দুর পেয়ে।

হারা - ওহ, এই কথা, তুমি আমার জামাই হয়ে আমার বিরুদ্ধে কেস দেবে নাকি ?

তোমার রসবোধ বেড়েছে দেখছি, হা হা হা, তুমি দেখলেও কেস হবে ?

মৃ - হবেনা কেন, এই উর্দিটা পরলে আমি হয়ে যাই শুধু একজন পুলিশ। আপনার জামাইতো তো দূরের কথা, একজন মানুষও থাকিনা তখন। বিচারকদের টেবিলে চোখবাঁধা আইনদেবতার মূর্তী দেখেননি? হাতের দাঁড়িপাল্লার এক পাশে পিনাল কোডের গীতা, আর অন্যটায় জরিমানার টাকা বা জেলখানার চাবি।

হারা – এইবারটি আমায় ছেড়ে দাও বাবা।

মৃ – তা হয়না বাবা। মহাপাপ হবে। গীতা হাতে নিয়ে দিব্যি গেলে চাকরীতে যোগ দিয়েছি। সরকারের সাথে বেইমানি করে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করতে পারবনা। পুলিশের কাজ বড় কঠিন, বড় নির্দয় বাবা। একে বলে ন্যায়দন্ড। আমার কাছে রাস্তাঘাটের দুষ্কৃতী, নিজের বাড়ীর বাপ, শ্বশুরবাড়ীর বাবা, ভাই বোন, স্ত্রীপুত্র, চোর-ডাকাত, কুনাল, নীরব মোদী, সরব মোদী, মোহিত শাহ - নাসিরুদ্দিন শাহ - সব সমান। আপনি যখন আপনার ক্যান্সার আক্রান্ত ভাইপোর কাছে সুদ নেন, তখন আপনি আর জ্যাঠামশাই থাকেননা, শুধু একজন সুদখোর। নিন, সামান্য পাঁচ হাজার খসান।

হারা – সামান্য হেলমেট না পরার জন্য পাঁচ !

মৃ – রাস্তায় পেচ্ছাপ করার জরিমানা যোগ করে পাঁচ।

হা - পেচ্ছাপ ? রাস্তায় ? কখন পেচ্ছাপ করলাম বাবা ? আমিতো মোপেড থাকে নেবে সোজা এই দোকানে ঢুকলাম তোমার চোখের সামনে।

মৃ -বললে হবে, আমি স্পষ্ট দেখলাম আপনি ঐ-ই বাবলা গাছটার পাশে নামলেন, মোপেডটা স্ট্যান্ড করালেন, তারপর বোতাম খুলে ...আমি পরিষ্কার সব দৃশ্য দেখলাম, ফুটবল খেলার মত ধারাবিবরণ দিয়ে দেব নিখুঁতভাবে। মনে রাখবেন এটা পুলিশের চোখ। পুঞ্জাক্ষী। যেন একশো ডিজিটাল ক্যামেরা এক সাথে জুম করছে। সাধুসন্ত পীর পয়গম্বররা

যেমন করে তাদের বৈদিক টেকনোলজিতে ত্রিকাল ত্রিভুবন দেখে। দেখলেও দেখে, আবার না দেখলেও দেখে। একে বলে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি। কোন পাপ লুকানো যায়না ভগবান, আর পুলিশের চোখে। তা সে বাবলা গাছের আড়ালেই হোক, কি প্যান্টের ...

হা – তুমি সত্যি সব দেখেছো আমার ইয়ে – মানে। ..

মৃ – তাহলে আর বলছি কি। আপনি আমার বাবা, শুদ্ধ ব্যাকরণে উপবাপ, মানে কোয়াশি বাপ। মানে বাবার মত। জামাই হয়ে ওসব বেআইনি পাপ দেখা একটু অশ্লীল হয়ে গেছে। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে জজসাহেবের সামনে বর্ণনা দিতে পারবোনা পুরো দৃশ্যটা। কিন্তু সরকারি কাজ বলে কথা। লাজলজ্জা করলে সরকারি কর্তব্য পালন করা যায়না।

হা – তুমি নিশ্চই ভুল দেখেছো। ও জিনিসটা আমার নয়,অন্য কোন লোকের।

মৃ – পুলিশ ভুল দেখেছে! এরপরতো বলবেন ভগবানের চোখে ছানি পড়েছে। আই সুরজ – হা করে শুনছিস কি ? বলনা কি দেখছিস তুই।

সুরজ – হাঁ শাশুড়বাবু, হামিওভি দেখেছে পাপটা। ওটা থেকে ছড়ছড় করে – আমাদের সরকার কখনও ভুল দেখেনা।

মৃ — শুনলেন তো, আর অন্য কোন সাক্ষীর কথা বলছেন ? ঐ যে পীরপুরের বাসটা আসছে, ও বাসের প্যাসেঞ্জেররাও সব কিছু দেখেছে বলবে গীতা হাতে নিয়ে।

হা – সব বুঝলাম বাবা, বড্ডো কড়া স্বাধীন দেশের স্বাধীন পুলিশের আইন। ক্ষুদিরাম-মাতঙ্গিনী, গান্ধী–নেতাজিদের প্রাণ বিসর্জন স্বার্থক। স্বর্গ থেকে তোমাদের ন্যায়বিচার দেখে তাঁদের আত্মার নিশ্চই শান্তি হচ্ছে। আমারও তুমি মনের মত উপযুক্ত জামাই হয়েছো। তোমার আইনজ্ঞান, নীতিজ্ঞান কাজকর্ম জেনে মনে বড় গর্ব হল। বল, এখন কি করতে হবে।

হা – আপনি আমার নিজের বাপের চেয়েও বেশি বাবা। সম্মান দিয়ে বাপ বলে ডাকি। আমার গিন্নীও তার মাতৃবাক্যকে বিশ্বাস করে আপনাকে বাবা বলে স্বীকার করে। কোন সন্দেহ করে না। আমার ভাগের কাটমানি ছেড়ে দিয়ে তিনেই ছেড়ে

দেব পিতৃসম্মানে। কি, এবার খুশিতো? গুরুজনদের খুশি করতে পারলে আমার মনে খুব মজা-আনন্দ হয়।

হারা - সেকি বাবা, জামাই হয়ে ঘুষ নেবে আমার কাছে?

মৃ - (কানে হাত দিয়ে) ছি ছি বাবা, এমন কথা শোনাও পাপ। লোকে শুনলে আমায় অসৎ বলে ভাববে। আর যদি ঘুষও হয়, মনে মনে ভাবুননা কেন যে মেয়ে নাতি নাতনিদের মিষ্টি খাবার জন্য ... না না, এখনই না দিলে যে সাধারণ ক্রিমিনালদের মত হাতকড়া পরিয়ে হাজতে নিয়ে যাবো এমন চশমখোর জামাই আমি নই। আমি গুরুজনদের খুব শ্রদ্ধাভক্তি করি। ভাইপোর কাছ থেকে সুদ আদায়ের যে টাকাটা খানিক আগে পকেটে ঢুকিয়েছেন সেটা এখন জমা করে বাকিটা শালাবাবুকে দিয়ে থানায় পাঠিয়ে দেবেন। পাঁচের কেস তিন হাজারেই ফয়সালা হয়ে গেলো। সক্কালবেলা দুই হাজার ইনকাম আপনার। এবার হাসুন। (হারাধনের পা ছুঁয়ে প্রণাম - মাইকে সমবেত হাস্য)

তৃতীয় দৃশ্য

পঞ্চায়েত অফিস। (অঞ্চল পঞ্চায়েত দুর্যোধন চেয়ারে বসে টেবিলে পা তুলে সিগারেট টানছে। কয়েকজন গুন্ডামার্কা ছোকরা মেঝেতে এদিক ওদিক বসে মদ খাচ্ছে। মৃত্যুঞ্জয়ের প্রবেশ)

দুর্যোধন - এস এস সাহেব, টুলটায় বস। পাঁচ মিনিট। (ছেলেদের উদ্দেশে)

তাহলে আজ রাতেই কাজটা শেষ করে আয়। ঐ এরিয়ার থানাকে বলা আছে। কোন চিন্তা নেই তোদের। মাঠের ওপার থেকে নজরে রাখবে। সাদা পোশাকে। লাশটা ন্যাংটো করে মুখটা থেথলে অ্যাসিড দিয়ে পুড়িয়ে পাশের ডোবাটায় পুঁতে দিবি। কেউ এসে গেলে তার নলিটাও চিরে দিবি। তারপর ওর সদ্যবিধবা দুঃখী বৌটাকে সবাই মিলে একটু আনন্দ দিয়ে আসবি। শালা নান্টুর আস্কারা পেয়ে শুওরের ইয়েটা বড্ড বাড় বেড়েছিল। এবার কে আমার ভাটিখানা তোলে দেখি। আপাতত: এই পঞ্চাশ হাজার রাখ। (টাকার বান্ডিল ছুঁড়ে দিলো

এক ছোকরার দিকে। মৃত্যুঞ্জয় মিটি মিটি হাসতে হাসতে সব কিছু দেখতে থাকলো। ছোকরাগুলো ছোরা ছুরিগুলো ব্যাগে পুরে প্রস্থান করলো) এবার বল মেজসাহেব, কেমন আছো? মেজোয় প্রমোশন হবার পর থেকে তো সাহেবের টিকিটাও দেখতে পাচ্ছিনা আজকাল।

মৃ – কেন স্যার, শুধু গত মাসেরটাই দিতে আসতে পারিনি। টিভি ক্যামেরারা যা পেছনে লাগছে! কারো ভালো দেখতে পারে না ওরা। শুধু হিংসা আর কুৎসা। মন্ত্রীরাই ওদের বাগে আনতে পারছেনা।

দু – কিন্তু তার আগের মাসের ওই মোনার বিধবার উচ্ছেদেরটাওতো বাকি।

মৃ – সব হয়ে যাবে স্যার। প্রমোটারটা একটু ফাঁপরে পড়েছে। রিয়েল এস্টেটের বাজার খুব খারাপ। এদিকে আবার জমি দখল হলেও পাশের পুকুর বোজানোটা বাকি। সেখানেও বাগড়া দিচ্ছে স্থানীয় জলাভূমি বাঁচাও সমিতি। তবে সরকারী অনুদান দেওয়া ক্লাবের মেম্বারদের ম্যানেজ করার প্রসেস চালাচ্ছে প্রোমোটার। তাতেও মোটা টাকার খরচা। সে যাই হোক ফ্লাট বুকিং শুরু হয়ে গেলেই প্রোমোটার আপনাদের প্রাপ্য মিটিয়ে দেবে।

দু – চক্রবর্তীটাওতো বেগড়বাই করছে দেখছি। খেলার মাঠটা আর ফুটপাথের অংশ দখল করিয়ে মন্দির বানাতে দিলাম। পার্টির ছেলেদের কোন ঝামেলা করতে দিইনি। প্রচারের গুণে কদিনেই কালীমাতাটা বেশ জাগ্রতাও হয়েছেন দেখছি। প্রণামী পড়ছে থালা ভরে। বাড়তি আয়ের জন্য কালীর পাশে শনিকেও বসিয়েছে কদিন আগে। দেশে যত চুরি বাড়ছে, পাপ বাড়ছে তত ভক্তিও বাড়ছে। মন্দিরও বাড়ছে রাস্তাঘাটে। শনিবার হলেই পাপীদের ভিড়ে ভিড়াক্কার। কিন্তু আমারটা মেটাচ্ছেনা শালা বামনা। ওর ড্রাগি ছেলেটাকে থানায় ধরে এনে একটু চমকাচ্ছোনা কেন।

মৃ – এমএলএ-র আস্কারায় ওতো আবার নান্টু ঘোষের দিকে ঝুঁকেছে।

দু – তাহলে তিনজনকে টপকিয়ে তোমাকে প্রমোশন

দিলাম কেন। আমাকেও তো উঁচুতলাদের ম্যানেজ করতে হয়। কিছু একটা ব্যবস্থা কর শিগ্গির। এদিকে আবার এ বছর খরাও হলোনা, বন্যাও না। তাই ত্রাণও এলোনা। আমার কপাল দেখছি খুব খারাপ। চার তলার ছাদ ঢালাইটা এখনও বাকি। অবুঝ গিন্নী মার্সিডিজ গাড়ী কেনার জন্য খুব পীড়াপীড়ি করছে। পাঁচ বছরের দু বছরতো কেটেই গেল। কবে হবে সব। পরের ভোটে যদি দলের টিকিট না পাই তাহলে তো সবই যাবে। শুনছি খুনে সন্যাসী নাকি টাকা ঢালছে উপর মহলে। বাকিগুলো আদায়ের ব্যবস্থা কর। তানাহলে তোমার কপালে লোধাশুলি থানা আছে - এই আমি বলে দিলাম। ওখানকার এসিতো এমএলের বাড়িতে এখন থেকেই মোটা খাম দিয়ে দালাল পাঠাচ্ছে।

মৃ - লোধাশুলির কথা মুখে আনবেন না স্যার। বৌ বাচ্চা নিয়ে একেবারে মরে যাব। ওখানে খাবো কি। জঙ্গলের আদিবাসী পাতা কুড়ানীয়াদের কাছ থেকে আর কত আয় হবে। এদিকে গিন্নীর খাঁইও বাড়ছে দিন দিন। সুদখোর হাড়কেপ্পন বাপের মাটির বাড়ীতে জন্মে আমার এতবড়ো দোতলা বাড়ী পেয়েও তার সাধ মেটেনা। আজ এসি চাই তো কাল বিশ হাজারী শাড়ী। (ব্যাগ থেকে দুটো বোতল বার করে) এদুটো এখন রাখুন স্যার। চন্দনপুরের খুনের আসামীর বাপ পাঠিয়েছিল। ভাবলাম এই ইমপোর্টেড স্কচের কদর পঞ্চায়েত স্যারই বুঝবেন। আর সবতো দেখি দেশী পেলেই বর্তে যায়।

দু - বেশ বেশ, খুব ভাল। আজ রাতে আবার তোমাদের এসি সাহেব আসবেন একটু ফুর্তিফার্তা করতে। ভাবছিলাম শহরে যাবো মালটাল আনতে।

মৃ - সেকি স্যার, আমরা থাকতে থাকতে ......

দু - সে আমি জানি। সাহেবের মেমসাহেব খুব কড়া ধাতের মহিলা। সব সময় চোখে চোখে রাখেন। উনি ওনার বালিকাকালের এক দেবদাসের সাথে হঠাৎ করে যাচ্ছেন মায়াপুর, না তারাপীঠে তীর্থ করতে। সেই সুযেগে এসি সাহেব এখানকার সার্কিট হাউস বুক করেছেন থানা ইন্সপেকশন দেখিয়ে। হাবুলবাবুর মেসের মুটি রাঁধুনীটাকে হায়ার করেছি

ওনাকে দেখভাল করার জন্য। উনি যা পান তাতেই খুশি। কোন ছুৎমার্গ নেই। একেবারে সদাশিব, শিবঠাকুরের মত।

মৃ - ঠিক বলেছেন, সাহেব খুবই সজ্জন। সোজা সরল নির্বিবাদী মানুষ। ওদিকে আইনজ্ঞান প্রখর। ধর্ষণ মামলাটা কেমন সুন্দর ধামাচাপা দিয়েছিল বলুন। আমার গিন্নী ওকে দারুন ম্যানেজ করেছিল ডায়মন্ড হারবারের রিসোর্টে চাঁদ দেখাতে দেখাতে।

দু – বড্ড ফেঁসে গিয়েছিলাম মাইরি। কি করে বুঝবো এমন গ্রাম্য এলেবেলে মহিলাটা মাননীয় মন্ত্রী মশাইয়ের শালী। একেবারে কামদুনি করে মেরে ফেলিনি এই রক্ষে। তোমার গিন্নীকে ধন্যবাদ জানাতে ওনাকে একদিন আমার প্রাইভেট বাগানবাড়িতে নিয়ে যাব ডিনার করাতে।

মৃ – ধন্যবাদ স্যার। চলি এখন।

দু - ঠিক আছে। আমার বালি খাদানের ছেলেগুলোকে একটু দেখো।

মৃ – সে আর বলতে হবে না স্যার। (প্রস্থান)

দু – গবা, ও গবা। গ্লাস বোতলগুলো তুলে নিয়ে যা। আর কে এক প্রফেসর এসেছে, পাঠা সে শালাকে।

(পক্ককেশী এক বয়স্ক ভদ্রলোকের প্রবেশ)

প্রফেসর ব্যানার্জী - চিনতে পারিস? মানে চিনতে পারছেন? তোর, মানে আপনার পিতাঠাকুর আমার বাড়ীর মালি ছিলেন। আপনার বাবার অনুপস্থিতিতে আপনিও আমার বাড়ীতে পায়ের ধুলো দিতেন বাগানে জল দেবার জন্য। আপনি আমাদের বাড়ীর ছেলের মত হয়ে পান্তাভাত খেতেন। তারপর আপনি মালির কাজ ছেড়ে মাছের ব্যবসা....

দু – খুব হয়েছে,আর পুরানো ইতিহাস বর্ণনা করতে হবে না। আমার তো কিছুই মনে পড়ছে না। সেসব পুরানা কাসুন্দি ফরগেট করুন। যে ধান্দায় এসেছেন সেটা ঝটপট বলে ফেলুন। অন্ততঃ দু ডজন মাল লাইন দিয়ে আছে। পারিনা আর এতো লোকের আবদার রাখতে। কে ডোবা বোজাবে, কে রাস্তায় দোকান মন্দির ভাটিখানা বসাবে, কার ভাড়াটেকে

উচ্ছেদ করতে হবে - এইভাবে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে আর পারিনা। উপরতলার নেতারা এসব বোঝেন না। তাঁরাতো বলে দিয়েই খালাস - জনগণের সেবা করো, তাদের পাশে থাকো, তাদের মুখে হাসি ফোটাও...আমাদের হয়েছে জ্বালা। নেহাত এমপি সাহেব পাঠিয়েছেন, তাই ঢুকতে দিয়েছি। চটপট বলে ফেলুন আপনার বক্তব্য।

প্রঃ ব্যানার্জী – মানে, ঐ প্রিন্সিপালের প্রমোশনটা।

দু - ইংরেজিতে লেখা আপনার দরখাস্তটা আমি নিজে পড়েছি। ইংরাজীতে আপনার কেমন দখলটা সেটা আমি নিজে আরও ভালো করে যাচাই করতে চাই। তারপর ভেবে দেখবো। কেননা আপনি ইংলিশ মিডিয়াম নন। এত কম যোগ্যতায় আপনি কি করে প্রিন্সিপালের দায়িত্ব নেবেন জানিনা। জানিনা কলেজের ছেলেমেয়েদের কি ভুলভাল শিক্ষা দেবেন আপনি। তার ওপরে আপনি ডাক্তারী ছেড়ে এ লাইনে এলেন কেন সেটাও একটা রহস্য।

প্রঃ - আমি ডাক্তার নই স্যার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে রসায়নে ডক্টরেট ডিগ্রি দিয়েছে।

দু – তাহলে নামের পাশে ড: লিখেছেন কেন দুনম্বরী করে?

প্রঃ – ভুল হয়ে গেছে স্যার।

দু – এদিকে আবার আপনি তিন প্রফেসরের জুনিয়র। এই বিদ্যে নিয়ে ... এম পি সাহেব তো রেকমেন্ড করে দিয়েই খালাস। কত দিয়েছেন সুপারিশ লেখাতে? আচ্ছা আচ্ছা, - থাক সেসব খারাপ খারাপ কথা। যে যার এলেম মত খিঁচবে। আমি বলার কে? এখানে ত্রিশ লক্ষ লাগবে

প্রঃ – একটু বেশী হয়ে যাচ্ছেনা?

দু– আরে মশাই, প্রিন্সিপাল কি ছাগল, না শুওর যে দরদস্তুর করছেন গরুহাটের ব্যাপারীদের মত? কোশ্চেন বিক্রী, ছাত্র ভর্তি করেতো দু বছরেই উঠে আসবে ইনভেস্টমেন্টের টাকা। কমে পারবোনা। পাঁচজনকে নিয়ে আমাদের চলতে হয়। অমুক নেতার শালা, তমুক মন্ত্রীর ভাইপো, ছাত্র ইউনিয়নের সেক্রেটারী, শিক্ষা বিভাগের অফিসার – বখরাদার কি একজন মশাই। এ ছাড়াতো কালীঘাটের জাগ্রতা জীবন্ত মা কালীর

পুজোর খরচতো আছেই। কমে হবে না।

প্রঃ – কবে আসব বলুন?

দু – কালকে এলেই ভালো।

(প্রফেসরের প্রস্থান। অফিসারের প্রবেশ। পেছনে পেছনে একজন পিওন একগাদা সরকারি ফাইল টেবিলে রেখে গেল)

দু – এসো এসো এসডিও সাহেব। আমার অঞ্চলে কেমন আছো বল?

এসডিও – (প্রণাম করে) আপনার ছাতার তলায় ভালোই আছি স্যার। কতগুলো জরুরী ফাইল সই করাতে এসেছি স্যার।

দু – সব ঠিক দেখে নিয়েছো তো? আমার পিএ বলছিল তোমার নোটে নাকি ভুলভাল ইংরাজী থাকছে। কোথায় নাকি জয়েন্টেড এর জায়গায় জয়েন্ড লিখছ, নিমুনিয়া শব্দের আগে অহেতুক একটা পি বসিয়ে দিচ্ছ – এই বিদ্যে নিয়ে তোমরা আইএএস, বিসিএস পাশ কর কি করে?

এসডিও – কাজের চাপে মাঝে মাঝে এমন ভুল করে ফেলি স্যার। অপরাধ ক্ষমা করবেন।

দু – ফাইলগুলো রেখে যাও। পরে দেখেশুনে সই করে দেব। সব। আমার লোকেরা তোমার সব প্রাপ্য দিচ্ছে তো নিয়ম আইন মত?

এসডিও — হ্যাঁ স্যার, সব ঠিক আছে। তবে পার্সেন্টেজটা একটু বাড়ালে ভালো হয়। গিন্নীকে নিয়ে একটু বিদেশ যাত্রার ইচ্ছে আছে।

দু – ঠিক আছে, নতুন চরের বালিখাদান থেকে ট্রাক পিছু একশ তুমি এক্সট্রা পাবে। তবে এখনকার মত যেন মাখনের মত কাজ চলতে থাকে।

এসডিও – থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ।

(পায়ের ধুলো নিয়ে জিভে ঠেকিয়ে এসডিও সাহেবের প্রস্থান)

মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়ী

(সর্বপ্রিয়া টিভি দেখছিল। মৃত্যুঞ্জয়ের প্রবেশ)

সর্বপ্রিয়া – দেখলেতো, আমি কী বলেছিলাম? ওই বৌ'টাই খুনি। বরের বসকে নিয়ে হোটেলে যেত ফুর্তি করতে। স্বামী জেনে যাওয়ায় মদের মধ্যে বিষ মিশিয়ে ওকে খুন করেছে। ঐ বৌগুলোকে গুলি করে মারা উচিত।

মৃ – তুমি আবার সিরিয়ালের বৌ'টার মত আমাকেও খুন করো না যেন।

সর্ব– তুমি যেন কি! কিচ্ছু মুখে আটকায় না। যত্ত আজগুবি অলুক্ষুণে কথা।

মৃ – লাল পার্টির অজয় সামন্তের কথাই বোধ হয় ঠিক। সেদিন বক্তৃতায় বলছিল "শুধু টিভি সিনেমার নাটকে নয়, আজকাল এ'সব হচ্ছে ঘরে ঘরে। কাগজে আর ক'টা বেরোয়। স্বামীগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে টাকার ধান্দায়, আর উপোসী বৌগুলো বোল্ড রিলেশন করছে ফ্রেন্ডশিপ ক্লাবে। সমাজ সংসার সব পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে। শুধু খাই খাই, শুধু টাকা আর ভোগের লালসা। একদিন সব ঘরে আগুন জ্বলবে।" লোকটা আমাদের পার্টির নামে যা তা বলে বটে, তবে তার কথাগুলোর ভেতর চিন্তার বিষয় আছে।

সর্ব – তোমার আজ হলো কি? কি সব উল্টোপাল্টা বকছো বুদ্ধিজীবীদের মত! দার্শনিক হয়ে গেলে নাকি?

মৃ – আমার আজকাল কিছু ভালো লাগছেনা। মানুষ ভেতরে ভেতরে যেন ধিকি ধিকি করে জ্বলে উঠছে আগ্নেয়গিরির মত। যেকোন সময় অগ্নুৎপাত হয়ে দেশটাকে পুড়িয়ে দিতে পারে। ভীষণ ভয় হচ্ছে কাজকর্ম করতে। শুনলাম বুড়ো পুলিশ মন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ অল্পবয়সী বান্ধবীর বাড়ী থেকে নাকি কেজি কেজি সোনা আর কোটি কোটি টাকা পেয়েছে পুলিশ!

সর্ব – এত টাকা নিয়ে করবেটা কি?

মৃ – সে আর বুঝছে কে? লাল পার্টির অজয় সামন্ত সেদিন বক্তৃতায় বলছিল, "সবাই একটা ঘোরের মধ্যে আছে। তারা

কি চাচ্ছে, কেন চাচ্ছে, কি করছে তারা নিজেরাই জানেনা। টাকাগুলো খরচই করতে পারবেনা সারা জীবনে। হয় সুইস ব্যাংকে পচবে, না হয় ছেলে মেয়েরা ড্রাগ মদ খেয়ে ওড়াবে।” নাও, টাকাগুলো তুলে রাখ আলমারিতে। আজ আদায়টা ভালো হয়েছে।

সর্ব – শোন, তোমার ছেলের হাজার দশেক লাগবে কালকে।

মৃ – কি ব্যাপার, একেবারে কালকেই? এত্ত টাকা!

সর্ব – তোমার কি ঘর সংসারের দিকে এতটুকু নজর নেই? কাল যে তোমার ছেলেটার জন্মদিন সেটা ভুলে গেলে!

মৃ – ওহো, তাইতো বটে। পায়েস টায়েস বানাও তাহলে।

সর্ব – আজকাল ওসব পায়েস নাড়ুর চাল নেই। যত্ত গ্রাম্য কালচার। সমাজটা অনেক এগিয়ে গেছে। (চা বিস্কুট টেবিলে রাখলো সর্বপ্রিয়া)

মৃ – (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) আমার মাও জন্মদিন করতো আমার। সে সব কথা মনে হলে বুকটা উদাস হয়ে যায়। শঙ্কর মাস্টারের বাড়ি থেকে এক পোয়া দুধ চেয়ে এনে ফ্যানা ভাতে খানিকটা গুড় আর ওই দুধ মাখিয়ে পায়েশ খাওয়াতো আমায়।মায়ের স্নেহমাখা সে অমৃত এখনও মুখে লেগে আছে। মাকেও তাড়ালাম, মাতৃসুখও হারালাম। এখন বড় আফসোস হয়। তা ছেলের একেবারে দশ লাগবে কেন?

সর্ব – ওরা সব বন্ধুবান্ধব মিলে শহরের হোটেলে পার্টি করবে।

মৃ – পাঁচই দিয়ে দাও।

সর্ব – বলেছিলাম সে কথা। বলে ওতে নাকি শুধু উইস্কির বিলও মেটানো যাবে না।

মৃ –তাবলে এত টাকা পাব কোথায়। এইতো মাইনে।

সর্ব – সেটাও বলেছিলাম। বললো বাবা নাকি লক্ষ লক্ষ টাকা কামায় বলে ওর বন্ধুরা বলাবলি করে। একটু ভদ্রভাবে পার্টি না দিলে ওর খুব দুর্নাম হবে। তোমারও মান মর্য্যাদা থাকবেনা .

মৃ – এটা অবশ্য ঠিক। মেয়েকে দেখছিনা কেন?

সর্ব – ওতো কালই দিঘা, না বকখালি কোথায় একটা গেছে

উইকেন্ড কাটাতে। ওর কলেজের অনেক নেতা মন্ত্রী লাখপতি কোটিপতির ছেলেরা ওর বন্ধু হয়েছে কিনা। ওদেরই একজন ট্যুরটা স্পনসর করছে।

মৃ - দেখো, আবার কোনও কেলেঙ্কারি ফেলেঙ্কারি না বাধায়। বড়ি টোরি সাথে দিয়েছো তো।

সর্ব - সেটা তুমি আমায় বলে দেবে? হোটেলে রিসোর্টে আশ্রমে তীর্থে পুরুষমানুষগুলো গাঞ্জা মদের নেশায় কি রকম পাগল পাগল হয়ে যায় সেটা আমার চেয়ে কে বেশি জানে। হাড়ে হাড়ে বুঝেছি সব।

মৃ - মহিলারাও যে কমতি যায়না সেটাও আমি শুধু হাড়ে হাড়ে নয়, একেবারে মজ্জায় মজ্জায় বুঝি।

সর্ব - তুমি কি আমায় সন্দেহ কর নাকি?

মৃ - ছি ছি সর্ব, তুমি কি ঠাট্টা ইয়ার্কিও বোঝোনা?

দৃশ্য - মন্দির

(পূজারী ঘন্টা নেড়ে প্রদীপ নাড়িয়ে আরতি করছেন ভক্তরা হাত জোড় করে বসে। কয়েকজন কাঁসর ঘন্টা বাজাচ্ছে নেচে নেচে। আরতি শেষে পুরুতের হাত থেকে প্রসাদ নিয়ে ভক্তরা সব প্রণামী ঢুকিয়ে দিলো বাক্সের ফোকরে। তারপর সবাই একে একে বেরিয়ে গেলো মন্দির থেকে। প্রণামী নৈবেদ্য সব ব্যাগে পুরে পূজারী ঠাকুর বেরুতে যাবেন, এমন সময় দেখেন কে একজন যেন এক কোনায় বসে আছে চাদরমুড়ি দিয়ে।)

পূজারী - কে ওখানে? ওকি, মৃত্যুঞ্জয়, এভাবে বসে কেন? তোমার কী হয়েছে?

মৃ - আমায় বাঁচান ঠাকুরমশাই। আমি নরকে যেতে বসেছি। (কান্না)

পু: - বলি হয়েছেটা কী? এত উতলা কেন? এতবড় ডাকসাইটে পুলিশ অফিসার হয়ে কার ভয়ে মেয়েদের মত কাঁদছো? (পূজারীর কানে কানে মৃত্যুঞ্জয় কিছু একটা বললো) এতো সাংঘাতিক ব্যাপার। মহাপাপ করেছে তোমার মেয়ে।

পরিবারসহ তোমাদের সবার নরকগমন অবধারিত। আইবুড়ো মেয়ের এ পাপের ক্ষমা নেই। কয় মাস হলো?

মৃ - জানিনা ঠাকুরমশাই, আমায় উদ্ধার করুন। আমি ঈশ্বরভীরু মানুষ। প্রতি গুরুবারে আমার গিন্নী এসে একশো টাকার প্রণামী দিয়ে পুজো করে যায় এখানে। সৎসঙ্গে দীক্ষা নেবার পর নিরামিষ খাই। হাতের সব আঙুলে নয় গ্রহের নয়টি আংটি পরি। জীবনে কোনও পাপ করিনি। আমাদের মেয়ে মদ সিগারেট খেলেও দেব দ্বিজে খুব ভক্তি। শিবের ব্রত করে, শিবের মাথায় জল ঢালে তারকেশ্বরে গিয়ে। পুরীর মন্দিরেও যাই, দিঘার নতুন মন্দিরেও। তবু আমার এমন কেন শাস্তি হলো ঠাকুরমশাই? নরককে আমি বড্ড ভয় পাই। যাগযজ্ঞ যা করেই হোক আমাদের উদ্ধার করুন।

পু: - সেতো অনেক খরচের ধাক্কা। প্রনামীই শুধু লাখখানেক লেগে যাবে। তার ওপর মায়ের স্বর্ণমুকুট, সোনার জিভ........

মৃ - এত্ত?

পু - এটাকি ছোটোখাটো ব্যাপার বাবা। আইবুড়ো মেয়ের ইয়ে। গোহত্যা বামুনহত্যার সমান পাপ। ফল, অনন্ত নরক। যে মামলায় যেমন খরচ। তোমার এত চিন্তা কিসের। পুলিশের চাকরী, ভালো মাইনে, ভালো উপরি - মায়ের আশীর্বাদে তোমারতো কোনও অভাব নেই। এতো আর পুলিশ, ডাক্তার,উকিলদের দিচ্ছো না, মা'কেই তো দিচ্ছ। দেখবে করুণাময়ী মা সব দুইগুণ ফিরিয়ে দেবেন। যাও, সামনের অমাবস্যার রাতে চলে আসো সব অনুপান নিয়ে। ফর্দটা তোমার গিন্নীর হাতে পাঠিয়ে দেব। তোমার আর কি, একবার হাঁকিয়ে দেবে, আর দশকর্ম, মালী, স্যাকরা সব অনুপান পড়ি কি মরি করে সোজা হোমডেলিভারি করে দেবে এই মন্দিরের ঠিকানায়। আরে বাবা, এতো আর ঘুষ নয়, প্রণামী-প্রণামী। প্রণামী দেবে মাকে। তোমার ভয় ভীতি দানধ্যান দেখে ধন্য ধন্য করবে দেশবাসী। আবার দয়াময়ী মা তোমার মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেবে তার প্রেমিককে বশীকরণ করিয়ে। একই খরচে একসাথে পুরুত জ্যোতিষের দুজনের দুটো কাজ করিয়ে দেব আমি।

মৃ – কিন্তু কে ওর সর্বনাশটা করলো তাতো বলতে পারছে না আমার সোজা সরল মেয়েটা। বশীকরণ করবেন কাকে। ওর ছেলে বন্ধুতো গন্ডা গন্ডা।

পু – সবকটাকে গ্রেপ্তার করে থানায় এনে পিটিয়ে দাও, বাপ বাপ বলে সব বলে দেবে পটাপট। সবই মায়ের ইচ্ছা বাবা। যাও, মন শুদ্ধ করে ব্যবস্থা করে ফেল। চিন্তা করোনা, আমিতো আছি, ভয় কিসের?

উকিলের চেম্বার

মৃত্যুঞ্জয় – ছেলেকে আমার জামিন করিয়ে আনুন উকিলবাবু। শালা সিবিআই পুলিশ ওকে খুব মারছে দিন রাত। আপনার পায়ে পড়ি উকিলবাবু।

উকিল – সেকি, সেদিন জোর গলায় বললেন, আপনি প্রবল পুলিশ অফিসার, কাউকে পরোয়া করেননা, ডজন ডজন এসি, ডিসি, নেতা মন্ত্রীদের সাথে আপনার ওঠা বসা। সবার কীর্তিকলাপ ফাঁস করে দেবার এলেম আছে আপনার। সবাই আপনার হাতের মুঠোয়, এমন কি জজ সাহেবরাও নাকি ....আপনার পেয়ারের পার্টি মাস্তানরা লকাপ ঘেরাও করে ছেলেকে ছাড়িয়ে আনছেনা কেন।

মৃ – সবাই হাত ধুয়ে ফেলেছে স্যার। ঐ মিডিয়াই কাল হচ্ছে। সব ছবি তুলে বারে বারে টিভিতে দেখিয়ে লোকগুলোকে খেপিয়ে দিচ্ছে। সব রিপোর্টারদের সিডিশন আইনে গ্রেপ্তার করা উচিত। সকাল বিকাল ২৪ ঘন্টা মহা আনন্দে এমন কুৎসা রটাচ্ছে যে নেতা মন্ত্রীরাও সামাল দিয়ে কেলেঙ্কারীগুলো চেপে যেতে পারছেনা। সবাই এখন নিরপেক্ষ হয়ে গেছে। কথায় বলে কাজের বেলায় কাজী, কাজ ফুরোলেই পাজি। যাদের কেচ্ছা কেলেঙ্কারী দুর্নীতি এতদিন চাপাচাপি দিয়ে এলাম তারা এখন বলে আইন আইনের পথে চলবে। তানাহলে নাকি ভোটের মুখে তাঁদের ভাবমূর্তি কেঁচে যাবে। এখন আপনিই আমার একমাত্র ভরসা।

উকিল – কিন্তু আপনার ছেলে তার দুগুণ বয়সী মহিলাকে

টার্গেট করতে গেল কেন? রাস্তাঘাটের আপনাদের আদুরে ছেলেরা কত্তো কম বয়সী সহজ শিকারদের ধরছে। আর তা আপনারা শুধু দেখছেন, আপনাদের নেতামন্ত্রীরাও আস্কারা দিচ্ছেন।

মৃ - খুব ভুল হয়ে গেছে স্যার।

উকিল–শ্লীলতাহানি করেছে করেছে ঠিক আছে। আজকাল এ রাজ্যে সব জলভাত। আগেও এসব হতো চুপিসাড়ে। শাস্ত্র পুরাণের গল্পগুজবের সাধু সন্ন্যাসী দেবদেবীরাও ছেড়ে কথা বলতেন না। সোশ্যাল মিডিয়ার খোলামেলা কুকুর বিড়ালদের মত ফিল্মি প্রেম দেখে এখন এসব রোগ একটু বেড়েছে মাত্র। তবে আজকাল ওসব নিয়ে কেউ তেমন একটা মাথা ঘামায়না। বেশির ভাগ গুরুজনেরা ঘটনাগুলো চেপে যান লোকলজ্জার ভয়ে। মন্ত্রী আমলারাও। কিন্তু আপনার পুত্তুর খুন করতে গেল কেন?

মৃ - ওর কোন দোষ ছিলনা স্যার। বদমাস মহিলাটা ওকে চিনে ফেলেছিল ঐ মধুচক্রের ঠেকে।

উকিল – তাবলে একেবারে খুন! তাও আবার আইপিএসের বৌকে!

মৃ – আমার ছেলেটা বড্ডো সোজা সরল। তখন ও নরম্যাল ছিল না। সেদিন তার জন্মদিন ছিলতো। বন্ধুবান্ধবদের সাথে একটু বেশি নেশা করে ফেলেছিল। মাথার ঠিক ছিলনা। একটা কোন আইনের ফাঁক দেখিয়ে ওকে বের করে অনুন না স্যার।

উকিল - এতো আর শুধু আইনের ফাঁকে হবেনা। অনেক খরচ আছে। আইন-টাইন সব নোটের ওপরেই লেখা থাকে। এখানে আবার সরকারী উকিলটা মৌলবাদী ধড়িবাজ। বামপন্থী। এক পয়সা খেতে চায়না। তবে আর সবের খাঁই অনেক। প্রথমেই দশ লক্ষ লেগে যাবে।

মৃ - এতো কি করে দেব স্যার? আমি সামান্য নিচু তলার পুলিশ। সামান্য মাইনে। আর্তি যা রোজকার হয় তার বেশির ভাগটাই চলে যায় পর পর উঁচুতলার পেট ভরাতে। একটু কমেসমে করুন স্যার।

উকিল - আপনি একজন দায়িত্ববান অভিজ্ঞ পুলিশ হয়ে

কি সব উল্টাপাল্টা বকবক করছেন। আপনারা নিজেরাইতো চা-ওয়ালা, খোঁড়া রিক্সাওয়ালা, ট্রেনের ফেরিওয়ালা, এমন কি মন্দিরের সামনে বসা ভিখারিদের পর্যন্ত মাসকাবারী কমান না এক পয়সা। সব খবরই পাই আমি।

মৃ - বড্ডো ভুল করেছি এতদিন। আর করবো না ওসব পাপ। সহকর্মীদেরও সাবধান করে দেব।

উকিল - আজ থেকে আমি বাল্মীকি হয়ে গেলাম বললে হয়?

মৃ - আমার কেসটা একটু সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করুন স্যার। এমএলএ মার্ডার কেসটায় সরকারি উকিল কি স্ট্রাটেজি নিচ্ছে সে খবর দেব। পরস্পর এভাবে না দেখলে আমরা বাঁচবো কি করে?

উকিল - ঠিক আছে আমার ফিস্টে না হয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু পুলিশ খরচ,নেতার খরচ, রিপোর্টারদের খরচ .... আপনি লাখ পাঁচেক নিয়ে আসুন, জামিনের ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

মৃ - শুধু জামিনের জন্য........

উকিল - শুনুন, এটা আপনার স্টেট পুলিশের কেস নয়, কোর্টের এদেশের জেরে সিবিআই মামলা। দেখছেন না দলেরই সব বাঘা-বাঘা এক নম্বর দুই নম্বর নেতা মন্ত্রীরা মাসের পর মাস জেল খেটে খেটে শুখনো মড়াকাঠ হয়ে যাচ্ছে। তাহলে বুঝুন মফস্বল থানার সেকেন্ড অফিসারের ছেলের কি দশা হবে।

মৃ - বুঝছি উকিলবাবু, কেউ কারো নয়, সুযোগমতো সবাই সবাইকে চুষছে জোঁকের মত। নেতা মন্ত্রী, সিন্ডিকেট, ক্লাব, গুন্ডা বদমাস, ছেলে বৌ - সব্বাই সব্বাই সমান কেউ কারো নয়। এতদিন আপনার বিপক্ষদের সব খবর দিয়ে সব খবর দিয়ে এসেছি। সুযোগ বুঝে আপনিও আমার বুকে

উকিল - এমনকি আপনিও আপনার বসে নেই।

মৃ - ঠিক আছে উকিলবাবু, আমি বিকালেই আসছি।

নার্সিং হোম

ডাক্তার বোস - কি ব্যাপার বাঘা দারোগা? এদিকে কেন?

মৃত্যুঞ্জয় – মানে একটু বিপদে পড়েছি।

ড: – আবার কার বাঁধলেন? আগেকার বান্ধবীটা ভালো আছেতো? পাপীটা কে ছিল জানতে পেরেছেন কি? আপনি যে নন সেটা আমি জানি। কোনও এক পরোকীয়া রসিক আপনার হাতে তামাক খেয়ে আপনাকে ফাঁসিয়েছিল।

মৃ – খুব বাঁচিয়েছেন ডাক্তারবাবু, বৌ জানতে পারলে হুলুস্থুলু কান্ড হয়ে যেত। এবার এসেছি আমার নিজের মেয়ের জন্য।

ড: – আপনার – নি-জের মেয়ে!! এটাও মনে হচ্ছে পরকীয়া কেস। মিহিরবাবু, কুড়ি বয়স বছরের পুরানো সিমেন্স রিপোর্টের ফাইলগুলো খুঁজে অনুনতো। কতদিন হলো?

মৃ – চার মাস ডাক্তারবাবু।

ড: – চা-মাস! এতদিন কি নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছিলেন নাকি। চারমাস ধরে বাড়তে দিয়েছেন পাপটাকে! আশ্চর্য! এত পুরানো কেস আমি অপারেশন করতে পারবো না। আমার যন্ত্রপাতি তত আধুনিক নয়। কলকাতার কোন নার্সিং হোম থেকে মালটা খালাস করিয়ে নিয়ে আসুন।

(মৃত্যুঞ্জয় ডাক্তারের কানে কানে কিছু বললো। ডাক্তার ইশারা করে নার্সকে বাইরে যেতে বললেন।)

মৃ – যত টাকা লাগে করে দিন স্যার। অচেনা জায়গায় যেতে সাহস হয়না। আমার এমন ভালো চাকরি, মানসম্মান সব ভেসে যাবে ডাক্তারবাবু।

ড; – আজকালকার উদার খোলামেলা সমাজে এসবে মান সম্মান যায়না। বড় বড় অভিজাত ঘরে এমন পরকীয়া কাণ্ডতো জলভাত। সমাজ সরকার দ্বারা স্বীকৃত। এইতো সেদিন কলকাতার ভেসেক্টমি করা মস্ত বড় অফিসারের মাঝবয়সী গিন্নি বেড়াতে যাবার নাম করে খালাস করে গেল দশ লক্ষ দিয়ে। চার চারটে দামড়া দামড়া ছেলে, স্বামী-আত্মীয় কাকপক্ষী টেরই পেলোনা। হোটেলে ডিস্কোতে নেশার ঘোরে কি সম্ভ্রান্ত, কি হঠাৎ বাদশা হওয়া প্রোমোটার সিন্ডিকেটের বাড়ির উপোসী মহিলারা তাড়াহুড়ো করে আজকাল ভুলে

যান প্রটেকশন নিতে।

মৃ – ওদের কথা ছাড়ুন, এ ব্যাপারে আমাদের গাঁ-গঞ্জও আধুনিক হয়ে গেছে। পুলিশ সব খবর রাখে। আমার মেয়ের ব্যাপারে লাখ দুই দিয়ে দেব।

ড: – কি সব বলছেন আজেবাজে কথা। এটাকি ভাড়াটে উচ্ছেদ? প্রোমোটার টেবিলের তলায় পাতা আপনাদের বাঁ হাতে দু লক্ষ ধরিয়ে দিলো, আর অমনি জনসেবক মা মানুষের স্বেচ্ছাসেবীরা এসে ভাড়াটেকে টেনে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দশ মিনিটে অপারেশন শেষ করে ফেললো। আর আপনি বন্ধুক হাতে ওদের পাহারা দিতে থাকলেন দূরের গাছের আড়ালে। ডায়রিও নিলেননা নিঃসঙ্গ বুড়ি ভাড়াটের। আপনার মেয়ের শরীরে অনুপ্রবেশকারী অবাঞ্চিত দখলদারটাকে উচ্ছেদ করতে গিয়ে ভালো মন্দ কিছু যদি হয়ে যায় তার হ্যাপা সামলাবে কে। থানা, পুলিশ, পাড়ার মাতব্বর, পার্টির সেচ্ছসেবীদের খরচ কত বেড়েছে জানেন? অবশ্য মায়ের কাছে মাসির গল্প আর কি বলব।

মৃ – ঠিকঠাক বিবেচনা করে বলুন কত দেব।

ড: – কেলেঙ্কারীটা জানাজানি হয়ে গেলে আপনার ভাবি বেহাই মশাই বিশ লক্ষ কাটমানি না নিয়ে ঐ এঁটো মেয়েকে ঘরে ঢোকাবে ভেবেছেন?

মৃ – আপনি আমায় ব্ল্যাকমেল করছেন, ডাক্তারবাবু।

ড: – সে আপনি বলতে পারেন বইকি। কিন্তু সেটাতো আপনাদের কাছ থেকেই শেখা। নেতামন্ত্রী, সরকারি আমলাদের কালো টাকার গন্ধ পেলে আপনারা কি বেচারাদের ব্ল্যাকমেল করেননা? আর ন্যাকামো করবেননা, মেয়েকে উপোসী রেখে আট লাখ ক্যাশ নিয়ে পরশু আসুন রাত দুটোয়। এপেন্ডিক্স অপারেশনের একটা এস্টিমেট লিখে দিচ্ছি কাছে রাখুন। কেউ জানতে চাইলে ওটা দেখাবেন। আর এই এন্টিবায়োটিকগুলো খাওয়াতে থাকুন নিয়ম করে।

মৃ – ঠিক আছে ডাক্তারবাবু। হাতি এখন কাদায় পড়েছে। তবে ব্যাপারটা যেন গোপন থাকে।

ড: – আরে এসব কাজ গোপনে না করলে আমাদের নার্সিং

হোমের ব্যবসাটাই লাটে উঠে যেত। এবার আসুন আপনি। (নার্স এসে ডাক্তারের হাতে একটা কাগজ দিয়ে গেল) আচ্ছা একটু বসুন। এই দেখুন বহু আগে করা আপনার সিমেন্স রিপোর্টের কপি। আপনার স্ত্রী আসল রিপোর্টটা ডেলিভারি নিয়ে গেছেন সই করে। আপনার সিমেন্স কাউন্ট জিরো অর্থাৎ বিজ্ঞানমতে আপনার ছেলেমেয়ে আপনার ঔরসজাত হতেই পারে না। আপনার বান্ধবীর সন্তানটিও আপনার ছিল না। এতো আর আধ্যাত্বিক শাস্ত্রীয় গল্পগুজব নয় যে কবিতা ফাঁদলাম, আর মহাকাব্যের নায়করা টুপ টুপ ঝোরে পড়লো সতী রানীমাতাদের পেট থেকে।

মৃ – কি বলছেন আপনি। আমার ছেলে মেয়ে আমার ঔরসে জন্মায়নি! আমি আপনার নামে মানহানির মামলা করবো।

ডঃ – তার আগে আপনার সতীসাধ্বী গিন্নীর কাছে জেনে নিন কে আপনার ছেলেমেয়েদের বাবা। এখনতো দেখছি আপনার পরকীয়া বান্ধবীদের ক্ষেত্রেও কেউ আপনার হাতে তামাক খেয়ে গেছিল। মজা লুটলো অন্য লোক, আর তাদের বাচ্চাদের আপনি নিজের বাচ্চা ভেবে আমাদের অপারেশন ফি মেটালেন ওদের খালাস করাতে।

মৃ – আমি এখন আসি ডাক্তারবাবু। (প্রস্থানোদ্যত)

ডঃ – আরে, বসুন। বসুন মশাই। এত উতলা হবার কিছু নেই। এই ডাক্তারী লাইনে এসে আমরা সব দার্শনিক হয়ে গিয়েছি। প্রকৃতির নিয়ম যত কঠোরই হোকনা কেন তা মেনে নিতে শিখেছি। সত্যেরে নিন সহজে। এত ভাবাবেগ সেন্টিমেন্ট নিয়ে বেঁচে থাকা যায়না। কেউ সত্যি সত্যি সতী নয়, আপনিও নন, আপনার গিন্নিও নন। অন্যান্য সুখী মানুষদের মত জীবনটাকে উপভোগ করুন – গিন্নি গিন্নির মত, আপনি আপনার মত। মনোবিজ্ঞানের পাঠ্য বই 'আই আম ওকে, ইউ আর ওকে' বইটা পড়ে নিন। আপনিও মধুমতীর সাথে দেখা করুন, আপনার স্ত্রীও ডায়মন্ড হারবারে ট্যুর করুক। মাননীয় আদালত বলেছেন পরকীয়া ফস্টিনস্টি সবার সাংবিধানিক অধিকার। সব গ্লানি মুছে ফেলুন। 'স্ত্রী' ছবির উত্তমকুমারের মত মিথ্যা আবেগের বশে কোনও কেলেঙ্কারী করে বসবেন

না যেন। উইশ ইউ গুড লাক। মেয়েকে নিয়ে চলে আসুন যেমনটি বললাম।

–আশারাম বাবার আশ্রম–

(ধ্যানে বসেছেন গুরুবাবা। ধর্মবাজারের গুরুবাবাদের মতই চোখ ঢুলুঢুলু– হাফবন্দ পদ্মলোচন। মুখমণ্ডলে প্রশান্তির ভাব। সর্বপ্রিয়া সামনে বসে হাপুস নয়নে কাঁদছে। মৃত্যুঞ্জয়ের প্রবেশ। সর্বপ্রিয়ার দিকে রিভলভার তাকে করে)

মৃ – বল, বল ডাইনি, কে, কে আমার ছেলেমেয়েদের বাপ।

সর্ব: বলছি বলছি, সব যখন জেনে গেছ, সব বলছি, রিভলভারটা নামাও। এই গুরুবাবা আর তার ছেলে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের নাম করে রাতের পর রাত আমার ওপর অত্যাচার করেছে। বাপ ব্যাটাদের কোন একজন আমাদের মোহিনীর বাবা। (মৃত্যুঞ্জয় আশারামের মাথা লক্ষ করে গুলি করলো। গুলির শব্দ শুনে গুরুবাবার ছেলে সত্যানন্দ ব্রহ্মচারী ছুটে আসতে ওকেও গুলি করলো। তারপর সর্বপ্রিয়ার দিকে রিভলবার তাকে করে)

মৃ – এবার বল কে আমার ছেলের বাবা।

সর্বজয়া – বলছিগো, বলছি, বন্দুক নামাও। তোমার এসি সাহেব ....

মৃ – তাহলে মর তুই (সর্বপ্রিয়ার মাথায় গুলি)

সার্কিট হাউস

মৃত্যুঞ্জয় – (জানালার দিকে হাত উঁচিয়ে রিভলবার তাকে করে) বল শালা বড়কর্তা, কে আমার ছেলের বাপ। বল, বল, বল শালা বড় কুত্তা।

এসি – (ঘরের ভেতর থেকে) কি সামান্য একটা থানা অফিসার হয়ে এসির প্রাইভেট বেডরুমে উঁকি! তোকে আমি ক্লোজ করবো।

মৃ – তার আগে তোর হৃৎপিন্ডটাকেই আমি চিরতরে ক্লোজ

করে দেব লম্পট। কাল সকালে পুলিশ এসে দরজা ভেঙে তোর ঐ উলঙ্গ চেহারাটা দেখাবে দেশবাসীকে, তারপর পোস্ট মর্টেম করবে মৃত ডিকম্পোজড সমাজটার। (গুলি, দর্শকদের দিকে মুখ ফিরিয়ে) সবার খেল খতম, এবার তোমার পালা মৃত্যুঞ্জয় ...শেষ বুলেটটা তোমারি জন্য (মাথায় গুলি)

যবনিকা পতন

(হল থেকে বেরুতে বেরুতে পাশাপাশি বাড়ীর জানালা থেকে দর্শকরা টিভির সংবাদ শুনতে পাবেন) এই হলো প্ল্যানেট, আপনারা দেখছেন প্ল্যানেট আনন্দ। আনন্দে থাকে, আনন্দে রাখে। আজকের বিশেষ বিশেষ খবর হল, হরিহরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দুর্যোধন নস্কর খুন। ভেড়ি ও চোলাই কারখানার দখল নিয়ে একই দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে এই খুন বলে স্থানীয় মানুষের সন্দেহ। সেটা মানতে রাজি নন বিধায়ক মানিক মন্ডল ওরফে গলাকাটা মন্টু। তার মতে পারিবারিক বিবাদের জেরেই এই খুন। অভিযুক্ত নান্টু ঘোষের বাড়ি জ্বালিয়ে দিলো উত্তেজিত গ্রামবাসী। নান্টু ও তার দলবল বেপাত্তা। তদন্ত চলছে। * মন্ত্রীপত্নী ধর্ষণ ও খুনের দায়ে অভিযুক্ত পুলিশপুত্র গ্রেপ্তার। চোলাই দোকানের মালিক খুনে অভিযুক্ত গুন্ডা বশীর আহমেদ সহ বারোজন আসামির বেকসুর খালাস। নিয়মমতো তদন্ত ও সাক্ষপ্রমান না দেবার জন্য পুলিশকে বিচারকের ভর্ৎসনা। সিবিআই তদন্তের দাবী মৃতের আত্মীয়ের। * উচ্চপদস্থ আমলার ৪৭ বছর বয়সী গৃহবধূর মেদিনীপুরের গরপাড় গ্রামের 'নিষ্কৃতি নার্সিং হোমে' গর্ভপাত করাতে গিয়ে প্রাণ দিলেন। নার্সিং হোম ভাঙচুর, ডাক্তার প্রহৃত। * এইমাত্র এক চাঞ্চল্যকর আত্মহত্যা ও সিরিয়াল হত্যার খবর পাওয়া গেলো। ঝাড়বুনি থানার সেকেন্ড অফিসার মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল একে একে তাঁর স্ত্রী, পারিবারিক গুরুদেব, গুরুপুত্র এবং তাঁর এসিস্ট্যান্ট কমিশনারকে গুলি করে নিজে আত্মঘাতী। মৃত্যুঞ্জয়ের অবিবাহিত কন্যার জলে ডুবে মৃত্যু। সন্দেহ মেয়েটি অন্তঃস্বত্বা ছিল। পরিবারটি প্রায় সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো। পরিবারের একমাত্র জীবিত সদস্য নাবালক দেবপ্রিয় গৃহবধূ

ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগে ফাঁসিকাঠে ঝোলার অপেক্ষায় হাজতে। মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়ীর মেঝে খুঁড়ে কোটি টাকার গহনা ও টাকা উদ্ধার। * পাটনার স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে প্রধান শিক্ষক ও দারোয়ানের গণ ধর্ষণ। * হাজার কোটি টাকা ব্যাংক লোন নিয়ে বিদেশপাড়ি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীশ্যালকের।* অধ্যক্ষ নিয়োগকে কেন্দ্র করে অধ্যাপক ও ছাত্রনেতা খুন হলেন নিজের কলেজে। দেশ ও রাজ্যবাপী এমন গণঅপরাধ দেখে নেতা মন্ত্রী সমাজবিজ্ঞানী সাহিত্যিক সব শ্রেণীৰ বিদ্বজনেরা উদ্বিগ্ন। কুসংস্কারের প্রসার ঘটিয়ে সরকারী খরচে অযোধ্যায় রামমন্দির, দিঘায় বেআইনী জগন্নাথ মন্দির নির্মাণের নিন্দা করলেন যুক্তিবাদী সমিতি। চাকুরীচোরদের হারানো চোরাই চাকুরী ও বাজেয়াপ্ত করা চাকুরীবিক্রয়ের চোরাই টাকা চোরদের ফেরতের আবেদন করলেন দয়ালু মন্ত্রী। দেশের একটি রাজনৈতিক দলকে সারা বিশ্বের সর্বকালের সর্ববৃহৎ ডাকাতদল হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে ইউ এন ও। এখন ছোট্ট একটা বিরতি। শীঘ্র ফিরে আসছি আরও খুন চুরি ডাকাতি ধর্ষণের আরও উত্তেজক খবরের ডালি সাজিয়ে। কোত্থাও যাবেননা। আমরাই আপনাদের মনোরঞ্জনের জন্য সব সময় প্রথম খবর দিয়ে থাকি। আনন্দসংবাদ নিবেদন করলেন, বঙ্গীয় জনতা পার্টি। আগামী নির্বাচনে বজপাকে ভোট দিয়ে দুর্নীতি করার গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করুন ....

এক অপেক্ষা

লিখেছেন – মিহির

আমি অপেক্ষায় রত,
কবে,
এক দল মুমূর্ষু মানুষ টেনে হিঁচরে উপড়ে ফেলবে,
মন্দিরের বুক থেকে পাষাণের মূর্তি।
কবে,
অনাথ আধপেটা বাচ্ছার সরল মুখ গুলো জ্বলে উঠবে,
বিদ্যুৎ এর ন্যায়।
কবে,
মন্দির মসজিদ গুলো হয়ে উঠবে বাস যোগ্য ,
গৃহ হীন মানুষের ।
আমি অপেক্ষায় রত,
কবে,
স্কুলের পাঠরত শিশুর কন্ঠে চাপা পড়ে যাবে,
হরিনাম আর আযানের শব্দ।



মানুষ

লিখেছেন - রাজু দত্ত

অস্ত্র নেই আমার হাতে,
আমার কোনো বর্ম নেই
নেই কোনো ঈশ্বর আমার,
আমার কোনো 'ধর্ম' নেই।

আমার নেই 'কোরান' 'গীতা',
আমার নেই 'বাইবেল'ও
গরজ নেই আমার জানার,
কবে কী 'পরব' এলো।

আমার নেই 'উপোস' 'রোজা',
'নামাজ' কিম্বা 'অঞ্জলি',
গডের কাছে 'প্রে' না করেও,
দিব্যি আমি পথ চলি।

আমার নেই 'হজ' এর তাড়া,
আমার কোনো 'তীর্থ' নেই,
গোলাকার এই বৃত্ত মাঝে,
আমার কোনো 'বৃত্ত' নেই।

আমার আছে একটা আকাশ,
একমুঠো রোদ আর হাওয়ায়,
ভালোবাসার একটু পরশ
জ্যোৎস্না মাখা স্নিগ্ধতায়।

চাইনা আমি ধার্মিক হয়ে,'অনন্ত' কে জানতে ভাই,
জীবন্ত এই জীবনটা নিয়ে 'মানুষ' হয়ে বাঁচতে চাই।

সূচিপত্র

আসল কারিগর

লিখেছেন – তাপস কুমার সরকার

বলতে পারো দেশ বাঁচাতে আসল কারিগর কারা ?
সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে ঐ
শ্রমিক মজুর ওরা।

মুখোশধারী সমাজের বুকে ওদের
অবহেলাটুকু জোটে,
ওরা অহংকারী নয় ওরা গর্বিত
খেটে খায় নিজ মাঠে।

শ্রমিক,মুচি,মেথর, ডোম, বাগদি
দেশ সাজিয়েছে যারা
ওদের শ্রদ্ধা করো সম্মান করো
আসল কারিগর ওরা।

গায়ের রক্ত জল করে প্রতিনিয়ত
ব্রত দেশের সেবায়,
দায়িত্ব নিয়ে মানুষের মুখে আহার
তুলে দেয় নির্দ্বিধায়।

শিক্ষিত সমাজে ভদ্রলোকেরা ওদের
জানেনা সম্মানটুকু দিতে
কিন্তু ওরাই তোমায় বাঁচিয়ে রেখেছে নইলে অন্ন কোথায়
পেতে ?

অক্লান্ত পরিশ্রমের পর ওদের নিদ্রা
শুধু কষ্ট নিবারণে জন্য
কখনো অসম্মানিত হলেও এ দেশ
তোমাদের পেয়ে ধন্য।



প্লাটিনামে গড়া পথশিশু

লি খে ছে ন - প্রি ন্সি বে রা

মাটিতে নেমে দেখো প্লাটিনামে গড়া শিশু গুলো
রাজপথের নর্দমার জল মেখে নিচ্ছে সুখ,
গড়ছে নিজের রাজ্য ফুটপাতের দ্বীপে।
তীর নেই,তলোয়ার নেই,নেই ঢালের অস্ত্র
নেই পরনে যুদ্ধের বস্ত্র,তবুও তারা লড়ছে,হচ্ছে বিধ্বস্ত।
অলিগলির হোর্ডিং খুলে বানায় মাথার উপর ছাদ,
ভোটের কাগজ গুলো জ্বালানী করে ,দেয়না কিছুই বাদ,
পাবলিক টয়লেট টাই পার্সোনাল স্নানের ঘর,
মায়ের হাতের রান্না খেতে দৌড়াচ্ছে ঘিঞ্জি সরোবর।
সারাবছর যুদ্ধ করছে কুরুক্ষেত্রে নেমে,
কেউ পরাজয় স্বীকার করে মাথা করছে নত
কেউ স্বজন হারিয়ে একাকী দুঃখের ভাগীদার।

আমরা এই চলমান ইতিহাস রোজ পড়ি খবরের
পাতায়,আয়েশ করে পাতা উল্টে সবই এড়িয়ে যায়।
বোম্বে ডায়িং চাদরে শুয়ে বুঝবে কি করে ছেঁড়া কাঁথার
দুর্ভোগ!
পারলে এসো,মাটির কাছে এসো;
মাক্রফোনের মুখ ফিরিয়ে, ক্যামেরা থেকে চোখ
সরিয়ে,বাতেলার ভাষণ ভাসিয়ে দিয়ে
পাশে এসে দু'দণ্ড বসো,হৃদয় দিয়ে অনুভব করো
রানীর রাজপুত্র হয়ে প্রজার বেদনা বোঝা যায় কি?
এমন মধুর তপ্ত দুপুরেও প্রেম হবে,সামনে রাখবো
স্নেহের বিগ্রহ
তুমি আমি মিলে হবো মেঘদূত, পথশিশু গুলো হবে
বিদ্রোহ।

ধন্যবাদান্তে - রমা বেরা
শ্রীচন্দা

ঊনিশে মে

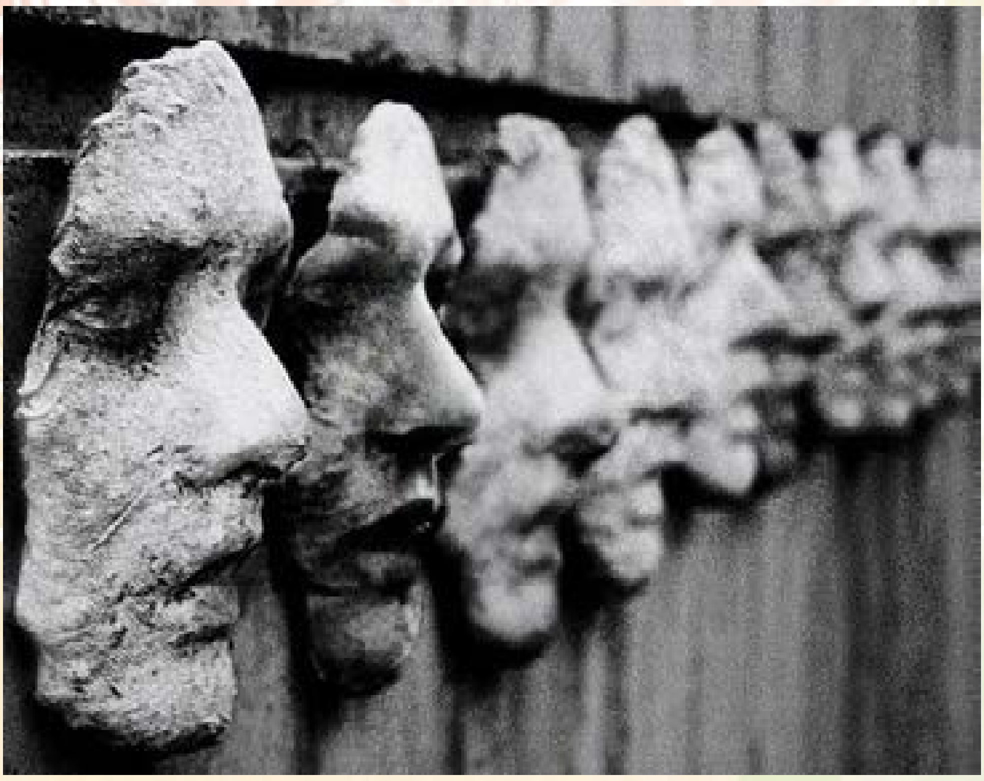
লিখেছেন - তারকনাথ সাহা

তিনি আর এক রবীন্দ্রনাথ
রবীন্দ্রনাথ সেন।
ব্রহ্মপুত্র আর বরাকর উপত্যকার রাজ্য
অসমের সরকারি ভাষাতে
বাংলাকেও দিতে হবে স্থান;
এই ছিল তার বার ঘন্টার হরতাল আন্দোলন।
আগের দিন নলিনীকান্ত আর বিধুভূষনের সাথে
তাকেও গ্রেফতার করল পুলিশ।
1961 সালের পরের বিকাল,
অহিংস সত্যাগ্রহীদের উপর
শুরু হলো গুলিবর্ষণ।
শিলচরের তারাপুর রেল স্টেশনে
বয়ে গেলো রক্তের স্রোত;
কানাই, চণ্ডী, হীতেষ, সত্যেন্দ্র,
কুমুদ, সুনীল, তরণী, শচীন,
বীরেন্দ্র, সুকোমল আর কমলা,
একে একে লুটিয়ে পড়ল সবাই।
উত্তাল হয়ে উঠলো বরাকর উপত্যকা
প্রতিবাদে মুখর হলো সারা পৃথিবী।
স্বাধীন দেশের সে নৃশংসতার,
তদন্ত সম্পূর্ণ হয়নি আজও।
একদিন অসম রাজ্যেও বাংলাভাষা
পেয়ে পেয়েছিলো সরকারি ভাষার মর্যাদা।
আজও একুশে ফেব্রুয়ারীর মতোই
জ্বলজ্বল করছে শহীদের বলিদান।
অন্তরে অন্তরে জাগিয়ে তুলছে
উনিশে মের ভাষা শহীদ দিবসের পটভূমি।

আগুন নেভাবে বিপ্লব

লিখেছেন - শিবম ব্যানার্জী

আজকের এই দুর্দিনে
দুর্নীতির আগুন যদি নেভে
মানুষ যদি হয় প্রাণবন্ত
ক্ষমতা কার হয় আগুন জ্বালানোর?
বিপ্লব জ্বলন্ত হোক
হোক জ্বলন্ত প্রতিবাদ মানুষের হৃদয়ে
কে রুখতে সাহস করে মানুষকে
প্রতিবাদ থেকে কিংবা বিপ্লব?
প্রাণে আঘাত যদি করে
শাসকের নির্যাতন
আঘাত যদি করে জনগণের আর্তনাদ
তবে কে আমাদের প্রাণরুদ্ধ করতে পারে?
মিথ্যা যদি আশ্রয় নেয় সমাজের বক্ষ মাঝে
সত্যের যদি হয় বিনাশ
তবে বিপ্লবীরা আছে কেন
মিথ্যাকে শেষ সীমানায় ঠেলে দিতে?
শান্ত যদি হয় বারুদের গন্ধ
সন্তুষ্টির সৃষ্টি যদি হয় অশান্ত সমাজে
নির্যাতিত লাশেদের হবে অবকাশ
দুর্নীতির আগুন নিভবে কিছুটা।
এখন কি পিস্তলই রাজা
নাকি পিস্তল রাজার
কিংবা সবাই কি পিস্তলের পৃষ্ঠপোষক?
মানুষে মানুষে প্রেমের ভাষা কই?
প্রেমের ভাষা ভুলে সব
মানুষ মানুষের বিরোধিতায় মগ্ন
এখানেই আগুন জ্বলেছে
এই আগুন নেভাবে বিপ্লব।



দান

লিখেছেন - রামকৃষ্ণ সাহা

মন্দির, বসে আছে স্বপ্নের বিগ্রহ।
আর আছে পরিচালকমণ্ডলী।
হাসি পায়। কে কাকে পরিচালনা করে?
প্রশ্নটা সহজ। কিন্তু উত্তর মেলে জটিল।
সামনে থাকে দানপাত্র।
ছুঁড়ে দিই যার যা সামর্থ্য।
নতমস্তকে ভক্তি ভরে প্রতিদানের আশায়,
বিনা স্বাক্ষরে, বিনা চুক্তিপত্রে প্রিমিয়াম ভরি বিমায়।
কখনও "উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ" ,
বাকি সময়টা "কর্মই ধর্ম", এই যুক্তিই মানো।
তবুও দান, ফুলে ফেঁপে ওঠে মন্দির,
সম্পত্তি বাড়ে লক্ষ, কোটি, বাড়ে মার্কেটিং।
কে ভোগ করে?
কার জেল্লা বাড়ে?
ভাবি না, শুধুই করে যাই দান।
দিতে থাকি শুধুই ভক্তির প্রমাণ।

দৃষ্টিটা যদি একবার ঘোরাই,

রাস্তাঘাটে অথবা রেলচত্বরে।
শত শত উদ্বাস্তু, শত শত গরীব অনাহারে,
শীতে কাঁপুনি, গায়েতে ছিন্ন মলিন পোশাক।
একমুঠো ভাতের জন্য কাড়াকাড়ি,
যুদ্ধ করে কুকুরের সাথে।
ভেবে দেখছি কি?
দানপাত্র টা কোথায় রাখা দরকার?
দানের নামে দিচ্ছি দান, আসলে সেটা ঘুষ।
দান যদি করতে হয়, আগে ফিরুক হুঁশ।
তোমার দানে, আমার দানে গড়ছে কেউ অট্টালিকা,
সেই দানটাই ঘুষে নয়, হোক না শুধুই দানের টাকা।
দানটা করি দানের মতো,
নয়তো প্রিমিয়াম।
মন্দিরে নয়, মসজিদে নয়,
মানুষের মাঝেই আজ খুঁজি ভগবান।



মানুষ কোথায়?

লিখেছেন - প্রফুল্ল কুমার মণ্ডল

এই দুনিয়ায় মানুষ খুঁজতে
হন্যে সদাই হতে হয়,
কেহ হিন্দু কেহ মুসলিম
এইতো সবার পরিচয়।

মুখে বলে ধর্মের কথা
মানব সেবা করে নাই,
ধর্মান্ধতায় হাত পাকিয়ে / ধর্ম যুদ্ধ লাগায় তাই।

বুদ্ধি যখন শেষের দিকে /ধর্মান্ধতা দেখতে পাই,
মুক্ত চিন্তা বহু দূরে /এটা আমরা নাহি চাই।

ধর্ম গ্রন্থ বুকে চেপে / অন্ধত্ব কে মেনে নেয়,
বিজ্ঞানের বই পড়ে না কেউ / অনাদরে ছুঁড়ে দেয়।
সত্য মিথ্যা যাচাই করবে /কোথায় আছে এমন লোক,
সত্য কথা বলতে গিয়ে / জীবন যাওয়ার থাকে ঝোঁক।

বিজ্ঞান জানো আগে বাড়ো
বেড়ে যাবে নিজের মান,
জাতা জাতি ঘুচে যাবে
হিন্দু খ্রীষ্টান মুসলমান।

বেদে বিজ্ঞান: ইসরোর চেয়ারম্যান

লিখেছেন - বিপ্লব সেন

বিজ্ঞানের মূল কথা যদি
বেদে থেকে থাকে,
তবে প্রথম মহাকাশযান "আর্যভট্ট"
কেনো ছাড়া সোভিয়েত থেকে।

ভারতের বড় ইস্পাত কারখানা গুলি
রাশিয়া জার্মানির প্রযুক্তি,

কোথায় ভারতীয় বিজ্ঞানের
ছিল সেই শক্তি।

রেল লাইন পাতা ও রেল চলাচল
ব্রিটিশের আমদানি,
কোথায় গেলেন বেদের সব
মোহ পণ্ডিত জ্ঞানী।

নগর সভ্যতার বিদ্যুৎ ব্যবহার
ব্রিটিশের হাত ধরে,
আজও যাত্রীবাহী বিমান তৈরি হয় না
সেই বেদের হাত ধরে।

বিজ্ঞানের নোবেল প্রাইজ
শুধুই সেথায় খরা,
কোথায় গেলো জ্ঞান বিজ্ঞান
জ্ঞানের মনোহরা।

ইসরোর অনেক কিছুই
আসে বিদেশ থেকে,
"চিপ" আজও বিদেশে তৈরি
অজ্ঞতার কালিমা মেখে।

রাজনীতিক এর মিথ্যার সাথে
মিলে যায় ইসরোর মাথা,
অবাক লাগে এসব শুনে
পুরোই মিথ্যা কথা।

আস্তিকতা আসলে মানসিক অসুস্থতা

লিখেছেন - বি প্লব সে ন

স্বাভাবিক যখন করে
অস্বাভাবিক আচরণ,
" ঈশ্বর বিশ্বাস" চেতনার মৃত্যু
একটা উদাহরণ।

যাদের চেতনা শুধুই ঈশ্বর
আর অলৌকিক বিশ্বাস,
বাড়াবাড়ি বেশি হলে
মানসিক সর্বনাশ।

তখন ছোটে বিশেষজ্ঞের কাছে
যাতে আসে সুস্থতা,
বেশি বিশ্বাস নিয়ে চলা
আসলে চরম অজ্ঞতা।

দেবতা আসে না কিছুই করতে
সব কিছু মানুষের সৃষ্ট,
যতই জপ করুন না কেন
আল্লাহ,ভগবান, যীশু খ্রীষ্ট।

দেবতা যদি থেকে থাকে কেউ
সেটা হলো "বিজ্ঞান,"
যুক্তি আগে বিশ্বাস পরে
সেটাই আসল প্রনিধান।

জীবনের পথে এগিয়ে চলার
মাঝে আছে প্রবল বাধা,

বিজ্ঞান এর চেতনা সাথে নিয়ে
এগিয়ে চলা কাটিয়ে সকল দ্বিধা।

পরিবর্তনের এই পৃথিবীর বুকে
ঘটে চলা সব ঘটনা,
পরিবর্তিত প্রতি মুহূর্তে সব কিছুই
সাথে মানুষের চেতনা।

স্থান কাল পাত্র আর দ্বন্দ্ব
সব ঘটনায় বিদ্যমান,
এই আপেক্ষিক সত্য যারা দেখতে পায় না
তাদের চেতনায় থাকে ভগবান।

হাতে হাতে বিজ্ঞান প্রযুক্তি
নেই সর্বশক্তিমানের কোনো হাত,
তবুও তাদের চেতনায় বিশ্বাস
হয় সুস্থতার সাথে সংঘাত।

অবশ্যই অসুস্থতা যেথায় থাকে
শুধুই আনুগত্য আর অন্ধ বিশ্বাস,
"আস্তিক" মানুষ এর" ছায়াযুদ্ধ"
চেতনার শেষ নিশ্বাস।





গাছ আমাদের বন্ধু ও ভাই...

লিখেছেন - সজল কান্তি টিকাদার

গাছ গাছালি কাটছো কেন ?
কেটো না আর ভাই--
রোদের তাপে জ্বলছে আগুন
পুড়ে হচ্ছি ছাই।
আকাশেতে মেঘ জমেনা
হয়না বৃষ্টি আর
শূণ্য মাঠে কাঁদছে কৃষক
করছে হাহাকার।

রাস্তাঘাটে চলতে পথে
ছায়া পাইনা আর
তেষ্টাতে বুক যাচ্ছে ফেঁটে
ঘামছি অনিবার।
পাখ পাখালি কোথায় গেল
কোথায় তাদের গান ?
গাছ গাছালি কাটছো যতই

যাচ্ছে এদের প্রাণ।
ধুলোর মাঝে নিঃশ্বাস নিতে
পাচ্ছি ভীষণ কষ্ট
চোখের জ্যোতি যাচ্ছে কমে
দেখছিনা তো স্পষ্ট।

নির্বিচারে গাছ কাটাতে
সবুজ হচ্ছে শেষ
একদিন দেখো মরুভূমি
হবেই গোটা দেশ।
তাইতো বলি গাছ কেটোনা
কেটো না আর ভাই--
চলো আমরা সবাই মিলে
দেশকে সবুজ বানাই।



সূচিপত্র »

কৃতজ্ঞতা

লিখেছেন - প্রণব নাইয়া

মনে হচ্ছে কেউ নেই? মনে হচ্ছে একা?
আসলে এ অকৃতজ্ঞতা – ভন্ডামি পাকা!
নয়তো অভ্যাস শুধু – নিজের বঞ্চনা।
লক্ষ বর্ষের রিকথ ঋণের করুণা
আর বৌদ্ধিক অর্জন ছেড়ে দিলে থাকে,
বন্য'রা যেভাবে বাঁচে শিকারের আগে..
ঈশ্বর তখনো ছিল, ছিলনা ভরসা!
মানুষ মানুষ তরে জীবনের আশা
জাগিয়েছে। জীবন পেয়েছে জীবনের
স্থিতি। তবুও নারাজ দিতে রিকথের
প্রতি কৃতজ্ঞতা তার! চতুর শঠতায়
বণিক মননে আদি ঈশ্বর জন্মায়!
স্বর্গ – নরক – আত্মা – ভূত – জন্মান্তর..
অলৌকিক স্বার্থে ভরা এ তাসের ঘর!
এবং বিভেদ, ঘৃণা, ভয়ের সন্ত্রাস –
জীবনের সরলতা করে সব গ্রাস।

মানুষ কৃতজ্ঞ হ'লে রিক-থীয়-ঋণে,
অলৌকিক-মোহ মুক্তি লভিবে জীবনে।

লেঠেল দিয়ে দেশপ্রেম হয় না

লিখেছেন – চন্দ্রিল ভট্টাচার্য



প্রকাশ: আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৬.০২.১৬

ভারতে বিজেপি ক্ষমতায় এসে একটি সরল সমীকরণের চল করেছে; কেউ দেশের নিন্দে করলেই, সে দেশদ্রোহী। আর দেশদ্রোহীকে ধরা-মারা হবে, আশ্চর্য কী? বিজেপি-র এক সাধারণ সম্পাদক কৈলাস বিজয়বর্গীয় জেএনইউ প্রসঙ্গে বলেছেন, ‘যারা ভারতে থেকে পাকিস্তানের গুণ গায়, তাদের জিভ টেনে ছিঁড়ে নেওয়া যায় না?’ পরে আপসোস করেছেন, অবশ্য না, এটা তো গণতন্ত্র। এ যে কতটা খেদের বিষয়, এই উদ্ভট তন্ত্রটি এসে শয়তানদের উচিত-শাস্তি দেওয়া থেকে পবিত্র দেশপ্রেমিকদের বিরত রাখছে, তা নিয়ে এঁদের মুহুর্মুহু দীর্ঘশ্বাস। এঁরা ভারতকে গরগরে গণধোলাইধর্মী রাষ্ট্র করে তুলতে চান।

স্মৃতি ইরানি মেলোড্রামার লাইন নিয়েছেন। ‘এরা আমার মা’কে অপমান করেছে!’ ভারত কার মা, কার কাকিমা, প্রশ্নটা কিন্তু তা নয়। বরং, এই ‘মা, মা’ নাটুকে সম্বোধনটা বারবার আবৃত্তির মধ্যে একটা খুব বিপজ্জনক ফতোয়া নিহিত আছে। তা হল; ভারত যেহেতু আমাদের মা, সেহেতু তার নামে কিচ্ছুই বলা চলবে না। ধরা যাক, কারও মা পকেটমার। বা বিচ্ছিরি রকমের অভদ্র। বা খুনি। সে ক্ষেত্রে সন্তানের কর্তব্য কি হাতজোড় করে তাঁকে পুজো করা ও বলা, ‘মা যেমনই হোক, যা-ই করুক, আমি তবু মা’কে ভালবেসে চলব’? না কি, প্রকৃত সন্তানের কর্তব্য, মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে বলা, ‘মা, তোমার এই কাজগুলো আমার ভাল লাগছে না, এগুলো করলে কিন্তু আমি তোমাকে আর শ্রদ্ধা করতে পারব না।’ সন্তানের কাজ কি মা’কে নিঃশর্ত প্রেম ও শ্রদ্ধা করা, মা’র কাজ কি নয় সন্তানের প্রেম ও শ্রদ্ধার যোগ্য হয়ে ওঠা? আসলে, এক বার বদন ভরে ‘মা’ বলে দিলেই একটা আবেগ-থরথর চারিয়ে দেওয়া যায়। হাওয়ায় হিস্টিরিয়া বেড়ে যায়। এটা সচেতন ভাবে করা হয়, যাতে এই উত্তেজনাটা কাজে লাগিয়ে, অস্বস্তিকর প্রশ্নগুলো চেপে দেওয়া যায়, আর সমালোচকদের ওপর অত্যাচারটা জাস্টিফাই করে নেওয়া যায়।

জেএনইউ-এর কিছু ছাত্র কী করেছেন? আফজল গুরুর ফাঁসির প্রতিবাদ করেছেন, ভারতের বিরুদ্ধে ও পাকিস্তানের সমর্থনে স্লোগান দিয়েছেন। কাশ্মীরকে স্বাধীনতা দাও, এ স্লোগানও তোলা হয়েছে। তাতে ঝামেলাটা কোথায়? আমি যদি ভারতকে ভীষণ ভালবাসি, তা হলেও তার যাচ্ছেতাই নিন্দে করতে পারি। তাকে আরও ভাল করে তোলার জন্য, শোধরানোর জন্য, আমার মতে তাকে এক আদর্শ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য, রোজ তার তুমুল নিন্দে করে চিৎকার জুড়তে পারি। অনেকে বলছেন, ‘যেখানকার ভাত খেয়েছ, সেখানটাকে অপমান করছ কেন?’ আরে, এখানকার ভাত খেয়েছি খাচ্ছি খাব বলেই তো সেই ভাতে পোকা পড়লে চেঁচাবার অধিকার আমার সবচেয়ে বেশি! আমার বাড়ির

সামনে নর্দমা খোলা থাকলে আমি চেঁচামেচি করব না তো কে করবে? আমার দেশ যদি বদ হয়, অসভ্য হয়, অসৎ হয়, অপদার্থ হয়, বা আমার পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে ওঠে, আমি রে-রে করে উঠব না? অবশ্যই করব। ভাত খেয়েছি বলে দাসখত লিখে দিইনি। আমি দেশের চাকর নই। আমি দেশের দায়িত্ববান নাগরিক। নাগরিকের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল, দেশের ভুল দেখলে, তা নিয়ে সরব হওয়া। যাঁরা উদ্ধত ভাবে বলছেন, 'হয় চুপ করে থাক, নইলে পাকিস্তানে চলে যা!', তাঁরা ভাবছেন, অন্ধ ভাবে সরকারের হ্যাঁ-য়ে হ্যাঁ মিলিয়ে যাওয়াকে বলে দেশপ্রেম। আর চারিদিকে চেয়ে দেখে ভুল ধরাকে বলে দেশদ্রোহিতা। বরং উলটো। দেশপ্রেম মানে স্তাবকতা নয়। ফেল করা ছেলেকে যে লোক পিঠ চাপড়ে 'বহুত আচ্ছা' বলে, সে তার উন্নতি চায় না, অধঃপাতের রাস্তাটাই সুগম করে। দেশ খারাপ কাজ করলে, তার নিন্দে না করে চুপ করে থাকাটাও অনেক সময় দেশদ্রোহ। দেশের নিন্দে করা আর দেশকে না-ভালবাসা এক নয়।

আবার, দেশকে না-ভালবাসার অধিকারও আমার আলবাত আছে। ভারতে থেকে আমি ভারতকেও ভালবাসতে পারি, ভারত এবং ব্রাজিলকে ভালবাসতে পারি, আবার ভারতকে না ভালবেসে শুধু বেলজিয়ামকে ভালবাসতে পারি। আবার, কোনও দেশকে না ভালবেসে, সব দেশ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত থাকতেও পারি। আমি কাকে ভালবাসব, আর কাকে ভালবাসব না, তা ঠিক করে দেওয়ার অধিকার কারও নেই। 'এক্ষুনি ভালবাস বলছি, নইলে পেটাব'— এ তো ধর্ষকের উচ্চারণ। ভারতে থেকে আমি যদি পাকিস্তানকে ভালবেসে গলা ফাটাই, তা আমার অধিকার। নিজের মতো ভাবনার অধিকার। মত প্রকাশের অধিকার, বাক্‌স্বাধীনতার অধিকার। আমেরিকা যখন ভিয়েতনামের সঙ্গে যুদ্ধ করছে, সারা পৃথিবীর কোটি কোটি লোক আমেরিকার বিরুদ্ধে চিৎকার করে গলা ফাটিয়েছে। আমেরিকার মধ্যেও লাখ লাখ আমেরিকান, আমেরিকার বিরুদ্ধে চিৎকার করেছে।

'যুদ্ধবাজ, দাদাগিরি-করা, জঘন্য রাষ্ট্র' বলে গাল দিয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ যদি বলত, 'আমি আমেরিকায় থাকব বটে, কিন্তু এর কাজকম্ম দেখে আমার ভালবাসা ঘুচে গেছে, আজ থেকে একে প্রাণ দিয়ে ঘেন্না করব', তাতে অন্যায় কী? ঠিকই, একটা জায়গায় জন্মে গেলে, লোকে সাধারণত সেই জায়গাটাকে ও চারপাশের লোকজনকে ভালবেসে ফেলে। বাচ্চা প্রথম থেকে বাবা-মা'কে দেখে, তাদের ভালবেসে ফেলে। এটা স্বাভাবিক। কিন্তু স্বাভাবিক বলেই বাধ্যতামূলক হবে কেন? সন্তানকে এই ফতোয়া দেওয়া যায় কি, 'মা-বাবাকে না ভালবাসলে তোর মুন্ডু ছিঁড়ে নেব'? বড়জোর বলা যায়, 'বুড়ো বয়সে মা-বাবাকে তোমায় দেখতেই হবে।' অর্থাৎ, অনুশাসনটা কর্তব্য বিষয়ে, ভালবাসা বিষয়ে নয়। আমি যদি নাগরিকের যা যা কর্তব্য সব পালন করি, ট্যাক্স দিই, দেশের সম্পত্তি নষ্ট না করি, অন্য নাগরিককে না মারি-ধরি, তা হলে আমি 'অ্যায় মেরে বতন কে লোগো' শুনে কাঁদছি, না, 'যত্ত প্যানপেনে আদিখ্যেতা' বলে খ্যালখ্যাল হাসছি, তা দেখে সরকারের লেঠেল তো আমায় তাড়া করতে পারে না।

আরও; স্রেফ কাছ-ঘেঁষাঘেঁষির চোটে যে ভালবাসা, তার চেয়ে বুঝেশুনে যে ভালবাসা, তা কি অ-কুলীন? আমি যদি অনেকগুলো দেশের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে ওজন বিশ্লেষণ বিচার করে, তার পর মনে করি সুইডেনই পৃথিবীর সেরা দেশ, তা হলে সুইডেনের প্রতি আমার যে ভালবাসা, তা হল জেনে, দেখে, ভেবে ভালবাসা। আর সিঁথির মোড়ে জন্মেছি বলেই সিঁথির মোড়ের প্রতি আমার যে ভালবাসা, তা বরং একটু মাঠো, সংকীর্ণ, প্রতিবর্ত-ক্রিয়া টাইপ ভালবাসা। ভাবা দরকার; ওটা ভালবাসা তো, নাকি স্রেফ একটা অভ্যাস, রোজ ন'টায় বাথরুম যাই বলে শরীর ন'টাতেই 'বেগ এসেছে' বলে ওঠে যে রকম। কেউ ভৌগোলিক গণ্ডি নির্ধারিত ভালবাসাকে উড়িয়ে দিয়ে বলতেই পারে, আমি সারা পৃথিবীর সন্তান, কোনও নির্দিষ্ট দেশের প্রতি আমার আনুগত্য নেই, যখন যেটাকে ভাল দেখব, ভালবাসব, যা খারাপ দেখব, খারাপ বলব। ভারতের সব, সমস্ত জিনিসকে আমার খারাপ লাগে,

তবু আমি এখানে থাকব। কারণ এটা পৃথিবীর একটা অংশ, আমি থাকতেই পারি। আমাকে এখান থেকে উৎখাত করার গা-জোয়ারি যে দেখাবে, সে গুন্ডা। অন্য জায়গায় যাচ্ছি না কেন? হয়তো সামর্থ্য নেই। একটা এঁদো ড্যাম্প দশ ফুট বাই দশ ফুট বাড়িতে থাকি বলে প্রতি দিন নিয়ম করে 'ইস, সাউথ সিটির তেত্রিশ তলা এর চেয়ে অনেক ভাল' বলতে পারব না?

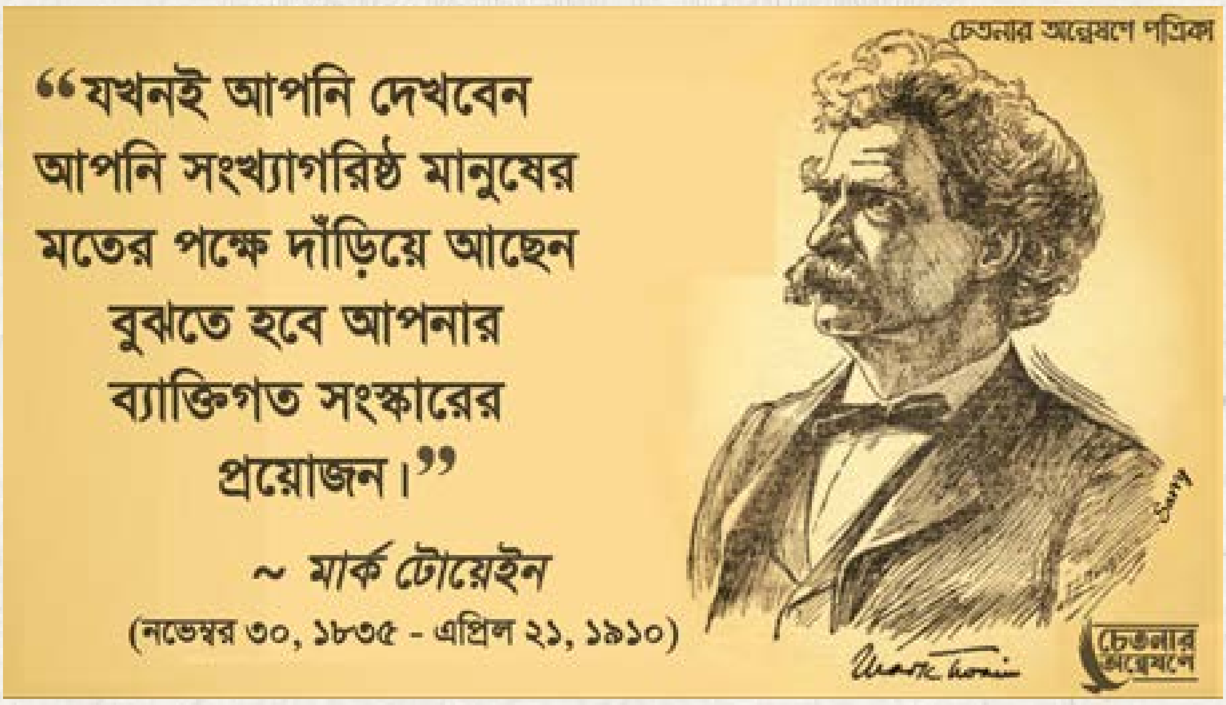
কেউ বলতেই পারেন, বাপু, দেশে থেকে দেশকে যাচ্ছেতাই নিন্দে করার অধিকার যদি তোমার থাকে, তোমার ওপর ভয়াবহ রেগে যাওয়ার অধিকারও তো আমার আছে। আমি দেশকে ভালবাসি, তা তো আমার অপরাধ নয়। অবশ্যই নয়। দেশকে আপনি উন্মত্ত ভালবাসতে পারেন, এবং জেএনইউ-এর স্লোগান-দেওয়া ছাত্রদের প্রতি প্রকাণ্ড রেগে যা-তা বলতে পারেন। তাঁদের বিরুদ্ধে মিছিল করুন, মিটিং করুন, কাগজে চিঠি লিখুন, টিভিতে ইন্টারভিউ দিন। তাঁরা যত চিৎকার করেছেন তার দশ গুণ চিৎকার করুন। এও তো বাক্‌স্বাধীনতাই। কিন্তু পুলিশ লেলিয়ে দেওয়া হল কেন? ছাত্র সংসদের নেতাকে গ্রেফতার করা হল কেন? দেশদ্রোহের চার্জ আনা হচ্ছে কেন? দেশের নিন্দে ও অন্য দেশের সমর্থন মানে তো দেশদ্রোহ নয়। ইন্দিরা গাঁধীর মৃত্যুর পর শিখদের এক সভায় খালিস্তানের সমর্থনে স্লোগান তোলা হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টে তা-ও সিডিশন বা দেশদ্রোহ হিসেবে বিবেচিত হয়নি। আইন অনুযায়ী: হিংসা বা গণ-বিশৃঙ্খলায় প্ররোচনা দিলে, তবেই তা দেশদ্রোহ। অর্থাৎ, কেউ যদি ব্রিজ উড়িয়ে দেয়, সেটা দেশদ্রোহ। কেউ যদি বলে, চলুন এই মিছিলের সবাই মিলে গিয়ে এক্ষুনি অমুক সম্প্রদায়ের বাড়িতে বাড়িতে আগুন লাগাই, এবং সবাইকে তা করতে উসকানি দেয়, তা হলে সেটা দেশদ্রোহ।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, উসকানি কাকে বলে? কতটা ওসকালে তবে 'সিডিশন'? কেউ বলতেই পারে, আফজল গুরুর ফাঁসির বিরুদ্ধে স্লোগান তোলাও এক রকম উসকানি,

তা থেকে অনেকের মনে ভারতবিরোধী আবেগ জেগে উঠতে পারে, আর তারা সবাই হিংসাত্মক হয়ে দেশের মানুষ ও সম্পত্তির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। তা পারে, কিন্তু ওই রকম ভাবে দেখতে গেলে তো কেউ যদি বলে 'রবীন্দ্রনাথের কবিতা ভাল লাগে না', তা হলে তা থেকে প্রেরণা সংগ্রহ করে কেউ বিশ্বভারতীতে আগুন লাগিয়েও দিতে পারে। সেই আশঙ্কায় রবীন্দ্রনিন্দুকটিকে এক্ষুনি দমকলের লোক গিয়ে পেটাতে শুরু করতে পারে কি? পৃথিবীর যে কোনও মতামতের মধ্যেই কাউকে চটিয়ে দেওয়ার উপাদান থাকতে পারে, রাজনৈতিক মতামতের মধ্যে তো বটেই। পৃথিবীর যে কোনও উঁচু-গলায় নিন্দে বা স্লোগানের মধ্যে এই ইচ্ছেও নিহিত আছে। অনেক লোক আমার এই মতকে সমর্থন করুক। আভিধানিক ভাবে প্রতিটিকেই প্ররোচনা ভাবা যায়। ব্যাপারটা এত ভাসা-ভাসা বলেই আমাদের দেশে চমৎকার নিয়ম। কংগ্রেস বাক্‌স্বাধীনতার দুর্দান্ত সমর্থক যতক্ষণ তা বিজেপিকে কামড়ে দিচ্ছে, বিজেপি বাক্‌স্বাধীনতার পেল্লায় সমর্থক যতক্ষণ তা তৃণমূলকে ল্যাং মারছে, তৃণমূল বাক্‌স্বাধীনতার সোল্লাস সমর্থক যতক্ষণ তা সিপিএমের গায়ে কালি ছেটাচ্ছে। নিজের গায়ে আঁচ লাগলেই তখন দ্রোহ-র সংজ্ঞাটা হঠাৎ খুব স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে, আর প্রশাসনের লাঠিসোটা কাজে লাগিয়ে লোকটার টুঁটি টিপে ধরার মধ্যে কোনও অন্যায়ই দেখা যাচ্ছে না। অসীম ত্রিবেদী যখন ২০১২ সালে কার্টুনে আঁকছেন ভারতমাতাকে গণধর্ষণ করছে নেতা ও আমলা, ইউপিএ সরকার তাঁকে দেশদ্রোহের অভিযোগে গ্রেফতার করছে। আর বিজেপি নেতা আডবাণী অবাক হয়ে বলছেন, এ তো ইমার্জেন্সির চেয়েও খারাপ! আবার, হিন্দু মহাসভা যখন নাথুরাম গডসের মূর্তি গড়তে পয়সা তুলেছে, গাঁধী-বিরোধী স্লোগান দিয়েছে, তখন বিজেপির মাথায় দেশদ্রোহের অভিযোগ আনার কথা আসেইনি।

আসলে, এই গোছের ধরপাকড় সব সভ্য দেশ তুলেই দিয়েছে। ভারতে কিছু ক্ষমতাওয়ালা আছে, গণতন্ত্রের মানেটাই জানে না, অশিক্ষা ও জঙ্গিপনা মিলিয়ে ক্ষমতার

কেক কামড়ায়, আর বিরোধিতা দুরমুশ করে স্বৈরতন্ত্র কায়েম করতে, এগুলো প্রয়োগ করে। এদের আবার হাতে-গরম পাবলিক-খেপানো মন্তরটি হল; 'পাকিস্তানকে ঘেন্না করো। পাকিস্তানকে ভালবাসা মানেই দেশদ্রোহ।' এটাই ভারতের দেশপ্রেমের ঠিক সংজ্ঞা, কারণ তা প্রেম দিয়ে নয়, ঘেন্না দিয়েই নির্ধারিত। (তাই তা তুমুল তীব্রতায় ফোটে ভারত-পাক ম্যাচের সময়, কিন্তু অ্যাক্সিডেন্টে পড়ে থাকা দেশবাসীকে বাঁচাবার বেলায় এর টিকিটি মেলা ভার)। কিন্তু তা হলে তো বলতে হয়, কেউ যদি ভারতের প্রধানমন্ত্রী হয়ে, কিচ্ছুটি না-বলেকয়ে, আচমকা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে হাসি-হাসি মুখে হাজির হয়ে যান, দেশদ্রোহের অভিযোগে প্রথমে তাঁকেই হাতকড়া পরিয়ে জেলে পুরে দেওয়া উচিত!



বিজ্ঞানের অঙ্গনে যখন ধর্মের প্রবেশ দুটোর যৌক্তিক পার্থক্য কী এতো সহজ?

- রিচার্ড ডকিন্স

অনুবাদক: তানবীরা তালুকদার



এক ধরনের কাপুরুষোচিত বোধশক্তিজনিত মানসিক শিথিলতা কিংবা আপোষকামিতার কথা বাদ দিলে বিচারশক্তিসম্পন্ন যুক্তিবাদী লোকদের সিদ্ধান্তগুলো বরং যুগ যুগ ধরে প্রতিষ্ঠিত ধর্মের বিরুদ্ধেই যায় (এখানে সাম্প্রতিক যুগের Scientology (1) অথবা Moonies (2) – এগুলোর কথা বিচার্য্য নয়)। স্টিফেন জে গুল্ড তার প্রাকৃতিক ইতিহাস কলামে পোপের বিবর্তনবাদ এর প্রতি আচরণ সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, তা প্রবলভাবে তার আপোষকামী মনোভাবকেই প্রকাশ করে

> *“বিজ্ঞান এবং ধর্মের মধ্যে কোন সংঘাত নেই, সঠিক শিক্ষার অভাবে সেসব ক্ষেত্রে সহজেই পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আমি বিশ্বাস করি, আমার সমস্ত অন্তকরন দিয়ে, একটি সম্মানজনক, একটি ভালোবাসাময় চুক্তি (আমি এটাকেই গুরুত্ব দেই) … ।”*

যাইহোক, কি সেই দুটো সহজ দৃষ্টিতে পার্থক্যময় ক্ষেত্র,

যাকে গুল্ড 'অসম্পৃক্ত স্বতন্ত্র বলয় (Nonoverlapping Magisteria, সংক্ষেপে NOMA) নামে অভিহিত করেছেন আর ধারনা করেছেন এদুটোকে আমাদের সমান উষ্ণভাবে সম্মান আর ভালোবাসা দিয়ে বুকে ধারণ করে রাখতে হবে? গুপ্ত আরও বলেছেন, 'বিজ্ঞানের জ্ঞান শুধু ভৌত বাস্তবতার আলোকে প্রায়োগিক বিশ্বকে ধারণ করে। আর ধর্মের জ্ঞান মানুষের নৈতিক চিন্তা আর মূল্যবোধের ধারনাকে প্রসারিত করে। কিন্তু সত্যই কি তাই?

নৈতিকতা কারা ধারণ করে?

আসলে ব্যপারটা কি এতোই সরল? কিছুক্ষনের মধ্যেই আমি সে আলোচনায় যাবো যেখানে আসলে পোপ বিবর্তনবাদ বলতে কি বুঝিয়েছেন তার ভিত্তি তুলে ধরব এবং এরপর তার চার্চের অন্যসব স্বীকৃতির ব্যাপারেও কিছু কথা বলব। দেখবো আসলেই এগুলো এতো পরিস্কারভাবে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যাখা দেয় কি না। প্রথমেই সংক্ষিপ্ত আকারে ধর্মের সেই দাবী নিয়ে আলোচনা কারা যাক - যেখানে বলা হয় ধর্ম বিশেষ দক্ষ ভাবে আমাদের নৈতিকতা সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে। এ ধারনাটি অনেক সময় অনেক অবিশ্বাসী লোকও সাদরে গ্রহন করেন, ধারনা করা হয় সভ্যতার সাথে সাথে "মাথা নুয়ে" তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীর সর্বোচ্চ যুক্তিকে স্বীকার করে নেয়া সে যতো দুর্বল যুক্তিই হোক না কেন।

প্রশ্ন হলো, "কোনটি ভুল এবং কোনটি ঠিক?" এটি একটি সত্যিকারের কঠিন প্রশ্ন যেটার উত্তর বিজ্ঞান হয়ত দিতে পারে না। নৈতিকতার অবয়ব দিয়ে কিংবা পূর্ববর্তী নৈতিক বিশ্বাস দিয়ে, গুরুত্বপূর্ন এবং কঠিন সব লৌকিক নৈতিক দর্শনের নিয়মানুবর্তিতা দিয়ে একজনকে হয়তো চালিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, বিজ্ঞান এবং যৌক্তিক কারনের সাহায্যে এর সাথে জড়ানো সংশ্লিষ্ট গোপন বিশ্বাসকে, অলক্ষ্যনীয় সামঞ্জস্যহীনতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা যায়। কিন্তু চূড়ান্ত নৈতিক

বিশ্বাসের ভিত্তি মানুষের অন্য কোন জায়গা থেকে আসা উচিৎ, অনুমান করা যায় যুক্তি-তর্কের উর্ধ্বের কোন দৃঢ় প্রত্যয় থেকে। বিশ্বাসীদের দাবী অনুযায়ী এটা হয়ত আসে ধর্মের মাধ্যমে- মানে ঈশ্বর, ধর্মগুরু, সনাতন ঐতিহ্য, এবং একটি ঐশী বইয়ের মাধ্যমে এই নৈতিকতার টনিক বিতরন করা হয় – মানবজতির হেদায়েতের উদ্দেশ্যে।

দূর্ভাগ্যজনকভাবে, যে আশাটা ধর্ম দিতে পারে সেটা উষর প্রস্তরখন্ড ছাড়া কিছু নয়, সেখানে থেকে উৎপন্ন হওয়া বালির ভিত্তি সম নৈতিকতাগুলো একেবারেই নিস্ফলা। সত্যি বলতে কি-প্রাত্যহিক জীবনে কোন সভ্য মানুষই ধর্মগ্রন্থকে নৈতিকতার চূড়ান্ত বাহন হিসেবে পালন করে না। বরং আমরা নিজেদের পছন্দনীয় স্লোক বা আয়াত ধর্মগ্রন্থ থেকে বেছে নিই (যেমন, 'ধর্মে কোন জবরদস্তি নেই', 'প্রতিবেশীর প্রতি ভাল ব্যবহার কর – এধরনের হিতোপদেশ সমূহ) এবং সানন্দে অশোভন অংশটুকু বাদ দিয়ে দেই (যেমন বেগানা নারীকে বেত্রাঘাত, বা তাদের ব্যাভিচারের জন্য পাথর ছুড়ে হত্যা, স্বধর্মত্যাগীদের মুরতাদ আখ্যা দিয়ে হত্যার আইন চালু করা, প্রতিপক্ষের বংশধরদেরকে শাস্তি দেয়া ইত্যাদি)। পুরনো বাইবেলের যে সৃষ্টিকর্তা তিনি নিজেই এক নির্মম, প্রতিহিংসাপরায়ন, নিজের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী, নারী পুরুষের মধ্যে অযৌক্তিক বৈষম্য সৃষ্টিকারী এবং ভয়ংকর রক্তপিপাসু এক চরিত্র, আজকের সমাজে কোন ব্যক্তি তাকে আদর্শ চরিত্র বলে মেনে নেবে না। হ্যাঁ, অবশ্যই আমাদের আজকের সভ্যতার অর্জনের আলোকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের রীতিনীতিকে বিচার করা খুবই অনুচিত। আর সেটাই আমার "আসল" কথা। স্পষ্টতই, আমাদের কাছে নৈতিকতার কিছু চূড়ান্ত বিকল্প উৎস আছে, যা আমাদের সুবিধামতো ধর্মগ্রন্থকে পদদলিত করে হলেও সামনে এগিয়ে যায়।

সেই বিকল্প উৎসটিকে মনে হয় খুবই উদার মতের শালীন ধারার এবং প্রাকৃতিক ন্যায় বিচারক যা ইতিহাসের সময়ের সাথে

পরিবর্তন হয়, যখন যেই ধর্ম প্রচারক থাকে তার প্রভাবনুসারে নিয়মিত পরিবর্তন হতে থাকে। সত্যি কথা বলতে কি, তা খুব কঠিন কিছু না। কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনে, এমনকি আমাদের মধ্যে যারা খুব ধার্মিক তারাও এটাকে ধর্মগ্রন্থের চেয়ে বেশী মূল্য দিয়ে থাকি। প্রাত্যহিক জীবনে আমরা সবাই কম বেশী ধর্মগ্রন্থকে অবহেলা করে থাকি, সে সমস্ত বানীগুলোকেই উদ্বৃত্ত করা হয় যেগুলো আমাদের উদার মানসিকতাকে ধারন করে আর যেগুলো করে না সেগুলোকে সযত্নে সজ্ঞানে এড়িয়ে যাওয়া হয়। আর যেখান থেকেই সেই উদারতা আসুক না কেনো, এটা আমাদের সবার জন্যই গ্রহনযোগ্য সে আমরা ধার্মিক হই কিংবা না হই।

অনুরূপভাবে, যীশু খ্রীষ্ট কিংবা গৌতম বুদ্ধের মতো মহান সব ধর্ম শিক্ষকরা, তাদের নিজেদের চারিত্রিক ভালো গুণ দ্বারা আমাদেরকে অনুপ্রানিত করেন, তাদের ব্যাক্তিগত চরিত্রের দৃঢ়তা ও নৈতিকতাকে গ্রহন করার জন্য। কিন্তু আমরা আবার সেই ভালো কয়েকজন ধার্মিক নেতার মধ্যে থেকেই বাছাই এবং পছন্দের কাজটা করছি, জিম জোন্স অথবা চার্লস ম্যানসন এর মতো পাজী ধার্মিক নেতাদের বাদ দিয়ে। কিন্তু আমরা আদর্শ হিসবে জওহারলাল নেহরু কিংবা নেলসন ম্যান্ডেলার মতো নীতিবান নেতাদেরও তো গ্রহণ করতে পারি। প্রথাগতভাবে, যেহেতু যুগ যুগ ধরে চলে এসেছে তাই ভালো কি মন্দ সে বিচার না করে, আমরা আমাদের নৈতিকতা আর শালীনতার বিচার এবং প্রকৃতি থেকে আহরিত জ্ঞান দিয়ে নিজেরা সিদ্ধান্ত নেই কোনটা গ্রহন করব আর কোনটা বর্জন করব।

বিজ্ঞানের অঙ্গনে ধর্ম

আমরা নৈতিকতার মূল্য নিয়ে আলোচনা করতে করতে মূল বিষয় থেকে দূরে সরে এসেছি। এখন আমি আমার মূল আলোচনা বিবর্তনবাদে ফিরে যাবো দেখব পোপ আমাদের প্রত্যাশানুযায়ী বিজ্ঞান-মনস্কতার ঝান্ডা উর্ধ্বে তুলে ধরতে

পেরেছেন কিনা। "Pontifical Academy of Sciences"-কে তার বিবর্তনবাদের উপর দেয়া বাণীটি শুরুই হয়েছে নেতিবাচকভাবে দুমুখো ভাবধারার কথা দিয়ে যার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে দ্বিতীয় জন পলের আগের উক্তির সাথে মিল রাখা। আরও সন্দেহজনক হলো বারোতম পিয়াসের একটি উক্তির অন্তর্ভুক্তি - যিনি অন্যান্যদের তুলনায় বিবর্তনবাদের প্রতি খুবই বিরূপ। এখন পোপ এলেন আরও কঠিন কাজ করতে, বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রমানের সাথে "ঐশী প্রত্যাদেশের" মিলন ঘটাতে।

ধর্মগ্রন্থে বলা হয়, মানুষের সৃষ্টি হয়েছিল সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছে এবং তার অবয়ব থেকে যদি মানুষ পূর্ববর্তী কোন জীবন থেকে তৈরী হয়ে থাকে তাহলে তার ঐশ্বরিক আত্মা সাথে সাথে সৃষ্টিকর্তা তৈরী করে দেন...... তারফলে তারা মনে করে জীবন্ত প্রানীর সব শক্তির আবির্ভাব হয় আত্মা থেকে, আর বিবর্তনবাদ শেখাচ্ছে পুরো উল্টোটা - আত্মা ছাড়াই কিভাবে প্রাণের বিকাশ আর বিবর্তন হতে পারে নাকি নিছক দৃষ্টি আকর্ষন করার মত ব্যাপার কেবল এটা, মানুষের সৃষ্টির সাথে সম্পূর্ন সামঞ্জস্যহীন এ দ্বিমুখী দন্দ্বে আমরা মানুষেরা নিজেরা অস্তিত্বের প্রশ্নে মনস্তাত্ত্বিক একটা বিভ্রমের মধ্যে পড়ে যাই, যেটাকে অস্তিত্বের বিষয়ে একটা বিরাট ফাকও বলা যেতে পারে।

এ ব্যাপারে পোপকে একটা বাহবা দিতে হয় যে তিনি তখন অনুধাবন করেছেন যে সম্পূর্ন দুই মেরুতে অবস্থিত দুটো বিপরীতধর্মী ব্যাপারকে তিনি জোর করে এক করতে চাইছেন - "যাহোক এ ধরনের অস্তিত্বর বিষয়ে অবস্থান না গ্রহন করাটাই কি বাস্তবে পদার্থ এবং রসায়নের জগতে বিবর্তন এর উপর গবেষনার মূল ধারা নয়?'

ভয়ের কিছু নেই। অস্পষ্টতা আর নানাপদের আগডুম বাগডুম মুক্তির উপায় বাতলে দিচ্ছে;

'জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যে পদ্ধতি বহু বার ব্যবহার করা হয়েছে তার দ্বারা দুটো ভিন্নধর্মী মতামতকে এক করা সম্ভব হয়, যাদের এক হওয়াকে আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব বলে মনে হয়। বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষন বর্ণনা এবং পরিমাপের মাধ্যমে জীবনের বিভিন্ন দিক স্পষ্ট করে ব্যাখা করে এবং সময়ের সাথে সাথে আরও নির্ভুল ভাবে একে জীবনের সাথে যুক্ত করে। আধ্যাত্মিক সাধনার বিশেষ মূহুর্তকে এভাবে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষন করা যায় না, তথাপি এটা একটা গবেষনামূলক স্তরের আবিস্কার – যা মানব জীবনের সাথে সম্পর্কিত অনেক নির্দিষ্ট মূল্যবান জিনিসের প্রতি ইঙ্গিত করে।

সোজা ভাষায় বলতে গেলে, বিবর্তনবাদের নির্দিষ্ট একটা লক্ষ্যে পৌছার একটা সময় এলো যখন সৃষ্টিকর্তা মানুষের আত্মাকে পূর্ববর্তী প্রানীর বংশের মধ্যে অন্তর্গত এবং সঞ্চারিত করলেন। (কখন? দশ লক্ষ বছর আগে বিশ লক্ষ বছর আগে? Homo erectus আর জ্ঞান সম্পন্ন Homo sapiens মানুষের মধ্য? নাকি Homo sapiens মানুষ আর H. sapiens sapiens – মানুষের মধ্যে?) হঠাৎ করে আত্মা সঞ্চারনের অবশ্যই দরকার আছে, নইলে তো মানবজাতির জন্য অতি প্রয়োজনীয় ধর্মের ভিত্তিই ধ্বসে পড়ে। তুমি আহারের জন্য প্রানী হত্যা করতে পারো, কিন্তু ভ্রুন হত্যা কিংবা দুরারোগ্য ব্যাধীতে আক্রান্ত মানুষের যন্ত্রনাহীন মৃত্যু তাদের দৃষ্টিতে অযৌক্তিক জীব হত্যা, কারণ এক্ষেত্রে মহামূল্যবান 'মানব জীবনের' প্রশ্ন জড়িত।

ক্যাথলিজমের জাল কেবল নৈতিক বিবেচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ভাবলে ভুল হবে। ক্যাথলিক ধর্মানুসারীরা বিশ্বাস করে আধুনিক সভ্য Homo sapiens মানুষের সাথে অন্য সমস্ত ইতর প্রানী জগতের একটি বিরাট বিভেদ আছে। আর বিজ্ঞানের চোখে এই বিভেদ একেবারেই ভ্রান্ত। বলা নিষ্প্রয়োজন, আজকের যুগে আকস্মিক ভাবে কোন ধরনের

অমর আত্মার মাধ্যমে প্রানের বিকাশের কথা বিবর্তনবাদের কাছে বৈজ্ঞানিক ভাবে অগ্রহনযোগ্য।

আরও সাধারনভাবে বলতে গেলে, এটা বলা খুবই অযৌক্তিক, যেমন গুল্ডস এবং অন্যান্যরা বলে থাকেন, যে ধর্ম নিজেই বিজ্ঞানের অঙ্গন থেকে দূরে অবস্থান করে, এবং শুধু নৈতিকতা আর মূল্যবোধের মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে।' ঈশ্বর নামক একটি অলৌকিক সত্ত্বা দ্বারা সৃষ্ট এবং তার দ্বারা বিরাজিত মহাবিশ্ব, প্রকৃতগতভাবে এবং গুনগতভাবে ঈশ্বরবিহীন মহাবিশ্ব থেকে আলাদা হওয়ারই কথা। আর সেই বিভেদটিই হলো অপরিহরনীয়। বৈজ্ঞানিক পার্থক্য। ধার্মিকেরা যে সত্ত্বার অস্তিত্বের দাবী করে, তা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাদের বৈজ্ঞানিক দাবীকেই উপস্থাপন করতে চায়।

প্রধান প্রধান রোমান ক্যাথলিক চার্চগুলোর বেশীর ভাগই এই ধরনের দাবীর প্রতি আস্থাশীল। বিনা ঔরসে কুমারীর মাতার সন্তান প্রসব, কুমারী মেরীর সশরীরে স্বর্গপ্রবেশ, সমাধি থেকে যীশূর পুনরুত্থান, মৃত্যুর পরে আমাদের আত্মার জবাবদিহিতা –এগুলো ভুল হোক, ঠিক হোক – যথার্থ বৈজ্ঞানিক দাবী। হয় যীশূর একজন সত্য সত্যই বাবা ছিলেন নতুবা নয়। যথার্থ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার মাধ্যমেই এর জবাব মিলতে পারে। এটা কোন "নৈতিকতা" কিংবা "মূল্যবোধের" প্রশ্ন নয়, এটা হলো বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা তথা সত্যান্বেষী মননের প্রশ্ন। আমাদের কাছে এটার জবাব দেয়ার মতো সাক্ষ্যপ্রমান হয়তো নেই কিন্তু এটি যে একটি বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন – এতে তো কোন সন্দেহ নেই। তবে বিজ্ঞান যদি অদূর ভবিষ্যতে এ প্রশ্নের উত্তর দেয়ার মতো কোন প্রমান খুঁজে পায়, আপনি এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারেন, ভ্যাটিকান সেটিকে উচ্চারনও করতে দেবে না।

যখন মাতা মেরী মারা যান, হয় তখন তার দেহ বিনষ্ট হয়ে গেছে, নতুবা তার দেহ এই পৃথিবী থেকে স্বশরীরে স্বর্গে তুলে

নেয়া হয়েছে। আনুষ্ঠানিক দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত রোমান ক্যাথলিক চার্চ এর অনুমান, সম্প্রতি ১৯৫০ সালে তারা অধ্যাদেশ জারি করেছেন, যেখানে তারা বলেছেন স্বর্গ জিনিসটার সত্যিকারের 'ভৌগলিক অস্তিত্ব' বাস্তবিকই আছে, নইলে একজন রমনীর শরীর কিভাবে সেখানে গেলো? আমি একথা এখানে বলছি না যে, কুমারী মাতাকে নিয়ে অনুমিত এই মতবাদ আসলেই মিথ্যা (যদিও আমি বিশ্বাস করি এটি অবশ্যই মিথ্যাই হতে হবে)। আমি শুধু এই যুক্তিই খন্ডন করতে চাচ্ছি যে, যারা বলেন এ ধরণের দাবী বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের বাইরে রাখতে হবে। বরং, এই কুমারীর এই গল্পটি সত্য কিনা তা বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য-প্রমাণের মাধ্যমে নির্ণয় করা যেতে পারে - এটি তাই পরীক্ষণযোগ্য একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। আমাদের শারীরিক ভাবে মৃত্যু হলে আমাদের আত্মার জবাবদিহি করতে হবে কিনা কিংবা সেই সাথে ফেরেশতাদের দ্বারা বিচারপর্বের গল্প, স্পষ্টতই মাদার মেরীর সাথে যুক্ত হওয়ার অলৌকিক গল্পসমূহ এবং এধরনের অন্যান্য সব গল্পসমূহ-এর ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে।

প্রায়শই খুব অসৎ মতবাদ অবলম্বন করে বলা হয় যে কোন ধর্মীয় দাবীই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের বাইরে। অন্যদিকে এরাই আবার অতি প্রাকৃতিক রং-বেরং-এর গল্প সমূহ, এবং মৃত্যুর পরের জীবনের কথা বলে সাধারন মানুষদেরকে অভিভূত করার চেষ্টা থাকেন, নিজের দল ভারী করে গোপন উপায়ে জেতার চেষ্টা, কিংবা উপসনালয় বৃদ্ধির চেষ্টা থাকেন। এটাই তাদের বৈজ্ঞানিক শক্তি যা তাদেরকে এ সমস্ত গল্পকে বিশ্বাসযোগ্য ভাবে উপস্থাপন করার সামর্থ্য দেয়। এবং একই সময়ে সে সব বিষয়ের যৌক্তিক ব্যাখ্যা, বৈজ্ঞানিক গবেষনা কিংবা নুন্যতম সমালোচনাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হয় 'এগুলো ধর্মের বিষয়, বিজ্ঞানের এখান থেকে দূরে থাকা উচিৎ।' কিন্তু তুমি গাছেরটাও খাবে - তলারটাও কুড়োবে এ তো হতে পারে না। অন্তত ধর্মের তাত্বিক আর - আত্মপক্ষ সমর্থনকারীদের এই দুমুখো নীতিকে আমাদের কখনওই

প্রশ্রয় দেওয়া উচিৎ না। দূর্ভাগ্যবশতঃ তারপরও, আমাদের মধ্যে অনেকেই, এমনকি যারা ধর্মে বিশ্বাস রাখেন না তারাও অম্লান বদনে তাদেরকে একাজ গুলো অহরহই করতে দিই।

আমার মতে, সনাতন কট্টর মৌলবাদীদের বিপক্ষে পোপকে দলে টেনে আত্মপ্রসাদ লাভের একটা প্রচেষ্টা। এতে অবশ্য খুশী হবার মত কারণ আছে যারা ক্যাথলিক ধর্মের প্রবক্তা যেমন মাইকেল বিহেদের পায়ের তলা থেকে আস্তে আস্তে মাটি সরে যাচ্ছে। তারপরেও যদি আমাকে বলা হয় সত্যিকারের সনাতন ঈশ্বর-বিশ্বাসী, ধর্মগ্রন্থ মেনে চলা সৎ ধার্মিক আর অন্যদিকে কপট, দুমুখোস্বভাবের, গোঁজামিল দেওয়া বক ধার্মিকদের মাঝ থেকে কাউকে গ্রহণ করতে, আমি জানি আমাকে কোনটা গ্রহন করতে হবে।

তথ্যসূত্র (অনুবাদকের সংযোজন):

1. এল. রন। হার্ভার্ড Sceintelogy এর প্রবক্তা। ১৯৫০ সাল থেকেই তিনি এ নিয়ে কাজ শুরু করেন যা তিনি ১৯৫২ সালে জনসমক্ষে প্রকাশ করেন। ১৯৫৩ সালে তার এ মতবাদকে তিনি ধর্মের নাম এবং রূপ দেন। ১৯৬০ সালে তিনি Sceintelogy কে এই বলে সংঙ্গায়িত করেন, এ ধর্মনীতির মূল হলো, বিশ্বাস, আচরন আর ঐতিহাসিক পটভূমি আর ধর্মনীতি শব্দটি নিজেই নিজেকে প্রতিফলিত করে। Sceintelogy চার্চ এর অনুসারীরা এ ধর্ম সম্পর্কে বলেন, “সত্যের শিক্ষা হলো এ ধর্মের মূল কথা”। মূল শব্দটি নিজেই ল্যাটিন শব্দ scientia এর জোড়া যার মানে হলো “জ্ঞান, দক্ষতা” অর্থাৎ এর মূল ক্রিয়াপদ হলো জানা।

2. সান মুংগ মুন Moonies ধর্মের প্রবক্তা। ইউনিফিকেশন কমিউনিটি চার্চ থেকে ১৯৭০ সালে এ ধর্মের যাত্রা শুরু এ ধর্মালম্বীরা নিজেদেরকে চাঁদের সন্তান মনে করেন। ১৯৭৪ সালে মেডিসন স্কয়ার গার্ডেন চার্চের এক সমাবেশের মধ্য দিয়ে এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। এ ধর্মালম্বীদের

সাধনার তিনটি স্তর থাকে, Moonies থেকে সাধনার মাধ্যমে SUNNIES এবং SUNNIES এর সাধনা থেকে পাওয়া শক্তি ও ভক্তি তাকে KINGIES এর বা সর্বোচ্চ স্তরে নিয়ে যাবে, যা সাধনাকে পরিপূর্ন করবে।

ড. রিচার্ড ডকিন্স, আজকের দুনিয়ার সবচেয়ে প্রভাবশালী বিজ্ঞানী, গবেষক এবং দার্শনিকদের অন্যতম। পেশায় বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞানী, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। যুক্তিবাদী এবং সমাজসচেতন লেখালিখির কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যে ড. রিচার্ড ডকিন্সের খ্যাতি আজ আক্ষরিক অর্থেই তুঙ্গস্পর্শী। ‘ব্লাইন্ড ওয়াচমেকার’, ‘সেলফিশ জিন’, ‘আনোয়েভিং দ্য রেইনবো’, ‘ক্লাইম্বিং মাউন্ট ইস্ট্রোবেবল’, ‘ডেভিলস চ্যাম্পেইন’ এবং ‘অ্যান্সেসটর টেল’ সহ অসংখ্য পাঠকনন্দিত জনপ্রিয় ধারার বিজ্ঞানভিত্তিক বইয়ের রচয়িতা। সম্প্রতি নিজ উদ্যোগে তৈরী করেছেন ‘রিচার্ড ডকিন্স ফাউন্ডেশন’। তাঁর সর্বশেষ বই ‘দ্য গড় ডিলুশন’ - এখন পর্যন্ত বিগত বাইশ সপ্তাহ ধরে নিউয়র্ক টাইমসের ‘বেস্ট সেলার’ তালিকায় রয়েছে।

চেতনার অন্বেষণে : মুক্তচিন্তক সাময়িকী

২৭তম সংখ্যা ২০২৩

পরিকল্পনা ও রূপায়ণে

সৌভিক, সজল, অভিষেক, মধুমিতা, অরিন্দম, উপেন,
সৌমেন ও রাজু

প্রথম পাতা»

| বিনিময় মূল্য নাই

> "অন্ধ দেশপ্রীতি সত্যের পথে বড় বাধা দেয়। আমাদের দেশের আচার - ব্যবহার, বিধিব্যবস্থা প্রভৃতি যা কিছু সবই ভাল এরূপ বিশ্বাসের - দিকে যাঁদের মনের খুব ঝোঁক, কোন প্রকার সংস্কারের কথায় তাঁরা কখনই আমল দেবেন না।"
>
> - আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় (২রা আগস্ট, ১৮৬১ – ১৬ই জুন, ১৯৪৪)

লেখা পাঠানোর উপায় ও নিয়ম

কয়েকটি বিষয়ে নজর রাখবেন:

- বিষয়: বিষয়–মুক্তচিন্তা, যুক্তিবাদ, নাস্তিকতা, বিজ্ঞান, সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম ইত্যাদি।
- লেখার ধরন: গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, নিবন্ধ ইত্যাদি।
- শব্দ সংখ্যার সীমাবদ্ধতা নেই।
- লেখারশর্ত: লেখায় কোনপ্রকারপ্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকে উৎসাহ দেওয়া যাবে না। কুসংস্কার ছড়ায় এমন কিছু থাকলে লেখা বাতিল হয়ে যায়।
- সময়সীমা: প্রতিমাসের ২৫ তারিখের আগে পাঠান। ২৫ তারিখের পর পাঠালে পরের মাসের সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।
- লেখা পাঠানোর ইমেইল:
  yukbadira@gmail.com
  হোয়াটসঅ্যাপ: +91-94337-94113

প্রকাশিত কিছু সংখ্যা

ভগৎ সিং সংখ্যা

গৌরীলংকেশ সংখ্যা

অভিজিৎ রায় সংখ্যা

বিশেষ আইনি সংখ্যা

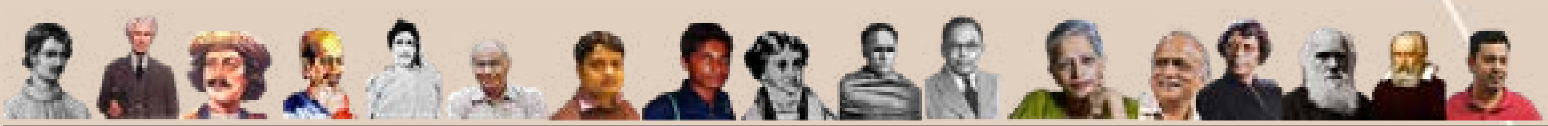
গ্রাহক হোন

পত্রিকার প্রতিমাসে ইমেইলে পেতে গুগল ফর্ম পূরণ করুন

ফর্ম লিংক

টেলিগ্রামে সার্চ করুন
@Yktibadira

QR for Subscription



যুক্তিবাদীরা গ্রুপ কর্তৃক প্রকাশিত একটি মাসিক অনলাইন যুক্তিবাদী পত্রিকা

Email: yuktibadira@gmail.com, WhatsApp: +91-94337-94113
Editor-in-chief: Prasenjit Konar, Kolkata - 700056